প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ঃ জুন, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ প্রাণীবিদ্যা

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ EZO 06

পর্যায় ঃ 01

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	ড. তুষারকান্তি মুখার্জী	ড. সুজিত দাশগুপ্ত
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ঐ	ঐ
একক 4	ড. কস্তুরী পাল	ঐ
একক 5	ঐ	ঐ
একক 6	ঐ	ঐ
একক 7	ঐ	ঐ

পুনঃ সম্পাদিত
ড. সমীরণ সাহা

পর্যায় ঃ 02

একক 8	ড. নারায়ণ ঘড়াই	ড. বিভাস গুহ
একক 9	ড. নারায়ণ ঘড়াই	ড. বিভাস গুহ
একক 10	ড. পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	ড. বিভাস গুহ
একক 11	ড. পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	ড. বিভাস গুহ
একক 12	ড. নারায়ণ ঘড়াই	ড. বিভাস গুহ
একক 13	ড. নারায়ণ ঘড়াই	ড. বিভাস গুহ
একক 14	ড. নারায়ণ ঘড়াই	ড. বিভাস গুহ

পুনঃ সম্পাদিত
ড. চন্দ্রাবলী সেন

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EZO 06

ট্যাক্সোনমি ও অভিব্যক্তি

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়

1

ট্যাক্সোনমি ও প্রাণী বিভাজন

একক 1 ❑	ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেমেটিক্স—সংজ্ঞা, ট্যাক্সোনমির স্তর, টাইপ	7–17
একক 2 ❑	প্রজাতি ধারণা; জাতিরূপভিত্তিক, নামবাদভিত্তিক ও জৈবিক প্রজাতি ধারণা	18 – 26
একক 3 ❑	শ্রেণিবিন্যাসের ধারণা ও প্রাণী নামকরণের নীতিসমূহ	27 – 42
একক 4 ❑	ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ ও জীবাশ্মবিদ্যা	43 – 62
একক 5 ❑	প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ ও তাদের প্রাণীচরিত্র	63 – 88
একক 6 ❑	বিসরণ, বিসরণে বাধাসমূহ ও প্রাণীবিস্তারে বিসরণের প্রভাব	89 – 97
একক 7 ❑	মহাদেশীয় সঞ্চালন পদ্ধতি এবং প্রাণীবিস্তারে এর ভূমিকা	98 – 108

পর্যায়

2

অভিব্যক্তি এবং অভিব্যক্তিয় জীববিদ্যা

একক 8 ❑	জীবনের সৃষ্টি-তত্ত্ব, লামার্ক ও ডারউইন তত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	109 — 122
একক 9 ❑	জৈব বিবর্তনের আধুনিক রূপরেখা	123 — 141
একক 10 ❑	প্রজাতি উদ্ভব	142 — 153
একক 11 ❑	বিচ্ছিন্নকরণ	154 — 160
একক 12 ❑	অভিযোজনমূলক বিকিরণ এবং অভিসরণ	161 — 166
একক 13 ❑	কার্যকরী অভিযোজন	167 — 182
একক 14 ❑	পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি	183 — 195

একক 1 ❑ ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেমিটেক্স—সংজ্ঞা, ট্যাক্সোনমির স্তর টাইপ

গঠন

1.0 প্রস্তাবনা

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 ট্যাক্সোনমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

1.3 ট্যাক্সোনমির সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা

1.4 ট্যাক্সোনমির স্তর

1.5 সিস্টেমেটিক্স (Systematics)

1.5.1 সিস্টেমেটিক্স ও শ্রেণীবিভাগ

1.5.2 পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স

1.6 টাইপ (Type)

1.6.1 টাইপ ধারণা (Type Concept)

1.6.1.1 টাইপ মর্যাদা (Type status)

1.6.1.2 টাইপ (Type), টাইপ বস্তু (Type Materials), টাইপ কালচার (Type Culture), টাইপ স্লাইড (Type Slide), এবং টাইপ সিরিজ (Type Series)

1.6.1.3 টাইপ প্রজাতি, টাইপ গণ এবং উচ্চতর ট্যাক্সা

1.6.1.4 টাইপের প্রকারভেদ (Kinds of Types)

1.7 অনুশীলনী

1.8 সারাংশ

1.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1.10 উত্তরমালা

1.0 প্রস্তাবনা

পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি কোটি কোটি রকমের জানা ও অজানা প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে। তার বহু অংশ বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের অনেকটাই বর্তমান প্রাণীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এদের ঠিকমত নামকরণ না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান সাধনা শুরু হতে পারে না। এইসব প্রাণীদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—এরা রয়েছে হিমশীতল মেরু অঞ্চলে, এরা রয়েছে মরু অঞ্চলে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এদের জীবনের বিভিন্ন দিক জানা যায় এবং কিভাবে জীবন এইসব

কঠিন বাধা অতিক্রম করে পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে তার গবেষণা করা যায়। এই গবেষণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানব ও অন্যান্য জীবের কল্যাণে সহায়ক হয়। যেহেতু জীবের প্রকারভেদ পরীক্ষার ফলাফল ভিন্ন হয়, তাই গবেষণার শুরুতেই প্রয়োজন প্রাণীটির প্রকৃত পরিচয়। ট্যাক্সোনমি-বিজ্ঞান তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

বহু প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর জীব ও অজীব বৈচিত্র মানুষকে কৌতূহলী করেছে। তার আশেপাশের সব কিছুর পরিবর্তনের কারণ খুঁজে তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তৈরী করেছে। সময়ের সাথে ও পরবর্তী নানা পরীক্ষার ভিত্তিতে সেইসব ব্যাখ্যার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এইভাবে ট্যাক্সোনমি বিজ্ঞানও গড়ে উঠেছে।

যেহেতু আজকের পৃথিবীর কোটি কোটি বৎসর ধরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, তাই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন কারণে বহুবিধ প্রাণীর বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং প্রাণীকূলের বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে পুরোনো না-দেখা পৃথিবীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের নিরন্তর সাধনার ফলে প্রাণীবৈচিত্রের কারণ জানা যায়, তাদের মধ্যে মিল-অমিল খুঁজে পূর্বপুরুষের গঠন বৈচিত্র ও আরও পূর্বেকার প্রাণী-ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।

1.1 উদ্দেশ্য

প্রাণীবিজ্ঞানের এই শাখায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় ঃ

- পৃথিবীতে যেসব প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বা ছিল, তাদের নামকরণ করার নিয়ম
- এইসব প্রাণীর সনাক্তকরণ ও তার প্রয়োজনীয়তা
- শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি ও নিয়মসমূহ
- প্রাণীবৈচিত্র ও তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি

1.2 ট্যাক্সোনমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্তমানে মানুষ খুব সহজেই পৃথিবীর প্রায় সব জায়গার সাথে মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারে এবং সহজেই সেখানে পৌঁছাতে পারে। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, প্রথমদিকে মানুষ প্রকৃতিকে জানার অদম্য কৌতূহলে সহজে স্থানান্তর গমন করতে পারতো না। সে তার ব্যাখ্যা, বর্ণনা, মন্তব্য সব লিপিবদ্ধ করে বহু কষ্ট স্বীকার করে পর্যটনের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য জায়গায় পৌঁছে দিত। প্রকৃতিবিদগণ নানা দেশ ঘুরতেন ও গবেষণা করতেন। দেখা গেছে একই প্রাণীর পরিচয় স্থানান্তরে ভিন্ন হয়ে গেছে। তারা প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক প্রাণীকে একই দলভুক্ত করেছেন। এইসব অসুবিধা দূর করতে বিজ্ঞানীগণ প্রাণী নামকরণের বিজ্ঞানভিত্তিক রূপরেখা তৈরীতে সচেষ্ট হলেন।

যে সমস্ত প্রাচীন মনীষীগণ শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণের সূচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন থিওফ্রেসটাস (370-285 BC), অ্যারিস্টট্‌ল (384–322 BC), জন রে (1627-1705), লিনিয়াস (1707-1778),

ক্যানডোল (1813), বেন্থাম ও হুকার (1862-1883) প্রভৃতি। ক্যানডোল ট্যাক্সোনমি কথাটি প্রদান করেন। এর পরবর্তী সময়ে মায়ার (1953, 1969) এই পদ্ধতি ও নীতির বিশদ আলোচনা এবং দুরূহ অংশগুলির ব্যাখ্যা দেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক নামকরণের ও শ্রেণীবিন্যাসের কাঠামো তৈরী হওয়ার পর এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং বিষয়টি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে।

1.3 ট্যাক্সোনমির সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা

বিভিন্ন পুস্তকে এই সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। মায়ারের (1969) দেওয়া সংজ্ঞা সর্বোৎকৃষ্ট। এটি এইরূপ 'জীবসমূহের শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি হ'ল ট্যাক্সোনমি'।

শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্ব বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন, যার দ্বারা প্রাণীগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দিক থেকে জানা যায়। যথা, একটি প্রাণীতে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে এবং কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি অন্যদের থেকে পৃথক; কোনগুলি পূর্বপুরুষে ছিল এবং কোনগুলি নতুন(গৌণ বা প্রাথমিক), অভিযোজন বা বিবর্তনের সাথে কোনগুলি জড়িত ইত্যাদি। এসবের ভিত্তিতে প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। আগেকার শ্রেণীবিন্যাসে প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ট্যাক্সোনমি করা হত। বর্তমানে এর সাথে যুক্ত হয়েছে অঙ্গসংস্থান সম্বলিত তথ্য, বাস্তুতান্ত্রিক, জৈবরসায়নগত, জীবাশ্মগত, ভ্রূণগত, ব্যবহারগত এবং জীণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ। অসুবিধার কথা এই যে এই সমস্ত দিক বিবেচনা করা সব সময় সব প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। সূক্ষ্মতর এবং নির্ভুল শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাই ঐসব প্রাণী অনেক সংখ্যায় দরকার। কিন্তু সংরক্ষিত ও কমসংখ্যক প্রাণীর ক্ষেত্রে এই অসুবিধা থাকছে।

1.4 ট্যাক্সোনমির স্তর

প্রাণীবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ পদ্ধতি সরল থেকে ক্রমশঃ জটিল হতে পারে। এরই ভিত্তিতে তিনটি স্তর তৈরী হয়েছে—

(a) **আলফা ট্যাক্সোনমি (Alpha Taxonomy) :** কোন একটি প্রজাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা এবং তার বর্ণনাসহ শ্রেণীবিন্যাসই হল আলফা ট্যাক্সোনমি। সুতরাং প্রজাতির বিশেষত্ব থাকবে যা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণে অন্য প্রজাতি থেকে পৃথক। এইভাবে নতুন প্রজাতির আবিষ্কার এই স্তরে করা হয়। অনেক সময় এই স্তরকে স্বাভাবিকভাবেই **বিশ্লেষণধর্মী স্তর** বা **Analytical level** বলে।

(b) **বিটা ট্যাক্সোনমি (Beta Taxonomy) :** এই স্তরে আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্ক নির্ণয় এবং উচ্চস্তরের নির্ধারণ ও তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যা করা হয়।

এই স্তর নির্ধারণে ও পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। কারণ আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্ক বুঝতে প্রথমে একটি গণভুক্ত সব প্রজাতিকে বুঝতে হয়, এমনকি নিকট সম্পর্কযুক্ত গণভুক্ত প্রজাতিগুলিকে জানা প্রয়োজন। এইভাবে প্রজাতিগুলিকে প্রাচীন থেকে নবীন

(primitive to recent)— এইভাবে সাজানো ও অভিযোজনগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য সাধারণ (common) এবং পূর্বপুরুষগত (ancestral) বলে চিহ্নিত করা যায়। এইগুলি উচ্চতর ট্যাক্সনের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। যেহেতু বহু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের কাজ এই স্তরে করা হয়, সেজন্য এই স্তরটিকে অনেকে **সংশ্লেষধর্মী স্তর** বা **Synthetic level** বলেন।

(c) **গামা ট্যাক্সোনমি (Gama Taxonomy) :** বিটা ট্যাক্সোনমি স্তরে প্রাপ্ত যে আন্তঃপ্রজাতি ও আন্তঃগণ বৈশিষ্ট্য জানা যায় তার ভিত্তিতে ঐজাতীয় প্রাণীর সামগ্রিক বিবর্তনের ধারা নির্ণয় করা এই তৃতীয় স্তরের কাজ। স্বাভাবিক কারণে বহু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হয়। এই স্তরে ঐসব প্রাণীর পথিবীতে আবির্ভাবের সময়, পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য, বিবর্তনের হার ও গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা হয়। অনেকে এটিকে **জৈবিক স্তর** বা **Biological phase** বলেন।

1.5 সিস্টেমেটিক্স (Systematics)

প্রাণীবিজ্ঞানের এই শাখায় জীবের প্রকারভেদ ও বৈচিত্র নিরূপণ এবং জীবসমূহের সর্বপ্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় (Simpson, 1961)। এক-কথায়, এটি হ'ল প্রাণীবৈচিত্রের গবেষণা।

ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেমেটিক্স-এর পার্থক্য হ'ল এই যে, ট্যাক্সোনমি হ'ল গোড়ার কথা এবং এর ভিত্তিতে সিস্টেমেটিক্সে আসা যায়। প্রথমটি নতুন প্রজাতির বর্ণনা, নামকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। পরবর্তীকালে আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে বিবর্তনগত ব্যাখ্যা করা হয়। গামা ট্যাক্সোনমির স্তরে সিস্টেমেটিক্সের কাজ হয়।

কার্যক্ষেত্রে বহু বিজ্ঞানী এই দুটিকে সমার্থক করেছেন। এই দুটির পার্থক্য উল্লেখ করে হক্সওয়ার্থ ও বিসবী (Hawksworth and Bisby, 1988)-র মতে ট্যাক্সোনমির পরিধি নতুন প্রজাতির নামকরণ ও বর্ণনা পর্যন্ত। অন্যদিকে সিস্টেমেটিক্সে প্রথাগত ট্যাক্সোনমিসহ অভিব্যক্তি তত্ত্ব ও এর ব্যবহারিক বিষয়গুলি জীনতত্ত্ব ও প্রজাতির উদ্ভব (speciation)-এ সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। এইভাবে প্রাণীর জাতিজনিবিদ্যা (Phylogenetics) সিস্টেমেটিক্সের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।

1.5.1 সিস্টেমেটিক্স ও শ্রেণীবিন্যাস

সিস্টেমেটিক্সের আলোচনায় অপরিহার্যভাবে শ্রেণীবিন্যাসের কথা এসে যায়। শ্রেণীবিন্যাসের (classification) শুরু ট্যাক্সোনমির শুরু থেকে এবং এটি বহু পথ অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ষাটের দশকে এর দুটি শাখা পৃথকভাবে গড়ে উঠেছে। একটি হল স্নিথ ও শোকল (Sneath and Sokal, 1973)-এর ফেনেটিক্স (phenetics)। পূর্বে এটিকে সংখ্যাভিত্তিক (numerical) ট্যাক্সোনমি বলা হত। অন্য শাখাটি প্রায় একই সময়ে গড়ে উঠেছিল এবং এটি হেনিগ-এর (Hennig, 1950, 1957, 1975), ক্ল্যাডিজ্‌ম (Cladism) এই দুটি ছাড়াও বিবর্তনগত সিস্টেমেটিক্স

ও জাতিজনিত সিস্টেমেটিক্স কথা দুটিও প্রচলিত ছিল। এই সবগুলির পার্থক্য, গুণাগুণ ও বিশদ ব্যাখ্যা একক 3-এ করা হয়েছে।

1.5.2 পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স

ট্যাক্সোনমি অথবা সিস্টেমেটিক্সের সাথে পপুলেশনের যে নিবিড় যোগ আছে তা বর্তমান যুগে অধিকতর বিচার্য্য বিষয় বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে এই বিষয়ে চিন্তাধারা ডারউইনের আগের যুগেও ছিল।

প্রতিটি প্রজাতির একাধিক স্থানীয় পপুলেশন গোষ্ঠী থাকে। এদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এমন পরিমাণে পার্থক্য থাকে যে প্রকৃতিবিদ্ এক-একটিকে উপপ্রজাতি বলে গণ্য করতে চাইবেন। এইভাবে কোন প্রজাতির অধীনে একাধিক উপপ্রজাতি থাকে, তবে এটিকে **পলিটাইপিক (Polytypic) প্রজাতি** বলা হয়। যদি না থাকে তবে **মনোটাইপিক (Monotypic) প্রজাতি** বলে।

এই পলিটইপিক প্রজাতির ধারণা ট্যাক্সোনমিকে এক নতুন আলোয় দেখতে শেখায়। এই ধারণার ফলে শ্রেণীবিন্যাস অতি সরল হয়েছে, সিস্টেমেটিক্সের অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই ধারণার জন্ম হয়। বিজ্ঞানীগণ বুঝতে পারেন যে, প্রজাতি ট্যাক্সন বস্তুতপক্ষে ভৌগোলিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন পপুলেশনের সমষ্টি। ক্রমশঃ টাইপোলজিক্যাল প্রজাতি ধারণার অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। ট্যাক্সোনমি বিজ্ঞানী বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে নমুনা সংগ্রহ করতে থাকেন এবং একই সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকেন যে ঐসব বাস্তুতন্ত্রে পপুলেশনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এইগুলির সমন্বয়ে বিবর্তনের ব্যাখ্যা নতুনতর হ'ল। এইভাবে পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স জীববিজ্ঞানের এক প্রধান অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

চিরাচরিত লিনিয়াসের ট্যাক্সোনমি থেকে সরে এসে পপুলেশন সিস্টেমেটিক্সের এই ধারণাকে হাক্সলী (Huxley, 1940) যে নতুন নামকরণ করলেন তা হ'ল **নব সিস্টেমেটিক্স (New Systematics),** যার কিছু প্রাচীন লেখায় (প্রায় একশ পঞ্চাশ বৎসরের) পাওয়া গেছে।

উপপ্রজাতির সংজ্ঞা ও ব্যবহারিক সুবিধা ও অসুবিধাগুলি একক 2-এ আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, পলিটাইপিক প্রজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বৈচিত্র থাকে এবং বিজ্ঞানীগণের মধ্যে ঐ মাত্রা নির্ধারণের কোন মানদন্ড না থাকায় উপপ্রজাতি নির্বাচনের ভিত্তি অজানা। আবার দেখা যায় যে নিকট সম্পর্কবিশিষ্ট প্রজাতি, যাদের বাস্তুসংস্থানগত প্রয়োজন একই প্রকারের, তারা ভৌগোলিক দিক থেকে একে অপরকে প্রতিস্থাপিত করে। অথচ তারা উপপ্রজাতি নয়।

বিজ্ঞানী মায়ার (1964 C) নব সিস্টেমেটিক্সের বর্ণনায় এই কথাগুলি বলেছেন—

(a) **ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যার ব্যবহার** ও তার ফলে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কী (key) বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা হ্রাস।

(b) **অতি সহজে গ্রহণযোগ্য নতুন বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার,** যেমন—প্রাণীর আওয়াজ, প্রজননকালের ব্যবহার, প্রোটিন বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও কম্প্যুটারের ব্যবহার।

(c) **শ্রেণীবিন্যাস ধারণা ব্যাখ্যা,** যথা—উপপ্রজাতিকে ক্যাটেগোরী (catagory) মর্যাদা দান, ট্যাক্সন ও ক্যাটোগোরীর পৃথক করা এবং ট্যাক্সার (ট্যাক্সন-এর বহুবচন) মিল-অমিলের কারণ বুঝতে পারা।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে সব সিস্টেমেটিক্স ঠিক কোন নতুন পদ্ধতি নয়, বরং নতুন দৃষ্টিকোণ যার শুরু প্রাচীনকালে হয়েছিল।

1.6 টাইপ (Type)

প্রাণীর নামকরণের আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission of Zoological Nomenclature) প্রস্তাবিত প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড (International Code of Zoological Nomenclature বা ICZN) দ্বারা নির্ধারিত নিয়মাবলীর ভিত্তিতে নামকরণ হয়। এই কোডের একটি হ'ল টাইপ সম্পর্কে তথ্যাদি ও টাইপ ধারণা (Type Concept)।

1.6.1 টাইপ ধারণা (Type Concept)

একজন আবিষ্কর্তা যে বিশেষ প্রাণী/প্রাণীসমূহ/প্রাণীর অংশবিশেষ বা স্লাইডের প্রথম বর্ণনা করেন সেইটি 'Type' বলে বিবেচিত হয়। এই 'টাইপ' শব্দটির ব্যাপকতা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

1.6.1.1 টাইপ মর্যাদা (Type Status)

টাইপের মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক বিজ্ঞানীর কর্তব্য। এর ভিত্তিতে ট্যাক্সোনমি, সিস্টেমেটিক্স, বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হবে। সুতরাং টাইপের সৃষ্টিতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়; যেমন—

(a) টাইপ প্রাণীর পূর্ণ বর্ণনা, বিষয়বস্তুর প্রামাণ্য ছবি, পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের বয়ান ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে হয়।

(b) আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণাপত্রে টাইপের বর্ণনাসমূহ প্রকাশিত হবে এবং এতে প্রকাশকের ঠিকানা ও তারিখ থাকবে। টাইপটি কোথায় কিভাবে বা কি অবস্থায় সংরক্ষিত হ'ল তা জানাতে হবে। সংরক্ষণ এমনভাবে হবে যাতে তা বহুকাল অবিকৃত থাকে।

(c) টাইপটি সুপরিচিত গবেষণাগারে / মিউজিয়ামে থাকবে এব গবেষণাপত্রে এর উল্লেখ থাকবে। স্বীকৃত বিজ্ঞানীমাত্রেই তার গবেষণার স্বার্থে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

(d) আবিষ্কর্তা ঐ টাইপের সাথে অন্য প্রজাতির সম্পর্ক এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবেন। তিনি অবশ্যই এ সম্পর্কে যাবতীয় পূর্বে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের তথ্যাদি জানবেন। এর দ্বারা নতুন টাইপের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবেন।

(e) আবিষ্কর্তা ICZN মেনে চলবেন। প্রয়োজনে কমিশনের রায় গ্রহণ করবেন।

নিয়মের ব্যতিক্রম টাইপের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে।

1.6.1.2 টাইপ (Type), টাইপ বস্তু (Type Material), টাইপ কালচার (Type Culture), টাইপ স্লাইড (Type Slide), এবং টাইপ সিরিজ (Type Series)

টাইপ নির্ধারণ এক-কথায় টাইপিফিকেশান (typification) বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন, কোন প্রাণী টাইপ হতে পারে। প্রাণীর অংশবিশেষ (যেমন, প্রাণীর পালক, জীবাশ্ম) টাইপ হতে পারে। অনেক সময় সংরক্ষণের স্বার্থে প্রাণীটির শুধু ছবি ছাড়া অন্যকিছু সংগ্রহ করা যায় না এবং সেক্ষেত্রে ছবিগুলি টাইপ মর্যাদা পায়। এগুলি ICZN দ্বারা স্বীকৃত হয়। শংকর প্রাণী বা তার অংশ বিশেষ টাইপ হবে না।

ব্যাক্টেরিয়া ও অন্যান্য কয়েক প্রকার প্রোক্যারিওটের ক্ষেত্রে যে 'বস্তুটির' (material অর্থে জীব) ভিত্তিতে নতুন প্রজাতি / উপপ্রজাতির প্রথম বর্ণনা প্রকাশিত হয় তাকেই **টাইপ বস্তু (Type material)** বলে শ্রেণীবিন্যাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

অপরপক্ষে, ব্যাক্টেরিয়া ও অন্যান্য প্রোক্যারিওটের প্রজাতি নির্ধারণে তাদের জৈব-রসায়নিক বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। এদের ক্ষেত্রে মৃত জীবগুলিকে কোন স্লাইডে সংরক্ষণ করা অর্থহীন হতে পারে। এজন্য এসিব জীবকে জীবন্ত অবস্থায় বিশেষভাবে গবেষণাগারে পালন / রক্ষা / কালচার (culture) করা হয়। এক-এক প্রজাতির বর্ণনার ভিত্তিসূচক সংরক্ষিত কালচারটি হ'ল **টাইপ কালচার (Type culture)**।

যদি কোনভাবে টাইপ কালচার বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে একই জাতীয় জীবের (ব্যাক্টেরিয়া / প্রোক্যারিওট) নতুন কালচার শুরু ও সংরক্ষণ হয় তাকে **নিও-কালচার (Neo-culture)**।

প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে নতুন প্রজাতি / উপপ্রজাতি নির্ধারণে বৈশিষ্ট্য দর্শানোর জন্য একাধিক প্রাণীকে সংরক্ষিত অবস্থায় স্লাইডে রাখা হয়। এইরূপ স্লাইডকে **টাইপ স্লাইড (Type slide)** বলে এবং এইজাতীয় টাইপকে হ্যাপানোটাইপ (Hapanotype) বলে।

প্রথম আবিষ্কর্তা যে-সমস্ত একই জাতীয় প্রাণীর ভিত্তিতে প্রজাতি / উপপ্রজাতির প্রথম বর্ণনা করেন, সেই প্রাণীকে (নমুনা) একত্রে **টাইপ সিরিজ (Type series)** বলে। এই প্রাণীগুলির মধ্য থেকে 'সন্দেহজনক' প্রাণী বা অন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীগুলিকে অবশ্যই বাদ দেওয়া হয়।

1.6.1.3 টাইপ প্রজাতি, টাইপ গণ এবং উচ্চতর ট্যাক্সা

নতুন প্রজাতি যে প্রাণীর বর্ণনার ভিত্তিতে হয়, তাকেই ঐ প্রজাতির টাইপ বলা হয়।

উচ্চতর ট্যাক্সার ক্ষেত্রে, যথা—গণ (genus), জাতি (tribe), উপগোত্র (sub-family), গোত্র (family) প্রভৃতির টাইপ হবে ঠিক তার নিচের একটিমাত্র ট্যাক্সন দ্বারা। যেমন একটি গণের ধারণা (concept) বা বর্ণনা নির্দ্ধারিত হয় তার অন্তর্ভুক্ত একটি টাইপ প্রজাতি দ্বারা; অর্থাৎ প্রতিনিধিস্বরূপ একটি প্রজাতির দ্বারা। এই প্রজাতি সবচেয়ে প্রথমসৃষ্ট প্রজাতি নাও হতে পারে। এইভাবে টাইপ গণের ভিত্তিতে একটি জাতির ধারণা হবে, টাইপ জাতির ভিত্তিতে, উপগোত্র এবং উপগোত্র টাইপের ভিত্তিতে গোত্রের ধারণা হয়।

1.6.1.4 টাইপের প্রকারভেদ (Kinds of Types)

পূর্বে আলোচিত টাইপ সম্পর্কিত বিষয়গুলির পর এখন প্রজাতিতে যে বিভিন্ন প্রকার টাইপ নির্দ্ধারণ হয়ে থাকে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(a) **হলোটাইপ (Holotype)**

একটি প্রজাতি / উপপ্রজাতি ধারণা যে প্রাণীটির ভিত্তিতে হয়, তাকে হলোটাইপ বলে। সাধারণতঃ হলোটাইপ একটিমাত্র সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাণী বা প্রথম আবিষ্কারক দ্বারা নির্বাচিত ও উল্লিখিত। আগে বলা হয়েছে যে প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে কনস্পেসিফিক (conspecific) টাইপ স্লাইড (Type slide) করা হয় এবং তাদের কোন একটি বেছে এটিকে হলোটাইপের মর্যাদা দেওয়া হয়।

(b) **অ্যালোটাইপ (Allotype)**

প্রথম আবিষ্কর্তা দ্বারা নির্ধারিত ও হলোটাইপের বিপরীত লিঙ্গের আদর্শ প্রাণীটিকে অ্যালোটাইপ বলে। বর্তমানে এটি ICZN দ্বারা স্বীকৃত নয়।

টাইপসমূহের প্রতিটি সুনির্দিষ্টভাবে সুলিখিত পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড বা লেবেল সংশ্লিষ্ট করে দিতে হবে। সাধারণতঃ হলোটাইপের জন্য লাল রংয়ের কার্ড / লেবেল, অ্যালোটাইপের জন্য সবুজ লেবেল এবং প্যারাটাইপের জন্য হলুদ লেবেল ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি এজাতীয় লেবেলে নিম্নোক্ত তথ্য থাকা দরকার—প্রাণীটির বৈজ্ঞানিক নাম ও উচ্চতর ট্যাক্সার উল্লেখ, লিঙ্গ, টাইপের ধরণ, কিভাবে কোন্ স্থান থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সংগ্রাহকের নাম ও সংগ্রহের তারিখ ইত্যাদি।

(c) **প্যারাটাইপ (Paratype)**

হলোটাইপ নির্বাচিত হওয়ার পর ঐ প্রজাতি / উপপ্রজাতির অন্তর্গত বাকী প্রাণীগুলিকে প্যারাটাইপ বলে। উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাসে ব্যাপকভাবে এটি ব্যবহৃত হয়।

(d) **সিনটাইপ (Syntype)**

টাইপ সিরিজের প্রতিটি সদস্যই হ'ল সিনটাইপ। টাইপ সিরিজে হলোটাইপ নির্বাচিত করা থাকে না।

(e) **ল্যাক্টোটাইপ (Lactotype)**

টাইপ সিরিজের কোন একটি আদর্শ সিনটাইপকে যখন নির্বাচিত করে আলাদা করা হয় তখন তাকে ল্যাক্টোটাইপ বলা হয়। অর্থাৎ ল্যাক্টোটাইপের মত এবং এর মাধ্যমে ঐ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।

(f) **প্যারাল্যাক্টোটাইপ (Paralactotype) বা ল্যাক্টো-প্যারাটাইপ (Lacto-paratype)**

ল্যাক্টোটাইপ নির্বাচিত হওয়ার পর টাইপ সিরিজের অন্যসব প্রাণীগুলিকে প্যারা-ল্যাক্টোটাইপ বলে।

(g) **কোটাইপ (Cotype)**

এটিও ICZN দ্বারা স্বীকৃত নয়। পূর্বে প্যারাটাইপ বা সিনটাইপকে কোটাইপের সমার্থক বলে ব্যবহার করা হত।

(h) **নিওটাইপ (Neotype)**

হলোটাইপ, ল্যাক্টোটাইপ অথবা সিনটাইপ না থাকলে এবং প্রাণীবিজ্ঞানের জটিল সমস্যার সুরাহা করতে ICZN মেনে একজন বিজ্ঞানী (যিনি ঐজাতীয় প্রজাতিগুলির সম্পর্কে নতুনভাবে আলোচনা করছেন) তখন ঐ প্রজাতির জন্য বর্তমানে নির্বাচিত প্রাণীটিকে নিওটাইপ বলে। এক্ষেত্রে ঐ বিজ্ঞানীকে ভালভাবে জানতে হবে যে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হলোটাইপ ইত্যাদি সত্যিই বর্তমানে নেই বা নষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ইত্যাদি। নিওটাইপের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পূর্বে প্রকাশিত ঐ প্রজাতির বর্ণনার সাথে এক হতে হবে।

(i) **টোপোটাইপ (Topotype)**

প্রজাতির প্রথম বর্ণনায় প্রাণীটি যে স্থান থেকে সংগৃহীত হয়েছিল তাকে **টাইপ** লোকালিটি (Type locality) বলে। ঐ স্থান থেকে পরবর্তীকালে সংগৃহীত প্রাণীকে টোপোটাইপ বলা হয়।

(j) **আর্কিটাইপ (Archaetype)**

এটি একটি কল্পিত টাইপ যার মধ্যে পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং বিশেষ বা গৌণ অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য থাকবে না।

উপরোক্ত সমস্ত টাইপসমূহের সবগুলি কিন্তু ICZN দ্বারা স্বীকৃত নয়, কিন্তু প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের কয়েকটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত করা চলে যার মধ্যে অন্ততঃ নিম্নোক্ত দু'টি ভাগ দরকারী ঃ

1. প্রাইমারী টাইপসমূহের ভাগ বা প্রোটেরোটাইপ (proterotypes), যথা—হলোটাইপ, অ্যালোটাইপ, প্যারাটাইপ ইত্যাদি। এসকল টাইপ সংশ্লিষ্ট ট্যাক্সার (প্রজাতি, গণ ইত্যাদি) রচয়িতা কর্তৃক ট্যাক্সার রচনাকালেই চিহ্নিত।
2. সেকেন্ডারী টাইপসমূহের ভাগ, যথা— নিওটাইপ, নিও-এলোটাইপ, ল্যাক্টোটাইপ ইত্যাদি। এসকল টাইপ সংশ্লিষ্ট ট্যাক্সার বর্ণনার পরে প্রয়োজনমত ট্যাক্সার বা অন্য কোন বিজ্ঞানীর দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে।

1.7 সারাংশ

প্রাণীবৈচিত্র নিরন্তর মানুষকে কৌতূহলী করেছে। এর ফলে প্রাণীর নামকরণ, বর্ণনা ও শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। বিভিন্ন সময়ে বহু বিদগ্ধ পন্ডিতের নিরলস সাধনায় প্রাণীবিজ্ঞানের এসব সূক্ষ্মদিকগুলি গড়ে উঠেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেমেটিক বিজ্ঞান দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ফলে খুব শীঘ্র এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে। মতামতের আদান প্রদান, যুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে এবং প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে জানার ফলে বিভিন্ন নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। এর পর প্রশ্ন আসে, পৃথিবীতে প্রাণীবৈচিত্রের কারণ কি? তাই বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধান করতে হয় এবং এটি পাওয়া যায় সিস্টেমেটিক্সের গঠনে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বহু রকমের নতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন। সে সবের অন্তর্নিহিত অর্থ পরবর্তীকালে নানারকম হয়েছে। ফলে সেগুলির প্রকৃত অর্থ যাচাই করা হয়েছে, যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়।

বহু পরীক্ষার দ্বারা ও বহু নীতির সঠিক মূল্যায়ন ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আজ যেখানে ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেমেটিক্স এসেছে তা অনেক সরল ও যুক্তিনির্ভর হয়েছে। বিজ্ঞানীর কাছে বর্তমানে এর ব্যবহার সহজ হওয়ার পর তাঁর চিন্তায় এর আরও নতুনতর দৃষ্টিকোণ স্থান পেয়েছে। প্রাণী বিবর্তন ও শ্রেণীবিন্যাস যত ব্যাখ্যাসম্মত হয়েছে, ততই বিবর্তনের নানা অজানা, অদেখা প্রাণীর স্বরূপ অনায়াসে কল্পনা করা যায় এবং এর মাধ্যমে বিবর্তনের শূন্যস্থানের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়েছে।

নতুন প্রজাতি / উপপ্রজাতি কিভাবে করা হয় ও পৃথিবীতে এর সুফল কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। টাইপের সৃষ্টি, প্রকারভেদ ও নীতিসমূহও আলোচিত হয়েছে।

1.8 অনুশীলনী

1. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(a) 'ট্যাক্সোনমি' কথার কার দেওয়া? (b) কার লেখায় ও কোন সময়ে প্রথম প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়? (c) ট্যাক্সোনমির স্তর কী কী ও কয়টি? (d) ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেমেটিক্সের পার্থক্য কী? (e) হেনিগের প্রবর্তিত তত্ত্বের নাম কী? (f) পলিটাইপিক ও মোনোটাইপিক প্রজাতি কী? (g) আন্তর্জাতিক কমিশন ও কোড কেন প্রয়োজন? (h) 'টাইপ' কথাটির অর্থ কী? (i) টাইপ গণ ও টাইপ প্রজাতির সম্পর্ক কী? (j) কোন্ ক্ষেত্রে প্রাণীর অংশবিশেষ টাইপ হতে পারে?

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) আলফা ট্যাক্সোনমি প্রকৃতপক্ষে একটি _____ স্তর। (b) ফেনেটিক্সের প্রবক্তা হলেন _____। (c) নব সিস্টেমেটিক্স _____ সালে _____ দ্বারা প্রবর্তিত হয়। (d) উপপ্রজাতি থাকলে ঐ প্রজাতিকে _____ প্রজাতি বলে। (e) ICZN এর পুরো কথাটি হ'ল _____ ।

3. প্রথম স্তম্ভের বিষয়টির সাথে দ্বিতীয় স্তম্ভের মিল করুন ঃ

(a) ট্যাক্সোনমির জৈবিক স্তর	সিস্টেমেটিক্স
(b) ট্যাক্সোনমির সংশ্লেষধর্মী স্তর	টাইপ স্লাইড
(c) প্রাণীবৈচিত্রের গবেষণা	ব্যাক্টেরিয়া
(d) হ্যাপানোটাইপ	গামা ট্যাক্সোনমি।
(e) টাইপ কালচার	বিটা ট্যাক্সোনমি।

1.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. কিভাবে ও কোন্ বিষয়গুলির বিচারে ট্যাক্সোনমির স্তর নির্ধারিত হয়? **2.** সিস্টেমেটিক কথাটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা কী? নব সিস্টেমেটিক্সের মূল বক্তব্য কী কী? **3.** টাইপ নির্ধারণে বিজ্ঞানীকে কোন্ কোন্ বিষয়ে যত্নবান হতে হয়? **4.** পপুলেশন সিস্টেমেটিক্সের আরম্ভ ও গুরুত্ব কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? **5.** বিভিন্ন প্রকারের টাইপ কিভাবে নির্ধারিত হবে?

1.10 উত্তরমালা

1. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

(a) ক্যাণ্ডোল; (b) থিওফ্রেসটাস, 370-285 BC; (c) মোট তিনটি—আলফা, বিটা ও গামা; (d) 1.5 দ্রষ্টব্য; (e) ক্ল্যাডিজ্‌ম; (f) 1.5.2-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য; (g) 1.6 দ্রষ্টব্য; (h) 1.6.1-এর প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (i) 1.6.1.3 দ্রষ্টব্য। (j) 1.6.1.2-এর প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

2. শূন্যস্থান পূরণ ঃ

(a) বিশ্লেষণধর্মী; (b) স্নিথ ও শোকল; (c) 1940, হাক্সলী; (d) পলিটাইপিক; (e) প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড

3. প্রথম স্তম্ভের সাথে দ্বিতীয় স্তম্ভের মিল করা ঃ

(a) গামা ট্যাক্সোনমি; (b) বিটা ট্যাক্সোনমি; (c) সিস্টেমেটিক্স; (d) টাইপ স্লাইড; (e) ব্যাক্টেরিয়া

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. 1.4 দ্রষ্টব্য; 2. 1.5 দ্রষ্টব্য; 3. 1.6.1.1 দ্রষ্টব্য; 4. 1.5.2 দ্রষ্টব্য; 5. 1.6.1.4 দ্রষ্টব্য

একক 2 ❑ প্রজাতি ধারণা (Species Concept); জাতিরূপভিত্তিক, নামবাদভিত্তিক ও জৈবিক প্রজাতি ধারণা (Typological, Nominalistic and Biological Species Concept)

গঠন

2.0 প্রস্তাবনা

2.1 উদ্দেশ্য

2.2 প্রজাতির সংজ্ঞা

2.3 বিভিন্ন প্রকারের প্রজাতি ধারণার ব্যাখ্যা

2.3.1 জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণা (Typological Species Concept)

2.3.2 নামবাদভিত্তিক প্রজাতি ধারণা (Nominalistic Species Concept)

2.3.3 জৈবিক প্রজাতি ধারণা (Biological Species Concept)

2.3.3.1 জৈবিক প্রজাতি ধারণার তিনটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য

2.3.3.2 জৈবিক প্রজাতি ধারণায় পপুলেশন জেনেটিক্স

2.3.3.3 জৈবিক প্রজাতি ধারণার সীমাবদ্ধতা

2.4 বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে প্রজাতির সংজ্ঞা

2.5 প্রজাতির পপুলেশন-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দ

2.6 সারাংশ

2.7 প্রশ্নাবলী

2.8 উত্তরমালা

2.0 প্রস্তাবনা

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের প্রায় শুরুতেই একই জাতীয় প্রাণীগোষ্ঠীকে বিশেষ স্তরে পরিচিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য ঐ স্তরটির নামকরণ করা হয় এবং তা হল প্রজাতি। কিন্তু প্রজাতির সংজ্ঞা নির্ণয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মধ্যে মতভেদ গড়ে ওঠে। কোন একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা পাওয়ার নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এমনকি বলা হয় যে একজন পারদর্শী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী যাকে প্রজাতি বলবেন, তাই হল প্রজাতি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য জানা যায় না। সুতরাং সংজ্ঞা এমন হবে যা সর্বজনগ্রাহ্য এবং ব্যবহারিক গুণসম্পন্ন। পরবর্তীকালে অবশ্য বিভিন্ন সংজ্ঞা ও সেগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। (Ereshefsky, 1962)।

নিরপেক্ষ বিচারে প্রজাতির সংজ্ঞা দু'ভাবে করা যেতে পারে, এক প্রত্যক্ষ গুণাবলীর ভিত্তিতে একটি প্রাণীগোষ্ঠীকে একটি প্রজাতিভুক্ত করা যায় এবং দুই, যে পদ্ধতিতে ঐ প্রাণীগোষ্ঠীর সৃষ্টি, তার ভিত্তিতে করা যায়। এই দুটির মধ্যে প্রথমটি সহজতর ও এর ব্যবহার বেশী। কিন্তু দ্বিতীয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং এটি বিবর্তনের প্রশ্নের সমাধান করে।

2.1 উদ্দেশ্য

প্রজাতি ধারণা প্রাচীনকাল থেকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। এই ধারণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজনগুলি নিম্নরূপ ঃ

- প্রজাতির সংজ্ঞা নিরূপণ।
- বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় ও সেগুলির ব্যবহারিক সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করা।
- প্রজাতি সংজ্ঞার পরিবর্তন কিভাবে বিভিন্ন তত্ত্বের দ্বারা আলোচিত হয়েছে।
- প্রজাতি স্তরের ও তার নিম্নস্তরের প্রকারভেদ কিভাবে করা হয়।

2.2 প্রজাতির সংজ্ঞা

প্রজাতির সংজ্ঞা নিয়ে নানামতের ব্যাখ্যা করার আগেই যদি প্রজাতির বর্তমান এবং মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে অনেক অসুবিধা কম হয়। মায়ারের (1942) মতে—

'প্রজাতি একটি জীবগোষ্ঠী যা অন্তঃপ্রজাতি প্রজননক্ষম, যা জীনগত বৈষম্যের কারণে এবং প্রজনন পৃথকতা পদ্ধতির (যথা—প্রজনন ক্ষমতাহীন শংকর জীব, গ্রহণযোগ্য বা উপযুক্ত প্রজননসঙ্গীর অভাব প্রভৃতির) দ্বারা অন্য জীবগোষ্ঠী থেকে পৃথক।'

এই সংজ্ঞাটি জৈবিক প্রজাতি ধারণার অন্তর্গত এবং বিবর্তনের চিন্তাধারায় সঠিক হলেও সিস্টেমেটিক্স বিজ্ঞানীগণ এর বিরোধিতা করেছেন। এ সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা হবে।

2.3 বিভিন্ন প্রকারের প্রজাতি ধারণার ব্যাখ্যা

পূর্বে বলা হয়েছে যে প্রজাতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি প্রকৃতপক্ষে তিনটি ভাগে আলোচনা করা যায়।

2.3.1 জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণা (Typological Species Concept)

এই প্রজাতি ধারণার প্রবক্তা হলেন দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল, লিনিয়াস এবং পরবর্তীকালে কেন্ (1958), জিনস্‌বার্গ (1938)। এই দার্শনিক চিন্তাধারাকে কখনও আবশ্যিকভাবে বলা হত বলে জাতিরূপভিত্তিক সংজ্ঞাকে আবশ্যিকভাবে সংজ্ঞাও বলা হয়। জিন্‌সবার্গ এই প্রজাতি ধারণার সপক্ষে নানাপ্রকার শুদ্ধ সংখ্যাগত ও গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন।

এই ধারণা অনুসারে, পৃথিবীতে আমরা যে বহু প্রকার জীব দেখতে পাই, তা প্রকৃতপক্ষে সীমিত কিছুসংখ্যক জীবের প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ কয়েকপ্রকার জাতি (বা Type) পৃথিবীতে বর্তমান এবং তাদের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশই জীববৈচিত্র্যের কারণ। বিভিন্ন সদস্য জীবের মধ্যে ঐ জাতির সব গুণগুলি সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না বলে বৈচিত্র্য (variation) দেখা যায়। সুতরাং অসম্পূর্ণ প্রকাশের (expression) মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যে ঘটে।

(a) এই মতবাদের কয়েকটি বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। যথা, জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন কারণ হতে পারে এবং একটি জাতির একাধিক সদস্যদের মধ্যে বাহ্যিক প্রভেদ ঘটতে পারে। বৈসাদৃশ্যের কারণগুলি অনেক; যথা, যৌনদ্বিরূপতা, বয়স, বহুরূপতা (polymorphism) প্রভৃতি। এই কারণে, পূর্বে পৃথক প্রজাতি হিসাবে গণ্য বহু প্রাণী প্রজাতি মর্যাদা হারিয়েছে এবং দেখা গেছে যে তারা একই প্রজননক্ষম পপুলেশনের সদস্য ভিন্ন কিছু নয়।

(b) সিবলিং প্রজাতিগুলির (Sibling Species) বাহ্যিক গুণাবলী একই হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথক প্রজাতিভুক্ত।

সুতরাং বাহ্যিক বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে প্রজাতি নামকরণের সমস্যা থাকে এবং ত্রুটিপূর্ণ ধারণা তৈরী হয়। এই ধারণার বশবর্তী অনেকে সরে আসেন যদিও কিছু বিজ্ঞানী এখনও এই মতবাদে বিশ্বাসী।

2.3.2 নামবাদভিত্তিক প্রজাতি ধারণা (Nominalistic Species Concept)

বৈজ্ঞানিক অক্কাম ও তাঁর যুক্তিতে বিশ্বাসী বাফন, বিশী, ল্যামার্ক প্রভৃতি মনীষীর মতে প্রকৃতি জীব সৃষ্টি করে মাত্র এবং এইসব জীব-ই পৃথিবীতে বর্তমান (অর্থাৎ এদের অস্তিত্ব আছে) এবং প্রজাতির প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই। প্রজাতি মানুষের কল্পনায় তৈরী একটি ধারণা। বিশীর মতে বহু রকমের জীবকে সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করার অন্য প্রজাতির আবিষ্কার করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এই মতবাদ জনপ্রিয় ছিল। এই প্রজাতি ধারণা পূর্বে উল্লেখিত জাতিরূপ প্রজাতি ধারণায় বর্ণিত প্রকৃত বিশ্বজনীনের (real universal) অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। এইভাবে নামবাদীরা প্রজাতি অস্তিত্বহীন, মনুষ্য কল্পনামাত্র এবং প্রাকৃতিক ঘটনা নয় বলে বর্ণনা করেছেন।

নামবাদভিত্তিক প্রজাতি ধারণা গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ যে কোন লোকের পক্ষে বোঝা সহজ যে প্রাকৃতিক কারণেই শুধুমাত্র প্রজাতি সৃষ্টি হয় এবং মানুষ কখনও তা পারে না। বিবর্তন ও অভিযোজন প্রাকৃতিক ঘটনা এবং এর দ্বারা যে বৈচিত্র্য ঘটে তা কোন প্রজাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। মানুষ শুধুমাত্র যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে ব্যাখ্যা করে।

2.3.3 জৈবিক প্রজাতি ধারণা (Biological Species Concept)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে অনেক বৈজ্ঞানিক যখন অনুভব করলেন যে পূর্ববর্তী দুটি প্রজাতি ধারণা জীবজগতের ক্ষেত্রে অচল, তখন এই জৈবিক প্রজাতি ধারণার জন্ম হয়। এটি প্রথম বলেন বাফন, মেরেম, ভট্ ও ওয়াল্‌শ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ। জর্ডন (1905) অবশ্য প্রথম পরিষ্কারভাবে এই মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদে পূর্ববর্তী মতবাদের কিছু গ্রহণযোগ্য অংশ রয়েছে। জাতিরূপ ধারণায় বর্ণিত প্রজাতির স্বাধীন সত্ত্বা এবং নামবাদের পপুলেশনের সংখ্যাতত্ত্ব এই দুটি জৈবিক প্রজাতি ধারণার অন্তর্গত হয়েছে। আবার পূর্বোক্ত দুটি ধারণা থেকে জৈবিক প্রজাতি ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে। কারণ এই ধারণা বিশ্বাস করে যে প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে তার ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত জীনপুলের বৈশিষ্ট্যের অংশের উপর।

জৈবিক প্রজাতি ধারণা সরলায়িত হয়েছে একটি সত্যের উপর এবং তা হল যে একটি প্রজাতি অন্য প্রজাতি থেকে প্রজননের অক্ষমতা দ্বারা পৃথক। অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্তঃপ্রজাতি প্রজনন হবে এবং আন্তঃপ্রজাতি প্রজনন ঘটবে না। কারণ একটি প্রজাতির সব জীন স্বাধীনভাবে সদস্যদের মধ্যে বাহিত (flow) হয়। মায়ার (1942) প্রদত্ত প্রজাতির সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

অনেকের ধারণা আছে যে জৈবিক প্রজাতি ধারণায় 'জৈবিক' শব্দটি ব্যবহারের কারণ এই যে এই ধারণায় 'জীবের' সম্পর্কে বলা হয়। কিন্তু এটি ভ্রান্ত ধারণা। এখানে 'জৈবিক' কথার অর্থ হল যে এর সংজ্ঞায় জৈবিক বিষয় (বৈশিষ্ট্য) অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে।

2.3.3.1 জৈবিক প্রজাতি ধারণার তিনটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য

(a) প্রজাতি একটি প্রজননক্ষম প্রাণীগোষ্ঠী। একই প্রজাতির সদস্যগণ প্রজননের জন্য কাছে আসে ও উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন করে। বিভিন্ন উপায়ে অন্তঃপ্রজাতি প্রজনন ঘটে।

(b) প্রজাতি বাস্তুতন্ত্রের একটি একক। একটি প্রজাতির সদস্যগণ কোন একটি বাস্তুতন্ত্রে ঐ বাস্তুতন্ত্রের অধীন অন্য সব প্রজাতি ও অজীব বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

(c) প্রজাতি জীনগত একক হিসাবে চিহ্নিত। কারণ এর সদস্যগণ একটি বৃহৎ আন্তঃযোগাযোগ-বিশিষ্ট জীনপুলের (Gene pool) অংশীদার।

2.3.3.2 জৈবিক প্রজাতি ধারণায় পপুলেশন জেনেটিক্স

একটি প্রজাতির অধীন সদস্যগণ একটি জীনপুলের অংশীদার। সুতরাং আন্তঃপ্রজাতি প্রজনন (বা শংকরায়ন) হলে জীনবৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রবাহ বিঘ্নিত হবে। এমন কি অন্য প্রজাতির জীনের ক্ষতিকর অংশ প্রবাহিত হয়ে জীন-দূষণ ঘটতে পারে। সুতরাং অন্তঃপ্রজাতি প্রজনন এইসব দুর্ঘটনা থেকে প্রজাতিকে রক্ষা করে। সংরক্ষিত (মৃত) প্রাণীর নমুনার ক্ষেত্রে এই বিষয় জানা যায় না এবং বহু অন্য

বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরোক্ষ বিচার করা যায়। এইরূপ সংরক্ষিত জীনপুল আইসোলেটিং পদ্ধতি (Isolating mechanism) দ্বারা নিজের আত্মরক্ষা করে। এই জীনপুল বহু প্রজন্ম দ্বারা নির্বাচিত এবং পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে।

2.3.3.3 জৈবিক প্রজাতি ধারণার সীমাবদ্ধতা

তিনটি বিষয়ে জৈবিক প্রজাতি ধারণা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

(a) **তথ্যের অপ্রতুলতা ঃ** প্রত্নতত্ত্ববিদ্ (Paleonotologist) অন্তঃপ্রজাতি প্রজনন বিষয়ে তথ্য পেতে পারেন না। একই কথা সংরক্ষিত (মৃত) প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অনেক সময়ে বিভিন্ন পপুলেশনে একই প্রজাতি এমন বিভিন্নরূপে দেখা যায় যে প্রশ্ন জাগে যে কোনটি হয়ত অন্য প্রজাতি হবে বা শুধুমাত্র বহুরূপতার জন্য এমনটি হয়েছে। সুতরাং জীবন-চক্র পাঠ করে তবেই যৌন-দ্বিরূপতা, বয়সের জন্য বাহ্যিক পার্থক্য বা বহুরূপতা প্রভৃতি বিষয়ে জানা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই জীবন-চক্রের পূর্ণ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

(b) **এক-জনিতৃজনিত প্রজনন (Uniparental reproduction) ঃ** যে সব প্রাণী স্বপরাগযোগ (Self-fertilization), পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenesis), সিউডোগ্যামী (Pseudogamy) এবং অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction) দর্শায়, তাদের ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রজনন বিষয় থাকে না বলে জৈবিক প্রজাতি ধারণা খাটে না।

কোনো কোনো উদ্ভিদবিদ্গণ জৈবিক প্রজাতি ধারণা গ্রহণ করেননি। কারণ উদ্ভিদের মধ্যে শংকরায়ন হামেশাই ঘটে। বাউম (Baum, 1992) দেখিয়েছেন যে অনেক প্রধান বা বড় ট্যাক্সার (major taxa) ক্ষেত্রে প্রজননক্ষমতা ও নৈকট্য একই সাথে যুক্ত নাও হতে পারে। বহু উদ্ভিদ উভলিঙ্গ। বহু পরিণত শংকর উদ্ভিদ বহুদিন ধরে বংশ বিস্তার করে এবং কখনও সফল স্বপরাগযোগ বা ব্যাকক্রস (Back-cross) করে। অবশ্য এই ঘটনাগুলি প্রাণীরাজ্যে ঘটে না। মায়ার (1992) উত্তর আমেরিকার স্থানীয় উদ্ভিদের 93.5% ক্ষেত্রে অবশ্য জৈবিক প্রজাতি ধারণা প্রয়োগ করেছেন।

সবচেয়ে জোরালো আপত্তি তুলেছেন বিজ্ঞানী ডোনোগে (Denoghue, 1985) এবং বলেছেন এই প্রজাতি ধারণার দ্বারা মোনোফাইলেটিক প্রজাতি ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ বলা হচ্ছে যে আন্তঃপ্রজাতি সংমিশ্রণ হবে না।

উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি দূর করার স্বপক্ষে মায়ার (1963) এবং সিম্পসনের (1961) ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। দেখা গেছে এক-পিতৃজনিত অপত্যদের মধ্যে বহুবিধ প্রকটও বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল (মিউটেশন)। সুতরাং এই সমস্ত বাহ্যিক পার্থক্যগুলি একত্রে একটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হবে।

আবার একগুচ্ছ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের সৃষ্টিতে পরিবেশের পার্থক্যের অবদান থাকে এবং পৃথক বিবর্তনের রেখা সৃষ্টি করতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটিস্টার ক্ষেত্রে জীনের আদান-প্রদান একেবারেই হয় না তা সত্য নয়। এদের ক্ষেত্রেও নিয়মিত জীন বিনিময় হয়। এজন জেনোস্পেসিস ধারণার (genospecies concept) উৎপত্তি হয়েছে।

শংকর প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রকৃতিতে কম দেখা যায় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ঘটে না। কিন্তু কৃত্রিম অবস্থায় ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ বা নৈকট্যের কারণে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর শংকরায়ন ঘটে। একইভাবে সিমপ্যাট্রিক প্রাণীদের মধ্যে সহজেই প্রজনন হয়। অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে জীনবহতা (gene flow) খুব সহজ হয়। কিন্তু অ্যালোপ্যাট্রিক প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি সহজ নয় এবং প্রায় শূন্য বলা যায়। নিকট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি সিমপ্যাট্রিক প্রজাতির প্রাকৃতিক শংকর অপত্য সাধারণতঃ নিম্নমানের হয় ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়। এইজাতীয় প্রজাতির প্রজননে নানা দৈহিক, ব্যবহারিক প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়।

(c) **বিবর্তনের মধ্যবর্তী প্রাণীসৃষ্টি ঃ** স্থানীয় প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে থাকাকালীন একটি প্রজাতির সদস্যগণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অন্য প্রজাতি থেকে পৃথক থাকে। যদি ঐ স্থানটির ব্যাপ্তি ঘটে এবং অনেক সময় অতিবাহিত হয়, তবে ধীরে ধীরে একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের আগমন ঘটে (Incipient Speciation)। এইভাবে পৃথক প্রজাতির গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায়, যদিও তখনও পৃথক প্রজাতিতে পরিণত হয়নি। এইসব বিবর্তন মধ্যবর্তী প্রাণীদের ক্ষেত্রে চারটি ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য ছাড়াই প্রজননক্ষমতা লাভ (সিবলিং প্রজাতি), প্রকট বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য অথচ প্রজনন ক্ষমতা হীনতা এবং সাময়িকভাবে প্রজননক্ষমতা লাভ ও শংকরায়ন।

সিমপ্যাট্রিক শংকরায়নের দুটি দিক আছে। দেখা যায় যে পিতৃ প্রজাতিদ্বয় বহুকাল ধরে বিশাল এলাকায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে যদিও কোন জায়গায় শংকরায়ন হয়েছে। এই ধরনের অপত্যদের নামকরণের যোগ্যতা দেওয়া হয় না। আবার কোন ক্ষেত্রে দুটি পৃথক পিতৃ প্রজাতি সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয়ে যায় এবং নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়েছে। যদিও এইরকমের উদাহরণ দেওয়া হয় কিন্তু কোন বিস্তারিত ও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

চতুর্থ ক্ষেত্রটি সেমিস্পেসিস (semispecies), যার বৈশিষ্ট্য প্রজাতি ও উপপ্রজাতির মধ্যবর্তী। তবে শ্রেণীবিন্যাস ও অন্যান্য জটিলতার কারণে এইজাতীয় প্রাণীদের, তাদের নিকটস্থ প্রজাতির অন্তর্গত কথা হয়। একইভাবে সার্কুলার ওভারল্যাপ (circular overlap) ও সীমানারেখার সন্দেহজনক প্রাণীগুলিকে তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী বিবেচনা করা প্রয়োজন।

2.4 বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রজাতির সংজ্ঞা

প্রজাতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে ধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি আলোচনা করে সীমাবদ্ধতা জানা যায়। যে তিনটি মতবাদ আছে তার মধ্যে এখন পর্যন্ত জৈবিক প্রজাতি ধারণা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত। সংখ্যাতত্ত্ব ও জীনতত্ত্ব দ্বারা জৈবিক প্রজাতি ধারণা উন্নত হয়েছে। এখন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রজাতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হল।

মায়ারের (1942) মতে, প্রজাতি একটি প্রাকৃতিক অন্তঃপ্রজননক্ষম জীবগোষ্ঠী যা অন্য এই প্রকারের জীবগোষ্ঠী থেকে আন্তঃপ্রজননক্ষমতা হীনতার মাধ্যমে পৃথক হবে।

মায়ার (1963) বলেছেন শুধুমাত্র পার্থক্যই নয় বরং প্রজাতির স্বকীয়তা বিবেচনা করতে হবে। প্রজাতির যে বিভিন্ন পপুলেশন ছড়িয়ে আছে, তাদের সেই সমস্ত সদস্যের একসাথে বিচার করতে হয় শুধুমাত্র কয়েকটির ভিত্তিতে সমগ্র প্রজাতির পরিচয় হয় না।

সিম্পসন (1945) বলেছেন যে জীনগত প্রজাতির (Genetic Species) সদস্য একটি প্রাকৃতিক গোষ্ঠী যার একটি স্বতন্ত্র জীনপুল আছে এবং কোন একটি সদস্যের বংশগত বৈশিষ্ট্য ঐ গোষ্ঠীর যে কোন অপত্যের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

সিম্পসন (1961) জীবপ্রজাতি (Biospecies) বা বিবর্তনগত প্রজাতি (Evolutionary species) বোঝাতে বলেছেন যে একটি প্রজাতির সদস্যদের অন্য প্রজাতির সদস্যদের থেকে পৃথকভাবে বিবর্তন হবে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব বিবর্তনগত ভূমিকা ও স্তর থাকবে।

ডবজানস্কি (1951) একইভাবে উল্লেখ করেছেন যে প্রজাতি একটি বৃহত্তম জীবগোষ্ঠী যার সদস্যগণ একটি সাধারণ জীনপুলের অংশীদার ও যৌনপ্রজননক্ষম। ফ্লোরকিন (1966) বলেছেন একই প্রজাতির সদস্যদের DNA তে সমসংখ্যক পিউরিন ও পিরিমিডিন বেসের (Purine and Pyrimidine bases) সমন্বয় থাকবে, এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস একই হবে যাতে একই ধরনের প্রোটিন তৈরী হয়। এজন্যে প্রোটিন সংশ্লেষ ব্যবস্থায় অপারেটর, কন্ট্রোলার ও রিপ্লেসর (Operator, Controller and Repressor) অণুগুলির সংজ্ঞা একই হবে। সুতরাং সদস্যদের গঠনগত ও কার্যগত বৈশিষ্ট্য একই হবে এবং সেগুলি পরিবেশে বেঁচে থাকার সহায়ক হয়।

2.5 প্রজাতির পপুলেশন-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দ

ট্যাক্সোনমি নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইতে নানাপ্রকার 'প্রজাতির' উল্লেখ আছে। সেগুলির উপযুক্ত সংজ্ঞা ও প্রয়োজনে ব্যাখ্যা না জানা থাকায় ভ্রান্তির অবকাশ থাকে।

(a) **উপ-প্রজাতি ঃ** প্রজাতি বলতে বিস্তৃত এলাকার সদস্যগণকে বোঝায় এবং তাদের মধ্যে কখনও যথেষ্ট প্রকারভেদ গড়ে ওঠে। এইক্ষেত্রে ট্যাক্সোনমিবিদ ঐপ্রকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীকে উপ-প্রজাতি বলেন।

(b) **পলিটাইপিক প্রজাতি ঃ** যদি কোন প্রজাতির একাধিক উপ-প্রজাতি থাকে, তবে ঐ প্রজাতিকে পলিটাইপিক প্রজাতি বলে।

(c) **মোনোটাইপিক প্রজাতি ঃ** পুর্বের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ উপ-প্রজাতিবিহীন প্রজাতিকে মোনোটাইপিক প্রজাতি বলে।

(d) **ফরমেনক্রিস (Formenkreis of Lorenz, Kleinschmidt) এবং রেজেনক্রিস (Rassenkreis of Rensch) ঃ** এই দুটি প্রকৃতপক্ষে পলিটাইপিক প্রজাতির অন্য নাম এবং প্রতিষ্ঠিত নয়।

(e) **রেস (Race) ঃ** এই শব্দটি বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি একটি স্থানীয় পপুলেশন এবং যদি না উপ-প্রজাতি স্তরে উন্নীত হয় তবে, ট্যাক্সোনমিতে স্বীকৃত হবে না।

উপ-প্রজাতি ও ভৌগোলিক রেস প্রায়ই সমার্থককরে ব্যবহার হয়েছে। অন্যক্ষেত্রে স্থানীয় পপুলেশনের উপ-প্রজাতির অন্তর্গত করে রেস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যেহেতু, যে কোন দুটি বাস্তুসংস্থানের সব বৈশিষ্ট্য হুবহু এক নয়। তাই প্রতিটি উপ-প্রজাতিকে ইকোলজিক্যাল রেস (ecological race) বলা যায়।

(f) **ক্লাইন (Cline) ও আইসোফেন (Isophene)** ঃ ক্লাইন শব্দটি হাক্সলীর (1939) অবদান। একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ক্রমপর্যায় (gradient) দেখা যায় এবং প্রতিটি পর্যায় হল এক একটি ক্লাইন।

ক্লাইনের সমকোণে অবস্থিত প্রাণীগুলির বৈশিষ্ট্য একই প্রকারে হয় এবং এই প্রকারের প্রাণীর অবস্থান একটি রেখার উপর, যাকে আইসোফেন বলে।

(g) **ডিম (Deme)** ঃ মায়ারের (1963) মতে, স্থানীয় পপুলেশনের মধ্যে প্রজাতির কিছু সদস্যের দ্বারা বিবর্তনের একক তৈরী হলে ঐ এককে ডিম বলে।

(h) **ফেনা (Phena)** ঃ ভিন্ন ভিন্ন পপুলেশনের ভিন্ন বৈচিত্র্যের প্রাণীকে (একই প্রজাতিভুক্ত) ফেনা বলা হয়।

(i) **মর্ফ (Morph)** ঃ পলিমরফিক পপুলেশনের (Polymorphic population) প্রতিটি একককে মর্ফ বলে।

(a) থেকে (i) পর্যন্ত শব্দগুলি ট্যাক্সোনমিতে স্বীকৃত না হলেও পপুলেশনের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

2.6 সারাংশ

শ্রেণীবিন্যাস ও প্রাণীর নামকরণে প্রজাতি একটি একক। প্রজাতি সম্পর্কে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধারণার প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রজাতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রজাতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গুণাবলীর সবকিছুই বিচার্য্য।

প্রজাতি একটি অন্তঃপ্রজননক্ষম জীবগোষ্ঠী এবং একটি বা একাধিক বাস্তুতন্ত্রে অবস্থান করে।

জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণায় পৃথিবীতে দৃষ্ট সমস্ত প্রাণীর মাত্র কয়েকটি 'টাইপ' বা জীবের প্রতিনিধি থাকে। কিন্তু বৈষম্য থাকলেই প্রজাতি পৃথক নাও হতে পারে।

নামবাদভিত্তিক ধারণায় প্রজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলা হয় যে সব কিছুই প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীতে বর্তমান। কিন্তু এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ তার বিবর্তনের ও অভিযোজনের ফলে এসেছে। এই ব্যাপারে মানুষ ব্যাখ্যা দিতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে না।

জৈবিক প্রজাতি ধারণা সর্বজনগ্রাহ্য হলেও অযৌনজনন, পারথেনোজেনেসিস ও শংকর প্রাণীর ক্ষেত্রে অসুবিধাকর। তথাপি বিভিন্ন উপায়ে এই অসুবিধা অতিক্রম করে প্রজাতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জৈবিক প্রজাতি ধারণায় প্রজাতি সদস্যগণ একটি জীনপুলের অংশীদার। বিবর্তনের মধ্যবর্তী প্রাণীসমূহ

তাদের গুরুত্ব অনুসারে উপ-প্রজাতি স্তরে ট্যাক্সোনমিতে স্বীকৃত হলেও অধোঃপ্রজাতি (Infra-subspecies) স্তরে স্বীকৃত নয়।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রজাতির সংজ্ঞার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেছেন। সেইগুলি মূলতঃ অন্তঃপ্রজনন, বাস্তুসংস্থান, বিবর্তন ও জীনগত দিকগুলির নিরিখে আলোচিত হয়েছে।

পপুলেশনের একটি প্রজাতি ধীরে ধীরে নানা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। সেইসব বৈশিষ্ট্যের যে ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়, তার জন্যে পিতৃপ্রজাতি থেকে বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথক হতে থাকে। এজন্য যেসব ক্ষুদ্র পপুলেশন সৃষ্টি হয়, তাদের কয়েকটি নামে পরিচিত করা হয়েছে।

2.7 প্রশ্নাবলী

1. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(a) প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত? (b) জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণার প্রবক্তাদের নাম কি কি? (c) সিবলিং প্রজাতি কি? (d) কোন্ সময় ও কাদের মাধ্যমে জৈবিক প্রজাতি ধারণা গড়ে ওঠে? (e) জীনপুল কাকে বলে?

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) _____ প্রজাতি ধারণায় প্রজাতি মনুষ্যসৃষ্ট কল্পনা বলা হয়। (b) প্রজাতি _____ প্রজননক্ষম এবং _____ প্রজনন অক্ষম। (c) একই প্রজাতির _____ জীনপুলের অংশীদার। (d) এক-পিতৃজনিত প্রজননের ব্যাখ্যা _____ ধারণায় ব্যাখ্যা করা যায় না। (e) জৈবিক প্রজাতি ধারণার বিরুদ্ধে দুইজন বৈজ্ঞানিক হলেন _____ ও _____।

3. সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

(a) জৈবিক প্রজাতি ধারণার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ও সীমাবদ্ধতা কি কি? (b) বিভিন্ন বিজ্ঞানী কিভাবে প্রজাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন? (c) জাতিরূপভিত্তিক প্রজাতি ধারণা কি ও কেন গ্রহণযোগ্য হয়নি? (d) পপুলেশন জেনেটিক্স কিভাবে জৈবিক প্রজাতি ধারণাকে সুদৃঢ় করেছে? (e) নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে পপুলেশনের অন্তর্বর্তী দশাগুলি কি কি?

2.8 উত্তরমালা

1. (a) 2.2 ও 2.5(a) দ্রষ্টব্য। (b) 2.3.1 দ্রষ্টব্য। (c) 2.3.1 শেষাংশে দ্রষ্টব্য। (d) 2.3.3 এর প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (e) 2.3.3.1 এবং 2.4 এর অংশবিশেষ দ্রষ্টব্য।

2. (a) নামবাদভিত্তিক। (b) অন্তঃ, আন্তঃ। (c) সদস্যগণ। (d) জৈবিক প্রজাতি। (e) বাউম, ডোনেগে।

3. (a) 2.3.3.1 ও 2.3.3.3 দ্রষ্টব্য। (b) 2.4 দ্রষ্টব্য। (c) 2.3.1 দ্রষ্টব্য। (d) 2.3.3.2 দ্রষ্টব্য। (e) 2.5 দ্রষ্টব্য।

একক 3 ❑ শ্রেণীবিন্যাসের ধারণা ও প্রাণী নামকরণের নীতিসমূহ

গঠন

3.0 প্রস্তাবনা

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞা

3.3 সনাক্তকরণ (Identification) এবং শ্রেণীবিন্যাসের পার্থক্য

3.4 আদর্শ শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

3.5 শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাস

- 3.5.1 প্রথম পর্যায়
- 3.5.2 দ্বিতীয় পর্যায়
- 3.5.3 তৃতীয় পর্যায়
- 3.5.4 চতুর্থ পর্যায়
- 3.5.5 পঞ্চম পর্যায়
- 3.5.6 ষষ্ঠ পর্যায়

3.6 শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্বসমূহ (Theories of Classification)

- 3.6.1 আবশ্যিকতাবাদের ব্যাখ্যা
- 3.6.2 নামবাদের ব্যাখ্যা
- 3.6.3 অভিজ্ঞতাবাদের ব্যাখ্যা
- 3.6.4 ক্ল্যাডিজ্‌ম্‌-এর ব্যাখ্যা
- 3.6.5 বিবর্তনগত শ্রেণীবিন্যাস (Evolutionary Classification)

3.7 প্রাণী নামকরণের নীতিসমূহ

- 3.7.1 নামকরণ সংক্রান্ত মুখ্য বিষয়
  - 3.7.1.1 নিয়মগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য
  - 3.7.1.2 প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission on Zoological Nomenclature)
  - 3.7.1.3 প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড (International Code of Zoological Nomeneclature, সংক্ষেপে ICZN)
  - 3.7.1.4 আন্তর্জাতিক প্রাণীবিজ্ঞান মহাসভা (International Congress of Zoology)

3.7.2 নামকরণের প্রধান নীতিসমূহ

3.7.2.1 গ্রাহ্য নামকরণের শুরু ও স্বাধীনতা

3.7.2.2 নামকরণে শব্দের সংখ্যা

3.7.2.3 নামকরণের ভাষা, লিঙ্গ, পদ ও বচন

3.7.2.4 পূর্বিতার আইন (Law of Priority)

3.7.2.5 সমনাম (Homonymy)

3.7.2.6 প্রণেতার পরিচিতি

3.7.2.7 টাইপ ধারণা (Type Concept)

3.8 সারাংশ

3.9 প্রশ্নাবলী

3.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

3.11 উত্তরমালা

3.0 প্রস্তাবনা

যে-কোন জীন খাদ্য-অখাদ্য, শত্রু-মিত্রের প্রকারভেদ করতে পারে। মানুষও সুপ্রাচীনকাল থেকে উপকারী বা অপকারী প্রাণী/উদ্ভিদ চিনতে শেখেছে। এইগুলির সে বিশেষ নামকরণ করে অন্যের কাছে পরিচিত করেছে। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে যে সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য রয়েছে তাও লক্ষ্য করেছে।

সভ্যতার সাথে সাথে মানুষ প্রাণী আবিষ্কার করতে থাকে এবং বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্কের ভিত্তিতে সেগুলি বিভিন্ন দল বা উপদলে বিভক্ত করে। বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব অনুসারে ক্রমশ এই স্তরগুলির বিভাজন হয় এবং প্রয়োজনে উচ্চস্তরের ব্যবহার হয়।

সুতরাং শ্রেণীবিন্যাস বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। এইগুলির কারণ অনুসন্ধান করা হয় এবং বিবর্তন ও অভিযোজন ব্যাখ্যা করা হয়।

প্রাণীদের পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় ও নামে জানা যেত। এই নামকরণের কোন নীতি না থাকায় নানা অসুবিধা হতে থাকে। এজন্য বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীগণ একত্রে নামকরণের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন ও কোড প্রচলন করেন। প্রয়োজনে এইগুলির পরিমার্জন করা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহু পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস তৈরী হয়েছে। শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্বকে জন্ম দিয়েছে। এর মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে তা আসলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। পরবর্তীকালে শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণের

নীতিগুলি সূক্ষ্ম দিকগুলি এবং বেশ কিছু শব্দকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অন্যথায় অন্য অর্থের অবকাশ থেকে যায়।

3.1 উদ্দেশ্য

- নিয়ম মেনে প্রাণীদের নামকরণ করা, যাতে এক নামে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় ঐ প্রাণীকে সনাক্ত করা যায়।
- বিভিন্ন প্রাণীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য জানা এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক জানা।
- বিবর্তনের ধারা ও পদ্ধতি জানতে পারা।
- শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাস ও তত্ত্বগুলি জানা।
- শ্রেণীবিন্যাস পূর্বাভাষ করতে পারে। একটি ট্যাক্সনের জীন বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে তার অংগসংস্থান, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বলা যায়।
- ট্যাক্সার স্তর (Rank) নির্ধারণের কারণ ও যৌক্তিকতা বিচার করতে শ্রেণী বিন্যাসের ভূমিকা রয়েছে।
- প্রাণী নামকরণের নীতিসমূহ জানতে পারা।

3.2 শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞা

প্রাণীসমূহকে তাদের অর্ন্তনিহিত সাদৃশ্য ও সম্পর্কের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে (Group) সাজানকে (Ordering) শ্রেণীবিন্যাস বলে। এখানে সম্পর্ক (Relationship) বলতে শুধুমাত্র জৈবিক সম্পর্কের কথা বলা হয়নি (Mayr, 1965)।

3.3 সনাক্তকরণ (Identification) এবং শ্রেণীবিন্যাসের পার্থক্য

বহু ক্ষেত্রে সনাক্তকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসকে এক মনে করা হয়। বস্তুতপক্ষে সনাক্তকরণ কাজে কয়েকটি প্রাণীমাত্র ব্যবহৃত হয়; এগুলির এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পূর্ব নির্দিষ্ট কয়েকটি ট্যাক্সনের কোনটিতে রাখা হয়। শ্রেণীবিন্যাস করার সময় সমগ্র প্রাণী সম্প্রদায়কে (Population) ধরা হয়; তাদের একাধিক ও সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

3.4 আদর্শ শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

(a) একটি আদর্শ ও গ্রহণযোগ্য শ্রেণীবিন্যাস সমস্ত প্রাণীকে তার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উপযুক্তস্থানে সজ্জিত (Ranking) করবে।

(b) শ্রেণীবিন্যাস একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে হয়। শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে কাছাকাছি অথবা দূরবর্তী ট্যাক্সনের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা যায়। এর মধ্যে বিবর্তনের ব্যাখ্যা থাকে।

(c) যেহেতু বৈশিষ্ট্যের ও সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, সুতরাং একই জাতীয় (এবং একই জীনোটাইপের) প্রাণী দলভুক্ত হবে। অপরপক্ষে জীনোটইপ জানা থাকলে, অনায়াসে ঐ প্রাণীর যে-কোন বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাষ করা যাবে।

(d) যত উন্নত প্রাণী (বা বিবর্তনে সবচেয়ে নতুন প্রাণী) হবে তার জীনোটাইপ তত জটিল হবে। কারণ সরল প্রাণীর থেকে জটিল প্রাণীতে বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা বাড়বে এবং শ্রেণীবিন্যাসে ততই উচ্চস্তরে (Rank) সে প্রতিষ্ঠিত হবে।

(e) শ্রেণীবিন্যাস পরিবর্তন সাপেক্ষ। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত, শ্রেণীবিন্যাসের নীতি ও বৈশিষ্ট্য নতুন পরীক্ষালব্ধ বিষয়ের ভিত্তিতে পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হবে।

(f) প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ হয় যা বর্তমান পরিবেশে অপ্রয়োজনীয়। এগুলি হয়ত পূর্বপুরুষের থেকে চলে এসেছে। এর সাহায্যে সমসংস্থ অঙ্গ / যন্ত্রকে চেনা সম্ভব।

3.5 শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাস

শ্রেণীবিন্যাসে ইতিহাসের উৎপত্তি ও বিস্তার উপযুক্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। মোটামুটিভাবে এটিকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায় (Mayr, 1969)।

3.5.1 প্রথম পর্যায়

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন উপজাতির মানুষ বহু সাধারণ প্রাণী ও উদ্ভিদের নামকরণ করেছেন এবং তাঁদের অনেকে ভাল প্রকৃতিবিদ্ ছিলেন। এমনকি প্রস্তাবিত অনেক নামের দুটি অংশ ছিল (বর্তমান দ্বিপদ নামকরণের মত)। এশিয়া ও আমেরিকার প্রাচীন উপজাতিরা এইভাবে নামকরণ করেছেন এবং প্রাচীন শ্রেণীবিন্যাস তাদের অবদান।

অ্যারিস্টটলকে (384-322 BC) জৈবিক শ্রেণীবিন্যাসের জনক বলা হয়। তিনি লেসবস (Lesbos) দ্বীপে কয়েক বৎসর একাগ্রচিত্তে প্রাণীবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করেন। তিনি বলেছেন **প্রাণীর বৈশিষ্ট্য তার জীবনযাত্রা, কার্য, বাসস্থান ও অংগসংস্থাননের মধ্যে নিহিত থাকে।** তাঁর মতবাদ ও পদ্ধতি পূর্বেকার বিক্ষিপ্ত ধারণার অবসান ঘটায় ও তা পরবর্তী দুই হাজার বৎসর ধরে চলেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারা বহু প্রকৃতিবিদকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর উত্তরসূরী লিনিয়াস 'টাইপোলজিক্যাল' বা জাতিরূপ ভিত্তিক মতবাদ প্রচলন করেন।

লিনিয়াসের পূর্বে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন রে (1627-1705) একটি প্রাকৃতিক ও উচ্চতর শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

3.5.2 দ্বিতীয় পর্যায়

সুইডেনের বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ্ ক্যারোলাস লিনিয়াস (1707-1778) শ্রেণীবিন্যাসের নতুন দিগন্ত রচনা করেন। তাঁর দেওয়া বহু প্রাণীর নাম এখনও প্রচলিত আছে। **তাঁকে নামকরণের জনক বলা হয়।** তিনি

দ্বিপদ নামকরণ (Binominal Nomenclature) প্রবর্তন করেন এবং **সিস্টেমা ন্যাচুরীর দশম সংস্করণে তা মুদ্রিত হয় (10th Edition of Systema Naturae, 1758)**।

প্রথম একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হত। বিশেষ অভিযোজন বা আপাতগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত চাবিরূপ (Dichotomous key) শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। এর ফলে অনেক সময় নানা বিজাতীয় প্রাণী একই গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিল। এইভাবে **কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস (Artificial Classification)** সৃষ্টি হয়। শীঘ্র এই পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস একত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ধীরে ধীরে একাধিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয় এবং যেসব প্রাণীর একাধিক বৈশিষ্ট্য একই, তাদের একটি দলভুক্ত করা হল। লিনিয়াস এইভাবে পতঙ্গের যে শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন, তা অনেকাংশে এখনও ব্যবহৃত হয়।

লিনিয়াসের মতাদর্শ সমাদৃত হলেও তৎকালীন ও পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ এর বিভিন্ন দিকের সমালোচনা করেন এবং নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়।

3.5.3 তৃতীয় পর্যায়

লিনিয়াসের সিস্টেমা ন্যাচুরীর প্রকাশনা ও ডারউইনের প্রজাতির উৎপত্তি (Origin of Species) পুস্তকের মধ্যে এক শতাব্দীর পার্থক্য। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। লিনিয়াসের প্রবর্তিত প্রাকৃতিক পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অ্যারিস্টটল-লিনিয়াস মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটে।

লিনিয়াস প্রাণীদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর (Natures) ভিত্তিতে প্রাকৃতিক পদ্ধতির (Natural System) ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীগণ বলেন যে শুধুমাত্র **বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতার (Totality of characters) ভিত্তিতে করা উচিত**। এইভাবে অ্যারিস্টটল যাকে 'প্রাকৃতিক' বলেছিলেন তা এখন কৃত্রিম (Artificial) বলে পরিচিত হয়। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল নানাস্থানের বহু প্রাণীর আবিষ্কার ও শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টা। এখন শুধু বৈশিষ্ট্য নয়, বরং প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদ ও তার কারণ অনুসন্ধান করতে হল এবং সেগুলি কিভাবে ঐ প্রাণীদের প্রভাবিত করেছে তা জানার চেষ্টা করা হল। এইভাবে অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) জন্ম নেয়। এই সময়েই বৈশিষ্ট্যের বিবর্তনের উপর জোর দেওয়ার নীতি (Principles of posteriori weighting of characters) গ্রহণ করা হয়। এই নীতি অনুসারে একটি বৈশিষ্ট্য অন্যসব বৈশিষ্ট্যের সাথে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং তা কতটা বিচার করা হয়। এই মতবাদ দুটি ট্যাক্সনের মাঝের শূন্যস্থান ব্যাখ্যা করেছে এবং বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে (Catagory) হায়ারার্কিতে সাজানোর নিয়ম সমর্থন করে।

এই সময়ের বিজ্ঞানী ল্যামার্ক (1744-1829) শ্রেণীবিন্যাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেননি। কিউভিয়র (1769-1832) অবশ্য শ্রেণীবিন্যাসকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস তৈরী হয়েছিল।

3.5.4 চতুর্থ পর্যায়

চার্লস ডারউইন (1809-1882) বিগ্‌ল জাহাজে (H.M.S. Beagle) 1831 সালে যে পর্যটন করেন তাকে প্রাণীদের বিস্তার, প্রকরণ, গঠন এবং অভিযোজন লক্ষ্য করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা শ্রেণীবিন্যাসকে নতুন তত্ত্বসমৃদ্ধ করেন। তিনি শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

(a) প্রত্যেক প্রাণীগোষ্ঠীর 'প্রাকৃতিক অস্তিত্ব' আছে, কারণ সব প্রাণীর পূর্বপুরুষ আছে বা ছিল। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী ট্যাক্সা আবিষ্কার করেন, এবং প্রকৃতি তা তৈরী করে রেখেছে।

(b) বিবর্তনবাদ প্রথাগত শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিকে আরো ভালোভাবে যুক্তিনির্ভর করেছে।

(c) জাতিজনির (Phylogeny) দুটি ভাগে রয়েছে; প্রথমটি শাখাসৃষ্টি (Branching) এবং দ্বিতীয়টি বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন হারে প্রশাখার বিস্তার (Divergence)। একজাতীয় প্রাণীর (Taxon) আলাদা হওয়ার (Branching) জন্য উপযুক্ত বিশেষত্ব তৈরী হবে। ট্যাক্সনগুলিতে কোন কোন বৈশিষ্ট্য কতটা পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে তার ভিত্তিতে ঐ ট্যাক্সনগুলির প্রাণীরাজ্যে (বা হায়ারার্কিতে) অবস্থান (Rank) নির্ধারিত হবে।

(d) অভিজ্ঞতাবাদীদের (Empiricists) মত ডারউইনও পূর্বনির্দিষ্ট ও নিয়মবর্হিভূত বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়ার (Priori weighting of characters) বিরুদ্ধে ছিলেন। ডারউইন তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবর্তনগত বৈশিষ্ট্যের (Posteriori weighting) ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করতে বললেন। এইভাবে করলে দেখা যায় কিছু বৈশিষ্ট্য সবসময় নিকট সম্পর্কের প্রাণীদের মধ্যে থাকছে; বিশেষতঃ যেগুলি অন্যপ্রকার পরিবেশে রয়েছে, তাদের মধ্যেও থাকবে। এইপ্রকারে বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদীরা তাদের সৃষ্ট শ্রেণীবিন্যাসের সপক্ষে জোরালো সমর্থন লাভ করেন।

3.5.5 পঞ্চম পর্যায়

একই জাতীয় প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নতা দর্শায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলিটিপিক প্রজাতির (2.5 দ্রষ্টব্য) ধারণা তৈরী হয়। জে. এস. হাক্সলী (1940) একে নব সিস্টেমেটিক্স (New Systematics, 1.5.2 দ্রষ্টব্য) নামে অভিহিত করেন। শ্রেণীবিন্যাসের সময় মনে রাখতে হবে প্রকৃতিতে অবস্থিত প্রতিটি প্রাণী সমজাতীয় প্রাণীর বৃহৎ ও বিভিন্ন পপুলেশনের সদস্য এবং নমুনা মাত্র।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান এরপর নতুন দিকে দৃষ্টি দেয়। পপুলেশন ধারণার পর বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরিবেশে অবস্থিত প্রাণীর আচার-ব্যবহার, জীবনচক্র এবং পরিবেশের জীব-অজীব বস্তুর সাথে কিভাবে থাকছে— এ সবই অনুসন্ধান করেন। ফলে শ্রেণীবিন্যাস প্রকৃত অর্থে জৈবিক ট্যাক্সোনমিতে (Biological Taxonomy) পরিণত হয়।

3.5.6 ষষ্ঠ পর্যায়

এই পর্যায়ে পপুলেশন জেনেটিক্সের ধারণা শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে এসে যায়। এই সময়ে তিন প্রকারে শ্রেণীবিন্যাসের উন্নতি হয়। প্রথমত সম্পূর্ণ শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্বকে নতুন ভাবে চিন্তা করা বা যাচাই করা। এই কাজে যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তাঁরা হলেন হেনিগ (1950, 1966), রিমেন (1952), গ্রেগ (1954), কেন (1958), সিম্পসন (1961), গুন্থার (1962), এবং মায়ার (1965b)।

দ্বিতীয়ত কম্প্যুটারের ব্যবহার এবং নামবাদী দৃষ্টিতে ট্যাক্সোনমির কাজ করা। এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন শোকল ও স্নিথ (1963)।

তৃতীয়ত জৈব রসায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন ও আণবিক জীববিদদের মধ্যে বিবর্তনের চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ।

3.6 শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্বসমূহ (Theories of Classification)

শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাসে পাঠে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকটি অর্থহীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল; যেমন—প্রাকৃতিক দলের স্থাপনা (Natural groups), প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের (Essential properties) ভিত্তিতে প্রাণীকে প্রজাতিভুক্ত করা অথবা প্রাকৃতিক নৈকট্য (Natural affinity) দর্শানোর মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাস করা।

শ্রেণীবিন্যাসের পাঁচটি তত্ত্ব পাওয়া যায় এবং এগুলি মৌলিক অথবা মিশ্র প্রকৃতির। যথা—

- আবশ্যিকতাবাদ (Essentialism)
- নামবাদ (Nominalism)
- অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)
- ক্ল্যাডিজ্‌ম (Cladism)
- বিবর্তনগত শ্রেণীবিন্যাস (Evolutionary Classification)

প্রথম তিনটির বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (3.5 দ্রষ্টব্য)। এখানে এইগুলির শুধু ব্যাখ্যা করা হবে। শেষের দুটি ডারউইন-পরবর্তী সময়ের।

3.6.1 আবশ্যিকতাবাদের ব্যাখ্যা

অ্যারিষ্টট্‌ল, লিনিয়াস ও আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এইটি টাইপোলজিক্যাল নামেও পরিচিত।

কার্ল-পপার (1950) বলেছেন যে প্লেটো ও তাঁর অনুসারীদের মতে প্রত্যেক প্রাণীর কিছু অন্তর্নিহিত সত্য (বৈশিষ্ট্য) থাকে যা অনুধাবন করা বিজ্ঞানীর দায়িত্ব। একটি ট্যাক্সনের সব প্রাণী একই প্রকারের (Type) হয় কারণ তাদের মধ্যে এই আবশ্যিক গুণ বর্তমান।

আবশ্যিকতাবাদের অসম্পূর্ণতা

(a) আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য কোনগুলি ও কেন এবং অন্য কোন বৈশিষ্ট্য আবশ্যিক নয় কেন জানা যায় না।

(b) 'সাধারণ বৈশিষ্ট্য' (Characters in common) একটি ত্রুটিপূর্ণ শব্দ (সিম্পসন, 1961)। এইগুলি দুভাবে প্রাণীতে আসে, যেমন, যদি তারা একই পূর্বপুরুষের অন্তর্গত হয়, অথবা যদি তাদের একই প্রকার অভিযোজন হয়। আবশ্যিকতাবাদ এই দুটির পার্থক্য করতে পারে না।

সামগ্রিক বিচারে কিছু প্রজাতি একটি উচ্চতর ট্যাক্সনের অন্তর্গত হতে পারে অথচ তাদের মধ্যে কিছু 'আবশ্যিক গুণাবলী' উপস্থিত নেই।

3.6.2 নামবাদের ব্যাখ্যা

এই তত্ত্ব অনুসারে মানুষ তার প্রয়োজনে একদল সমজাতীয় প্রাণীর একটি নাম প্রদান করে। অর্থাৎ নামটির কোন অস্তিত্ব নেই, বরং প্রাণীটির আছে। এইভাবে দল, শ্রেণী, 'টাইপ', প্রজাতি ও উচ্চতর ট্যাক্সন— এ সবই মানুষের মনগড়া নাম। গিলমোর (1940) এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে প্রাণীদের বহু বৈশিষ্ট্য একজন্য বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন এবং প্রাণীদের দলবদ্ধ করেন। কোন বৈশিষ্ট্যের তারতম্য থাকতে পারে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এইভাবে কারণ বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের দ্বারা যে শ্রেণীবিন্যাস করা হবে তা বিজ্ঞানী ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবেন। প্রাণী, উদ্ভিদ ও অপ্রাণীর ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য।

নামবাদের অসম্পূর্ণতা

(a) প্রাণী ও অপ্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসের নীতি এক হতে পারে না।

(b) প্রাণীর জিনোটাইপে তার বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ থাকে এবং এটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। এইভাবে পক্ষী, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক প্রাণীগোষ্ঠী। মনগড়া নয়।

(c) প্রাণীদের সাদৃশ্য (Similarity) এবং সম্পর্ক (Relationship) বলতে পরিষ্কার ধারণার অভাব নামবাদে রয়েছে।

শোকল ও স্মিথের দৃষ্টিতে নামবাদ

শোকল ও স্মিথ (1963) নামবাদ দর্শনের নীতি গ্রহণ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেছেন যে, সাদৃশ্যের তারতম্যের ভিত্তিতে একটি ট্যাক্সন তৈরী হয় এবং এর ফলে যে শ্রেণীবিন্যাস তৈরী হয় সেটি বিবর্তন তত্ত্বে তৈরী শ্রেণীবিন্যাসের মত হয়ে যায়। কারণ দুটি প্রাণীর মধ্যে নিকট-সাদৃশ্য থাকবে যদি তারা পুরুষানুক্রমে কাছাকাছি বংশের হয়।

ফেনেটিক (Phenetic) ধারায় তৈরী শ্রেণীবিন্যাস খুব বেশী উপযুক্ত হয় না, কারণ সব বৈশিষ্ট্যের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। মোসেইক বিবর্তন (Mosaic Evolution), বিশেষ অভিযোজন, অভিসারী বিবর্তন,

জেনেটিক কারণ প্রভৃতির দ্বারা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে এবং এর সাথে জাতিজনির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা অসুবিধাজনক হয়।

3.6.3 অভিজ্ঞতাবাদের ব্যাখ্যা

এই মতবাদ শ্রেণীবিন্যাসের জন্য কোন তত্ত্বের প্রয়োজন অনুভব করে না। বলা হয় যে, প্রচুর বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করে সেগুলিকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করা হবে এবং এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে যে শ্রেণীবিন্যাস গড়ে ওঠে তা প্রাকৃতিক পদ্ধতির মত হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে এখানে যে 'প্রাকৃতিক' কথাটি ব্যবহৃত হয় তার অর্থ-ও অ্যারিস্টট্‌লের চিন্তাধারার 'প্রাকৃতিক' কথাটির অর্থ পৃথক (3.5.3 দ্রষ্টব্য)।

অভিজ্ঞতাবাদের অসম্পূর্ণতা

অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করতে হলে বিজ্ঞানীগণ অনুভব করেছেন যে শ্রেণীবিন্যাসটি জৈবিকভাবে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে, কারণ এটি কোন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

3.6.4 ক্ল্যাডিজ্‌ম্-এর ব্যাখ্যা

বিজ্ঞানী হেনিগ (1950, 1966) ও অন্যান্যদের মতে প্রাণীদের বিভিন্ন স্তরে (Rank) সাজানোর জন্য তাদের সাধারণ অপত্যদের প্রাচীন থেকে নবীনক্রমে যাচাই করতে হবে। গিসিন (1964) একে জিনিওলজিক্যাল পন্থা (Genealogical approach) বলেছেন।

ক্ল্যাডিজ্‌ম বুঝতে প্রথমে সাবধান হওয়া দরকার যে, এটি এবং জাতিজনি (Phylogeny) কথাটির মধ্যে পার্থক্য আছে। ক্ল্যাডিস্টগণ অনেক সময় ভুল করে নিজেদেরকে জাতিজনি তাত্ত্বিকগণের (Phylogenetic School) অন্তর্গত করেছেন বলে 1950 সাল থেকে বহু বাদানুবাদ হয়েছে।

ক্ল্যাডিজমের অসম্পূর্ণতা ও তার বিশদ আলোচনা

(a) বিবর্তনের দিক থেকে 'আত্মীয়তা' (Relationship) কথাটির প্রকৃত অর্থ ক্ল্যাডিস্টদের কাছে পরিষ্কার নয়। আত্মীয়তা নির্ধারণে জাতিজনির দুটি পদ্ধতির প্রয়োজন, যথা প্রথমে শাখা সৃষ্টি (Branching) এবং পরে অপসারী প্রশাখা বিস্তার (Divergence)। ডারউইনের (1859) মতে ক্ল্যাডিস্টগণ এই বিষয়ে জোর দেননি।

(b) ক্ল্যাডিজমের 'আত্মীয়তা' জিনিওলজী দ্বারা প্রকাশ করলে ভুল হবে। মায়ার (1965b) তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে জাতিজনিতে কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ বংশ অতিবাহিত হয় এবং সেই সময়ের মধ্যে জীন ফ্রিকোয়েন্সী (Gene frequency) পরিবর্তিত হয় (পরিব্যক্তি, পুনঃবিন্যাস, বাছাই প্রভৃতি কারণে)। অপত্য বংশের এক বা একাধিক প্রজাতি অত্যাধিক বাছাই চাপের (Selection pressure) ফলে নিকট আত্মীয় থেকে দূরে সরে যায় ও জীনোটাইপ পৃথক প্রকৃতির হয়। ফলে তখন আর আত্মীয় বলা সম্ভব হয় না। উদাহরণে মায়ার বলেছেন যে ক্যালিডজ্‌ম অনুসারে কুমীর ও পাখী সবচেয়ে কাছের, তথাপি কুমীর অবশ্যই অন্য সরীসৃপের খুব কাছের আত্মীয়। যদি সম্পূর্ণ জীনোটাইপ দেখা যায় তবে পাখীর জিনোটাইপ কুমীর থেকে একেবারেই আলাদা প্রকৃতির হবে।

(c) হেনিগ বিবর্তনের বিভিন্ন হার উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন যে একজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে যারা উচ্চস্তরে (Supra individual) বর্তমান তাদের মধ্যে প্রজাতি বিভাজন হয় এবং এটি বিবর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জিনিওলজিক্যাল ও জেনেটিক দূরত্বের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

(d) ক্ল্যাডিজ্‌ম অনুসারে পিতৃট্যাক্সনের অস্তিত্ব থাকে না—এটি ভুল সিদ্ধান্ত। শ্যারভ (1965) বলেছেন যে একটি পিতৃ ট্যাক্সন (Parental taxon) থেকে যখন দুটি অপত্য ট্যাক্সা (Sister taxa = Sister groups) তৈরী হয়, তখন পিতৃট্যাক্সা শেষ হয় না। বরং অনেক পিতৃট্যাক্সন বহুকাল, এমনকি একশ মিলিয়ন বৎসরের বেশী অস্তিত্ব বজায় রাখে।

(e) যে সব প্রাণীর জীবাশ্ম কম পাওয়া গেছে, সেইসব প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্ল্যাডিজমের দ্বারা ট্যাক্সনের স্তর (Rank) নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাদৃশ্য যাচাই করে শাখাবিন্দু (Branching point) তৈরী করতে হয়।

(f) অপত্যরেখার (Descendant lines) অসমান অপসারণকে (Unequal divergence) গুরুত্ব না দেওয়ায় ক্ল্যাডিজমে ত্রুটি থেকে গেছে। বিবর্তনবাদী ট্যাক্সোনমিষ্টগণ এই দিকটিতে জোর দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে অপত্য প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের (এবং জীনোটাইপের) পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন।

(g) ক্ল্যাডিজম্‌ তত্ত্বই একমাত্র একপর্বতা (Monophyletic) বিশিষ্ট ট্যাক্সন তৈরী করতে পারে এটা ঠিক নয়। একপর্বতার সংজ্ঞায় সাধারণতঃ বলা হয় যে, একটি ট্যাক্সন একপর্বতা বিশিষ্ট হবে যদি তার সদস্যগণ একই পূর্বপুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়। এটি ভুল ব্যাখ্যা এবং সিম্পসন (1961) তাঁর সংজ্ঞায় বলেছেন যে অব্যবহিত পুর্বপুরুষ ট্যাক্সন অথবা নীচের ট্যাক্সন থেকে যদি এক বা একাধিক অপত্যরেখা (Lineage) উৎপন্ন হয়, তবে একটি একপর্বতা বিশিষ্ট ট্যাক্সন তৈরী হবে। যেমন ম্যামেলিয়া শ্রেণী; সমস্ত ম্যামেলিয়া অব্যবহিত পূর্বপুরুষ ট্যাক্সন থেরাপসিড সরীসৃপ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

(h) ক্ল্যাডিজ্‌ম অনুসারে একপর্বতা বিশিষ্ট ট্যাক্সন তৈরীর জন্য রেট্রোস্পেকটিভ ও প্রস্পেকটিভ ধারণা—দুটিই দরকার, এটি ঠিক নয়। হেনিগের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, একটি প্রধান প্রজাতি (Stem Species) থেকে উৎপন্ন সব প্রজাতি একটি উদ্বতর ট্যাক্সনের অন্তর্গত হবে (Retrospective postulate) এবং যারা ঐ প্রধান প্রজাতি থেকে উৎপন্ন হবে না, তাদের ঐ ট্যাক্সনের বাইরে রাখা হবে (Prospective postulate)। এটা সহজেই বোঝা যায় যে পরের চিন্তাধারা মেনে নিলে বিবর্তনগত অপসারণ (Evolutionary divergence) মিথ্যা হয়ে যায়।

3.6.5 বিবর্তনগত শ্রেণীবিন্যাস (Evolutionary Classfication)

অভিজ্ঞতাবাদ শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা পাখী, মাছ, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু বিবর্তনগত শ্রেণীবিন্যাসে প্রশ্ন করা হয় যে এরা পৃথিবীতে এল কেন এবং অন্যদের সাথে এদের সম্পর্ক কি। সুতরাং ট্যাক্সন পৃথিবীতে বর্তমান, বিজ্ঞানীদের কাজ হল সেগুলিকে আবিষ্কার করা।

এই তত্ত্ব অনুসারে ট্যাক্সনের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অবিচ্ছেদ্য বিষয়রূপে চিন্তা করা হবে। বিভিন্ন ট্যাক্সনের মধ্যে যে সমস্ত খাপছাড়া বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার জৈবিক তাৎপর্য হল অভিযোজন-বিচ্ছুরণ, প্রজাতির নিশ্চিহ্ন হওয়া, অসমান হারে বিবর্তন ইত্যাদি।

জাতিজনির জ্ঞান বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব ও তার প্রকাশের কারণ ব্যাখ্যা করে; আদিম বৈশিষ্ট্য কোনটি এবং এইটি কোনদিকে কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তাও অনুমান করা যায়।

পূর্বেকার তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা ও অসম্পূর্ণতা আলোচনাকালে স্বাভাবিক কারণে বিবর্তনগত ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে।

3.7 প্রাণী নামকরণের নীতিসমূহ

প্রাণীনামকরণ ব্যতীত প্রাণীবিজ্ঞান অস্তিত্বহীন। নামকরণ করার সময় কয়েকটি নীতি ও নিয়ম মেনে চলতে হয়। পূর্বে প্রচলিত বেশ কিছু নিয়ম প্রাণীবিজ্ঞানের সদুদ্দেশ্যে পরিবর্তিত / পরিমার্জিত / সংযোজিত হয়েছে। নীতিগুলি সংখ্যায় অনেক হলেও প্রধান ও সরলগুলি এখানে আলোচিত হবে। অনেক সূক্ষ্মনীতি আছে যেগুলি শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীগণের গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। বিস্তারিত নীতিগুলি নিয়ে জেফ্রি (1989) আলোচনা করেছেন।

3.7.1 নামকরণ সংক্রান্ত মুখ্য বিষয়

নামকরণের নীতিসমূহ আলোচনার পূর্বে এগুলির বৈশিষ্ট্য, দ্বিপদ নামকরণের জন্য যে কমিশন ও তাদের কোড রয়েছে সেগুলি জানা প্রয়োজন।

3.7.1.1 নিয়মগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(a) অদ্বিতীয়তা (Uniqueness)

একই জাতীয় প্রাণীর একাধিক নাম বাতিল হয়ে শুধু একটিই গ্রাহ্য হবে। নামটি এমন হবে যে একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যবহৃত হয়েছে।

(b) বিশ্বজনীনতা (Universality)

প্রতিটি নাম বিশ্বের বৈজ্ঞানিক দ্বারা স্বীকৃত একটি ভাষায় হবে। একটি প্রাণী বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় পরিচিত হলেও তা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

(c) অপরিবর্তনশীলতা (Stability)

যে-কোন নামকরণ একবার হওয়ার পর আর পরিবর্তন হবে না (বিশেষক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা ছাড়া)

3.7.1.2 প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission on Zoological Nomenclature)

বিভিন্ন প্রাণীগোষ্ঠীর উপর যে সব খ্যাতনামা বিজ্ঞানী রয়েছেন, তাঁরা আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং মতামত দেন। এইভাবে কমিশন কাজ করে। এই কমিশন 1985-তে প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড প্রকাশ করে।

3.7.1.3 প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড (International Code of Zoological Nomenclature, সংক্ষেপে ICZN)

কমিশনে গৃহীত কোডের বিশেষত্ব হল যে প্রত্যেক কোড অন্য সব কোড থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেমন, প্রাণীজগতে একটি গণ-নাম একবারই ব্যবহৃত হবে।

কোডের ব্যবহারিক ও বিজ্ঞানগত কোন অসুবিধা থাকলে সেগুলি মহাসভায় (Congress) তুলে ধরা হয়।

3.7.1.4 আন্তর্জাতিক প্রাণীবিজ্ঞান মহাসভা (International Congress of Zoology)

প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কোড প্রথম গৃহীত হয় পঞ্চম আন্তর্জাতিক প্রাণীবিজ্ঞান মহাসভায় (বার্লিন, 1901) এবং ষষ্ঠ মহাসভার (বার্লিন, 1904) পর প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এইরূপ মহাসভা অন্যান্য জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়।

কোডের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি লণ্ডন মহাসভায় (1958) আলোচিত হয় এবং নতুন কোড (New Code) প্রকাশিত হয়।

এখানে মহাসভার (Congress) ক্ষমতা হল আইনগত বিচার করা ও রায় প্রদান করা। কোড এবং কমিশনের পরামর্শগুলি কংগ্রেসে ভোটের মাধ্যমে বিচার্য হবে।

3.7.2 নামকরণের প্রধান নীতিসমূহ

পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক প্রাণীবিজ্ঞান মহাসভায় (London, 1958) গৃহীত আন্তর্জাতিক কোডের পরিমার্জিত সংস্করণ (1964) অনুসারে 86টি আর্টিক্‌ল (Article) ভূমিকা ইত্যাদি রয়েছে। মুখ্য কয়েকটি কোড আলোচনা করা হল।

3.7.2.1 গ্রাহ্য নামকরণের শুরু ও স্বাধীনতা

লিনিয়াসের সিস্টেমা ন্যাচুরীর দশম সংস্করণের (1758) পূর্বেকার সব নাম বাতিল হবে। পৃথিবীতে যে সব প্রাণী আছে বা ছিল শুধুমাত্র সেগুলির নামকরণ করা যাবে। কোন কল্পিত প্রাণী, শংকর প্রাণী বা অধো-উপপ্রজাতির (Infra-subspecies) নাম দেওয়া যাবে না।

এই নামকরণ পদ্ধতি অন্য যে কোন নামকরণ পদ্ধতি থেকে পৃথক ও স্বাধীন হবে।

3.7.2.2 নামকরণের শব্দের সংখ্যা

প্রজাতির নাম দ্বিপদ অর্থাৎ দুটি শব্দের হয়; একটি গণ নাম অন্যটি প্রজাতি নাম। সম্পূর্ণ নাম ইটালিক্স (italicise) করে অর্থাৎ বাঁকা হরফে হবে। হাতে লেখা বা সাধারণভাবে টাইপ মেশিনের লেখায় হলে তা আণ্ডারলাইন করে দিতে হবে। গণ নামের প্রথমঅক্ষর বড় হরফে (Capital letter) হবে। নামের বাকি সব অংশ ছোট হরফে হবে। দুটি শব্দের মধ্যে ফাঁক থাকবে।

প্রজাতির উপরের সবস্তরে নাম একপদের (Uninominal) হবে। কিন্তু উপগণ (Subgenus) ও উপপ্রজাতি (Subspecies) যুক্ত নামে তিনটি / চারটি শব্দ থাকে এবং এটি সম্পূর্ণায়িত করে লেখা হয়ে হবে এরকম ঃ

Genus (গণ)	*Subgenus* (উপগণ)	*Species* (প্রজাতি)	*Subspecies* (উপপ্রজাতি)	*Author* (প্রণেতা)	*Publication of the name* (year) (প্রণয়ন সময়)
ডেকাস	এফ্রোডেকাস	এবারেন্স	নাইগ্রিটাস	হার্ডি	১৯৫৫
Dacus	Afrodacus	aberrans	nigritus	Hardy	1955

3.7.2.3 নামকরণের ভাষা, লিঙ্গ, পদ ও বচন

নামকরণের ভাষা ল্যাটিন অথবা ল্যাটিনের মত (Latinized)। গোত্র-নাম নামবিশেষ্য, গণ-নাম বিশেষ্য, কর্তকারকে একবচন এবং প্রজাতি-নাম-গণ-নামের বিশেষণ ও লিঙ্গ অনুযায়ী হবে। গণ-নাম ও প্রজাতি-নাম এক হতে পারে। তবে নতুন নামকরণের ক্ষেত্রে না করা উচিত। একবার প্রকাশিত নাম কখনও বাতিল হবে না।

3.7.2.4 পূর্বিতার আইন (Law of Priority)

একই ট্যাক্সন যদি একাধিক বৈজ্ঞানিক নামে ব্যবহৃত হয় (তা একজন বর্ণিতই হোক বা একাধিকজন বর্ণিতই হোক) ট্যাক্সনের প্রথম প্রকাশিত নামটিই গ্রাহ্য হবে (যতক্ষণ না কোড বা কমিশন বিশেষ বিচারে তা অগ্রাহ্য করে)। একনাম (Synonymy) বা সমনাম (Homonymy) উভয়ক্ষেত্রেই এই নিয়মানুসারে ত্রুটি সংশোধিত হয়। একনামের ত্রুটি (Errors of Synonymy)—বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে যদি কোন নাম সিনিয়র সিনোনিম (Senior synonym) হিসাবে অব্যবহৃত থাকে তবে বাতিল ধরা হবে (Nomen oblitum) এবং এর জন্য কমিশনের রায় নিতে হয়।

স্তরের (Rank) পরিবর্তনে ট্যাক্সনের নামে পূর্বিতা আইনের পরিবর্তন হয় না।

একাধিক গণকে একত্র করে যে একটি গণ-নাম (Group name) হয়, তা ঐ গণগুলির মধ্যেকার সবচেয়ে প্রথম গণ-নাম হয়।

3.7.2.5 সমনাম (Homonymy)

একই বানানে ও একই নামে যদি একই গণভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির নামকরণ হয়ে থাকে, তবে পরে যে নাম হয়েছে, সেটি বাতিল হবে এবং পরের প্রাণীর নতুন নামকরণ করতে হবে।

3.7.2.6 প্রণেতার পরিচিতি

কমিশনের নিয়ম মেনে নামকরণ করলে প্রথম প্রণেতার নাম গ্রহণ করা হবে। কোন সভায় গবেষণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে লেখক নতুন নামকরণ করলে, তিনি প্রণেতা স্বীকৃতির (authorship) অধিকারী হয়ে থাকেন। কোন সভাপতি, পত্রকার বা যারা নামকরণের জন্য গবেষণার কাজে যুক্ত নন তারা এই স্বীকৃতির অধিকারী নন।

প্রণেতার নাম ট্যাক্সন-নামের অংশবিশেষ নয়; কিন্তু কোনরকম যতিচিহ্ন ছাড়াই ট্যাক্সন-নামের পরে প্রণেতার নাম লেখা হয়। ঐ ট্যাক্সনের উপর পরবর্তীকালে গবেষণা করেছেন। এমন বৈজ্ঞানিকের নাম ট্যাক্সন-নামের পর কোলন (:) দিয়ে লেখা চলে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নামোল্লেখে লেখকের নামে শুধু পদবী or surname এর উল্লেখ দরকার এবং তা বৈজ্ঞানিক নামাংশের মত বঙ্কিম ভঙ্গীতে নয়।

যদি প্রণেতার নাম ছাড়াই ট্যাক্সন-নাম প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং পরে যদি প্রণেতার নাম জানা যায় তবে প্রণেতার নাম বর্গ-বন্ধনীর ([ ]) মধ্যে লেখা হয়।

যদি প্রজাতি-নাম অন্য একটি গণে রাখা বা বদলী (Transfer) করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রণেতার নাম প্রথম বন্ধনীর (()) মধ্যে লেখা হয়। প্রয়োজনে পরবর্তী বিজ্ঞানীর নাম প্রথম বিজ্ঞানীর পরে রাখা যেতে পারে। কারণ উভয়েই ঐ ট্যাক্সন নিয়ে গবেষণা করেছেন।

3.7.2.7 টাইপ ধারণা (Type Concept)

একক 1-এ টাইপ ধারণার তত্ত্বগত আলোচনা এবং প্রকারভেদ বলা হয়েছে।

নামকরণের নীতি অনুসারে প্রজাতি নামকরণে 'টাইপ' হল সেই বিশেষ প্রাণীটি (বা প্রাণীর অংশবিশেষ, স্লাইড ইত্যাদি) যার ভিত্তিতে কোড মেনে গবেষক প্রকাশ করেছেন।

গণ-নামকরণে টাইপ হল ঐ নামযুক্ত প্রজাতি (Nominal species) এবং গোত্র নামকরণে টাইপ হল নামযুক্ত গণ (Nominal genus)। সুতরাং প্রজাতিস্তরে নামকরণে টাইপ হল বিশেষ প্রাণীটি; পরবর্তী উর্ধ্বস্তরে পরোক্ষভাবে প্রাণীটিকে বোঝায়।

টাইপ প্রজাতি নির্ধারণের নিয়মবিধি একক 1-এ আলোচিত হয়েছে।

3.8 সারাংশ

শ্রেণীবিন্যাস প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। অ্যারিস্টট্‌লই প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণাবিন্যাস রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে লিনিয়াস, ডারউইন প্রভৃতি মনীষীগণ-এর শ্রীবৃদ্ধি করেন। শ্রেণীবিন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গীর বহু পরিবর্তন হয়েছে।

পারস্পরিক সম্পর্ক, যার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, তার অর্থ প্রথমস্তরে বাহ্যিক ও পরিবর্তী স্তরে জৈবিক ও জাতিজনিগত হয়েছে।

শ্রেণীবিন্যাসের প্রথম যুগে বলা হত যে মাত্র 'আবশ্যিক' অর্থাৎ 'অবশ্যই থাকবে' এরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণীকে একদলে রাখা দরকার। এর ফলে বিজাতীয় প্রাণী একই দলভুক্ত হয়েছে।

নামবাদীরা প্রাণী ও অপ্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস একই মানতেন। কিন্তু জৈবিক বৈশিষ্ট্য যথা বিবর্তন অভিযোজন শুধু প্রাণীর (বা জীবের) মধ্যেই দেখা যায়। এই তত্ত্বে 'সাদৃশ্য' ও 'সম্পর্ক' ঠিকমত বোঝানো হয়নি। শোকল ও স্মিথ নামবাদের ব্যাখ্যায় সাদৃশ্যের তারতম্য ও পুরুষানুক্রমে দেখাতে পারলেও (ফেনেটিক) সব বৈশিষ্ট্যের সমান গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে বিবর্তনের অনেক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

অভিজ্ঞতাবাদ তত্ত্ব নির্ভর নয় বলে গ্রহণযোগ্য হয়নি। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার জ্ঞান নয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

হেনিগের ক্ল্যাডিজম্ শাখা সৃষ্টির (Branching) মাধ্যমে প্রজাতি সৃষ্টি করে এবং সাধারণ অপত্যগুলিকে প্রাচীন থেকে নবীন ক্রমে সাজায়। কিন্তু জাতিজনির অপসারী প্রশাখা সৃষ্টি (Divergence)-অংশ ব্যাখ্যা করেনি। এই তত্ত্বে পিতৃ ট্যাক্সনের মৃত্যু, অপত্য রেখার (Descendant lines) অসমান অপসারণ (Unequal divergence) না মেনে নেওয়া প্রভৃতি আছে; এগুলি ঠিক নয়।

বিবর্তনগত শ্রেণীবিন্যাসে প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিবর্তন ও অভিযোজন, জীনতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনগ্রাহ্য।

প্রাণী নামকরণের জন্য কোড, কমিশন ও মহাসভা তৈরী হয়েছে। নামকরণের নিয়মাবলী থাকায় তা বিজ্ঞাসম্মত ও সর্বজন গ্রাহ্য।

উপরোক্ত নিয়ম ছাড়াও অনেক সূক্ষ্ম নিয়ম ও তার ব্যাখ্যা সাধারণতঃ গবেষণা স্তরে প্রয়োজন হয়। সর্বোপরি কমিশনের ক্ষমতায় বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির সমাধান করা যায়। নামকরণের নীতিতে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানের স্বার্থে বিজ্ঞানীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে।

3.9 প্রশ্নাবলী

1. (a) শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞা কী হওয়া উচিত? (b) শ্রেণীবিন্যাস ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায়ের বিষয়বস্তু কী? (c) শোকল ও স্মিথ কিভাবে নামবাদ ব্যাখ্যা করেছেন? (d) ক্ল্যাডিজমের অসম্পূর্ণতা মায়ার কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? (e) পূর্বিতার আইন বলতে কি বোঝায়?

2. সত্য বা মিথ্যা যাচাই করুন ঃ

(a) সব প্রাণীকে শ্রেণীবিন্যাসে স্থান দেওয়া যায় না। (b) সনাক্তকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস একই। (c) লিনিয়াসকে জৈবিক শ্রেণীবিন্যাসের জনক বলা হয়। (d) ক্ল্যাডিস্টগণ জাতিজনিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেননি। (e) নামকরণ দ্বিপদ বা ত্রিপদ বিশিষ্ট হতে পারে।

3.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. ডারউইনের তথ্যাদি শ্রেণীবিন্যাসকে কী রূপ দেয়? **2.** আদর্শ শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া দরকার? **3.** শ্রেণীবিন্যাসে লিনিয়াসের অবদান কী? **4.** একপর্বতা সম্পর্কে ক্ল্যাডিস্টদের ধারণার অসম্পূর্ণতা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? **5.** নামকরণের নীতিসমূহ কী কী?

3.11 উত্তরমালা

1. (a) 3.2 দ্রষ্টব্য। (b) 3.5.3 দ্রষ্টব্য। (c) 3.6.2-এর ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (d) 3.6.4 এর 'অসম্পূর্ণতা'র। (b) পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (e) 3.7.2.4 দ্রষ্টব্য।

2. (a) মিথ্যা (b) মিথ্যা (b) সত্য (e) সত্য

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. 3.5.3 দ্রষ্টব্য। **2.** 3.4 দ্রষ্টব্য। **3.** 3.5.2 দ্রষ্টব্য। **4.** 3.6.4-এর 'অসম্পূর্ণতা'র (f) ও (g) দ্রষ্টব্য। **5.** 3.7.2 দ্রষ্টব্য।

একক 4 ❑ ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ ও জীবাশ্মবিদ্যা (Geological Time Scale and Fossilization)

গঠন

4.0 প্রস্তাবনা

4.1 উদ্দেশ্য

4.2 ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ এবং উদ্ভিদ ও জীবগোষ্ঠীর বিস্তারের কারণ

4.2.1 ভূতত্ত্বীয় সময় ও কালের বিভাজন

4.2.2 প্রতিটি অধিযুগ, যুগ ও উপযুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

4.3 ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ ও জীবগোষ্ঠীর বিস্তারণের সারণী

4.4 জীবাশ্ম ও জীবাশ্ম সৃষ্টির পদ্ধতি

4.5 জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় অথবা ভূতত্ত্বীয় ঘড়ি (The Clock of the Rock)

4.5.1 জীবন্ত জীবাশ্ম (Living Fossil)

4.5.2 জীবাশ্মের গুরুত্ব

4.6 সারাংশ

4.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

4.8 উত্তরমালা

4.0 প্রস্তাবনা

প্রায় 460 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টিকালে এটি ছিল একটি জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ডবিশেষ। পরে তা গলিত পদার্থের একটি পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। আরও পরে এই গলিত পদার্থের বহির্ভাগে পুরু ম্যান্টেল (Mantle) গঠিত হয়। ম্যান্টেলের মধ্যে উত্তপ্ত গলিত পদার্থগুলি আবদ্ধ হয়ে যায়। এর প্রায় এক শত কোটি বৎসর পর নীলাভ সবুজ শৈবাল (Blue green algae) সৃষ্টি হয়। পৃথিবী যখন থেকে কঠিন হতে শুরু করল তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে ভূতত্ত্বীয় কাল বলা হয়। এই ভূতত্ত্বীয় কালে ভূস্তর তৈরী হয়েছে। স্তরীভূত শিলা মুখ্যত পলল শিলা। ঐ পলল শিলাতেই বেশীরভাগ

জীবসৃষ্টির ইতিহাস পাওয়া যায়। পৃথিবীর ভূতত্ত্বীয় কালের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ছিল। ঐ জলবায়ুতে বেঁচে থাকতে সক্ষম বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। ঐ সব যুগে বেঁচে থাকার সুবিধার জন্য তাদের অঙ্গসংস্থানগত অভিযোজন ঘটেছিল। ফলস্বরূপ বিভিন্নপ্রকার প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল। আবার পরবর্তী যুগে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে বহু প্রাণীর অবলুপ্তিও ঘটেছিল। এইভাবে বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় কালের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসও পাওয়া যায়।

এই এককে ভূতত্ত্বীয় কাল ও কালের সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তারণের ইতিহাস আলোচনা করা হবে। সেই সঙ্গে জীবাশ্ম, জীবাশ্ম সৃষ্টির পদ্ধতি এবং জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতির সঙ্গেও আপনি পরিচিত হবেন।

4.1 উদ্দেশ্য

- পৃথিবীপৃষ্ঠের সৃষ্টির সময়কাল অর্থাৎ ভূতত্ত্বীয় কালের সময়পঞ্জী তৈরী করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় কালের আবহাওয়ার সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তারের ইতিহাসের বিবরণ দিতে পারবেন।
- আধুনিক কালের বিচরণশীল প্রাণীদের বিবর্তনের ঐতিহাসিক বিবৃতি দিতে পারবেন।
- জীবাশ্ম (Fossil) এবং জীবাশ্মসৃষ্টির পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতি বুঝিতে দিতে পারবেন।
- জীবন্ত জীবাশ্মের (Living fossil) উদাহরণ দিতে পারবেন এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে সাধারণ প্রাণী থেকে সেগুলিকে আলাদা করতে পারবেন।

4.2 ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ এবং উদ্ভিদ ও জীবগোষ্ঠীর বিস্তারের কারণ

ভূত্বক যেদিন থেকে কঠিন হতে শুরু করল সেদিন থেকেই স্তরের পর স্তর প্রক্ষেপিত হয়ে শিলাস্তরের সৃষ্টি হল। তাই স্তরীভূত শিলা ভূত্বকের একটি বড় উপাদান। স্তরের পর স্তর ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত হয়ে এই ভূত্বক তৈরী হয়। আবার শিলার এক একটি স্তর যেন পৃথিবীতে জীবনের ইতিহাসের এক একটি পাতা। প্রাচীন থেকে নবীন পর্য্যন্ত স্তরগুলিতে জীবাশ্মের অবস্থান পৃথিবীতে প্রাণীদেহের বিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করে। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে যে সমস্ত শিলাস্তর তৈরী হয়েছে প্রাচীনতার ক্রমানুসারে তাদের একটির উপর একটি রেখে একটি কাল্পনিক ভূস্তরস্তম্ভ্য তৈরী করা যায়। ভূত্বক কঠিনতম অবস্থায় নীত হওয়ার পর থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত সময়কে **ভূতত্ত্বীয় কাল** বলে। এই সময়কালটি 360 কোটি বৎসরের বেশী। ভূতত্ত্বীয় কালকে একাধিক অংশে বিভক্ত এবং উপরিউক্ত করা হয়েছে। ভূতত্ত্বীয় কাল

ভূস্তরস্তম্ভের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। ভূস্তরস্তম্ভের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছেদ বা বিরতি আছে। এই ছেদ বা বিরতির ভিত্তিতে ভূতত্ত্বীয় কালকে বিভক্ত করা হয়। তাই ভূস্তরস্তম্ভের শ্রেণীবিভাগ এবং ভূতত্ত্বীয় কালের শ্রেণীবিভাগ অনুরূপ। যে সকল এককের সমন্বয়ে ভূস্তরস্তম্ভ গঠিত সেই নামানুসারেই ভূতত্ত্বীয় কালের বিভাগগুলিকে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

সমগ্র ভূতত্ত্বীয় কালকে সাতটি বড় শ্রেণী (অধিযুগ বা Era) তে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অধিযুগকে একাধিক যুগ (Period)-এ ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি যুগকে আবার উপযুগ (Epoch)-এ ভাগ করা হয়েছে। আবার জীবাশ্মের ভিত্তিতে কালস্তরীয় একক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জীবাশ্মময় স্তরকে জীবাশ্মগোষ্ঠীর অবস্থান দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক অংশে বিভক্ত করা যায়। এইরূপ অংশগুলিকে জীবস্তরীয় একক বলে। জীবস্তরের এককের নাম জৈবিক অঞ্চল (Biozone)। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। প্রাচীনতম শিলাস্তরে যে উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় তা অত্যন্ত প্রাচীন জীবের। ভূস্তরস্তম্ভের যত আধুনিক শিলাস্তর পাওয়া যায় তাতে প্রাপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের তত আধুনিক প্রাণীর। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভৌত অবস্থা ও জলবায়ুর প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন জীবের অঙ্গসংস্থানের উপর প্রচন্ডভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে প্রাণীদেহের অথবা উদ্ভিদদেহের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ কালস্তরীয় জলবায়ু জৈবিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদগোষ্ঠী পৃথিবীতে বিচরণ করেছে। ভূতত্ত্বীয় সময়কালে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিন্যাসকে জীবের **ভূতত্ত্বীয় বিস্তারণ** (Distribution of plant and animal life in time and space) বলে। আসুন এবার আমরা ভূতত্ত্বীয় ও কালের বিভাজন সম্বন্ধে কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করি।

4.2.1 ভূতত্ত্বীয় সময় ও কালের বিভাজন

ভূতত্ত্বীয় সময় ও কাল সাতটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। এগুলির এক একটি অধিকল্প বা অধিযুগ (Era)। দুটি অধিযুগের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রকার ভূতত্ত্বীয় বিপর্যয় ঘটেছে। এই ভূতত্ত্বীয় বিপর্যয়কে বিপ্লব (Revolution) বলা হয়। প্রতিটি বিপ্লব স্থলভাগ এবং জলভাগকে রূপান্তরিত করেছে। অর্থাৎ কোথাও স্থলভাগ অবনমিত হয়েছে, কোথাও বা উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কোথাও কোথাও স্থলভাগের প্রচন্ড অবনমনের ফলে অন্তর্দেশীয় সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই সব মহাবিপ্লব জীবকূলের বিস্তারকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কখনো বা জীবকূলের উন্নতি ঘটিয়েছে অথবা বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। এই অধিযুগগুলিকে (Era) আবার কয়েকটি যুগ (Period)-এ বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক যুগকে কতকগুলি উপযুগ (Epoch)-এ বিভক্ত করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং 49)

ভূতত্ত্বীয় অধিযুগ

1. অ্যাজোয়িক অধিযুগ (Azoic Era)

2. আর্কিওজোয়িক অধিযুগ (Archaeozoic Era)

3. প্রটেরোজোয়িক অধিযুগ (Proterozoic Era)

4. প্যালিওজোয়িক অধিযুগ বা পুরাজীবীয় অধিযুগ (Palaeozoic Era)

5. মেসোজোয়িক অধিযুগ বা মধ্যজীবীয় অধিযুগ (Mesozoic Era)

6. সিনোজোয়িক অধিযুগ বা নবজীবীয় অধিযুগ (Coenozoic Era)

7. সাইকোজোয়িক অধিযুগ বা মনঃস্তত্বীয় অধিযুগ (Psychozoic Era)

4.22 প্রতিটি অধিযুগ, যুগ ও উপযুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অ্যাজোয়িক অধিযুগ (Azoic Era) : পৃথিবী উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শীতল হতে শুরু করল। ভূপৃষ্ঠ কঠিন হল এবং শিলার সৃষ্টি শুরু হল। এই সময় জীবের আবির্ভাবের পটভূমি তৈরী হতে শুরু করল। সে সময় আগ্নেয়শিলার প্রাধান্য থাকায় জীবনের বা জীবাশ্মের কোন অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আর্কিওজোয়িক অধিযুগ (Archaeozoic Era) : প্রায় দুইশত কোটি বৎসর পর্য্যন্ত এই যুগের স্থায়িত্ব। এই যুগ প্রায় অন্যান্য সকল অধিযুগের সময়ের সমষ্টির সমান। এই যুগে শিলা, পর্বত ও সমুদ্রের সৃষ্টি হয়। ভূমিক্ষয় ও ভূমিসঞ্চয় পদ্ধতির শুরুও এই যুগেই হয়। এ যুগে জীবাশ্ম পাওয়া না গেলেও শিলায় কার্বনের উপস্থিতি এ যুগে জীবরে অস্তিত্ব প্রমাণ করে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে যথাক্রমে 1966 সালে এবং 1968 সালে প্রায় তিনশত কোটি বৎসর পুরানো ব্যাক্টেরিয়া *Ecobacterium isolatum* (ইয়োব্যাক্টেরিয়াম আইসোলেটাম) এবং **নীলাভ সবুজ শৈবাল (Blue-green algae)** সাদৃশ *Archaeospheroides babertonensis* (আর্কিওস্ফেরয়েডস বারবারটোনেনসিস) এর জীবাশ্ম আবিষ্কার করা হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে সকল বিজ্ঞানীরা এখনো একমত হননি। এই অধিযুগের পর **প্রথম মহাবিপ্লব (First Great Revolution)** ঘটেছিল।

প্রটেরোজোয়িক অধিযুগ (Proterozoic Era) : এই যুগকে প্রাচীনতম জীবের যুগ বলা হয়। এই যুগ প্রায় একশত বৎসরকালব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় পুনঃপুনঃ অগ্ন্যুৎপাত, পললসঞ্চয় এবং তুষারপাত ঘটেছিল। অত্যধিক চাপ ও তাপের ফলে অধিকাংশ জীবাশ্মই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তথাপিও সামান্য কিছু জীবাশ্ম এই যুগে পাওয়া গেছে। এই যুগের প্রথমভাগে ব্যাক্টেরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল এবং আদ্যপ্রাণী (Protozoa)-র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। শেষভাগে সামুদ্রিক ছত্রাক এবং সামুদ্রিক বহুকোষী অমেরুদন্ডী প্রাণী (স্পঞ্জ, জেলিফিস, প্রবাল), অঙ্গুরীমাল, কম্বোজ এবং সন্ধিপদ প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রাক্-ক্যাম্বিয়ান যুগের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এই অধিযুগের পর **দ্বিতীয় মহাবিপ্লব (Second Great Revolution)** ঘটেছিল। ফলে প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্মের অবলুপ্তি হয়েছিল।

প্যালিওজোয়িক অধিযুগ (Palaeozoic Era)— (Palaios—প্রাচীন, Zoo—জীবন) ঃ দ্বিতীয় মহাবিপ্লবের পর প্রাক-ক্যাম্বিয়ান যুগের সমাপ্তি ঘটেছিল। পুরাজীবীয় অধিযুগ প্রায় 30 কোটি বৎসর যাবৎ স্থায়ী ছিল। পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী ছাড়া প্রায় সমস্ত পর্বের প্রাণীর-এ যুগেই আবির্ভাব ঘটেছিল। এর মধ্যে প্রচুর প্রাণীর আবার এ যুগেই অবলুপ্তি ঘটেছিল। নীচে এই অধিযুগের অধীনস্থ যুগগুলির বর্ণনা করা হল।

1. ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian) : জলবায়ু নরমভাবাপন্ন হওয়ায় এ যুগে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। এ যুগের প্রায় সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সামুদ্রিক ছিল এবং স্থলভূমি জীববিহীন ছিল। বৃটিশ কলম্বিয়াতে প্রাচীন সন্ধিপদ প্রাণী **পেরিপেটাস (Peripatus)**-এর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এই পেরিপেটাস জাতীয় প্রাণী অঙ্গুরীমাল এবং সন্ধিপদ প্রাণীর মধ্যবর্তী জীব (connecting link)। ব্র্যাকিওপড, কম্বোজ এবং সন্ধিপদ প্রাণীদের মধ্যে ক্রাস্টেশিয়া, অ্যারেকনিডা ও ট্রিলোবাইট এর প্রচুর উন্নতি ঘটেছিল। লিংগুলা (Lingula) জাতীয় ব্রাকিওপড প্রচুর পাওয়া যেত (চিত্র নং 4.1)। বেশিরভাগ প্রাণীরই অঙ্গসংস্থানগত প্রচুর উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু পার্মিয়ান যুগে তাদের বিলুপ্তিও ঘটেছিল।

পেরিপেটাস (Peripatus)

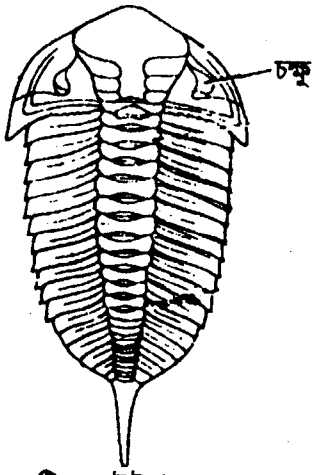

ট্রিলোবাইট (Trilobite)
(পুনর্গঠন দ্বারা আকৃতি প্রদর্শন)

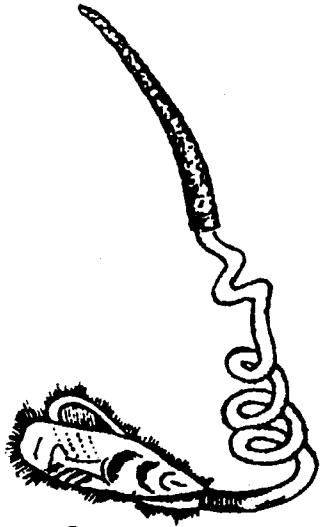

লিংগুলা (Lingula)

চিত্র নং 4.1

2. অরডোভিসিয়ান (Ordovician) : 50 থেকে 44 কোটি বৎসর পূর্বেকার যুগ। এ যুগে সমুদ্র ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। বিশাল বিশাল কম্বোজ প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এ যুগে 5 থেকে 7 মিটার লম্বা ও 30 সেন্টিমিটার চওড়া দৈত্যাকৃতি সেফালোপড পাওয়া গিয়েছে। এ যুগকে তাই **দৈত্যাকৃতি কম্বোজ প্রাণীর যুগ** বলা হয়। মাংসাশী বিছা (Scorpion)-র অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। প্রথম চোয়ালবিহীন মৎস্যজাতীয় অষ্ট্রাকোডারম এর আবির্ভাব ঘটেছিল। সামুদ্রিক শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য ছিল, এ যুগে অবশ্য কোন স্থলজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। প্রবাল (Coral), প্রবালদ্বীপ এবং কন্টকত্বক (Echinodermata) জাতীয় প্রাণীর আধিক্য দেখা যায়।

3. সিলুরিয়ান (Silurian) : প্রায় 44 থেকে 40 কোটি বৎসরকাল পর্য্যন্ত এ যুগের স্থায়িত্ব ছিল। এ যুগেই প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। প্রথম ফুসফুসধারী প্রাণী, ডানাবিহীন পতঙ্গ এবং প্ল্যাকোডার্ম জাতীয় মৎস্যও এ যুগে আবির্ভূত হয়।

4. ডেভোনিয়ান (Devonian) : 40 থেকে 35 কোটি বৎসর পূর্বের যুগ। প্রথম সীড ফার্ন (Seed-fern) অরণ্যের সৃষ্টি হয়। ক্লাব মস (Club moss) এবং হর্সটেল (Horse-tail) জাতীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। এছাড়া জীবন্ত জীবাশ্ম গিংকো (Ginkgo) জাতীয় ব্যক্তবীজী উদ্ভিদও পাওয়া গেছে। এ যুগকে **মৎস্যের যুগ (Age of Fish)** বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে *Melania* (মেলানিয়া) এবং ভারতের উপকূলে *Latimeria* (ল্যাটিমেরিয়া) জাতীয় মৎস্যের প্রাচুর্য ছিল। সমুদ্র লিলি (Sea lily), ব্রাকিওপড এবং ট্রিলোবাইট **(Trilobite** চিত্র নং 4.1)-এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ডেভোনিয়ান যুগের শেষভাগে প্রথম উভচর Labyrinthodont (ল্যাবরিনথোডন্ট)-এর আবির্ভাব ঘটে।

5. কার্বনিফেরাস (Carboniferous) : এ যুগে অন্তর্বর্তী দুটি উপযুগ।

(a) মিসিসিপ্পিয়ান (Mississippian) : 35 থেকে 30 কোটি বৎসর পূর্বের উপযুগ। প্রথমে জলবায়ু উত্তপ্ত ছিল, পরে স্থলভাগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াতেও পরিবর্তন আসে। অগভীর জলাশয় এবং উষ্ণ শুষ্ক মরু অঞ্চল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এই সময় হর্সটেল এবং লাইকোপড জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য ছিল। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। কন্টকত্বক, সালামান্ডার, হাঙ্গর প্রভৃতি প্রাণী আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ব্রাকিওপডের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল।

(b) পেনসিলভেনিয়ান (Pennsylvanian) : 32 কোটি বৎসর পূর্বের উপযুগ। নীচুভূমির সৃষ্টি হয়েছিল। বৃহৎ কয়লাযুক্ত জলাভূমি (swamp)-এর সৃষ্টি হয়েছিল। জলবায়ু আর্দ্র ও নরমভাবাপন্ন ছিল। বিশাল বিশাল ব্যক্তবীজী অরণ্যের বিস্তার ঘটেছিল। সীড ফার্ন উদ্ভিদের অরণ্যের প্রাচুর্য ছিল। এ যুগে প্রচুর পতঙ্গও পাওয়া যেত। প্রাচীন উভচরের বিস্তার এবং সরীসৃপের আবির্ভাব হয়েছিল।

6. পার্মিয়ান (Permian) : 29 থেকে 28 কোটি বৎসর পূর্বের যুগ। এই যুগই পুরাজীবীয় অধিযুগের শেষ যুগ। শীতল ও শুষ্ক আবহাওয়া এ যুগের বৈশিষ্ট্য। স্থলভাগের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের সঙ্কোচন ও পর্বতের সৃষ্টি এই যুগেই হয়েছিল। এ যুগেই প্রথম মহাদেশের আবির্ভাব ঘটে।

এই যুগের পর **অ্যাপ্পালাচিয়ান বিপ্লব (Appalachian Revolution)** ঘটেছিল এবং বরফের বিস্তীর্ণ আস্তরণ সৃষ্টি হয়েছিল। এই বরফ যুগের প্রসারের ফলে বহুসংখ্যক প্রাণীর মৃত্যু হয়েছিল। ট্রিলোবাইট ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ব্র্যাকিওপড, কণ্টকত্বক ও সেফালোপড প্রভৃতি অমেরুদন্ডী প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। জলাভূমির উদ্ভিদের সংখ্যাও কমে গিয়েছিল। লম্বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ সেই স্থান দখল করে নিয়েছিল।

মেসোজোয়িক অধিযুগ (Mesozoic Era) : মেসোজোয়িক অধিযুগকে **সরীসৃপের যুগ (Age of Reptiles)** বলা হয়। এই যুগ প্রায় 17 কোটি বৎসরকাল যাবৎ ব্যাপ্ত ছিল। এই অধিযুগকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়।

1. ট্রায়াসিক (Triassic) : 24 থেকে 20 কোটি বৎসর পর্য্যন্ত এ যুগের স্থায়িত্ব। এ যুগের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ছিল। সীড ফার্নের বিলুপ্তি এবং সাইকাস ও কনিফার অরণ্যের বিস্তার ঘটেছিল। প্রাচীন ষ্টেগোসেফালিয়ানদের অবলুপ্তি ঘটে এবং ডাইনোসরের আবির্ভাব হয়। এদের আয়তনবৃদ্ধি ও সংখ্যাধিক্য ঘটে। সরীসৃপের বিভিন্নমুখী বিস্তারণ এ যুগেই হয়। যেমন খেচর টেরোসর, সামুদ্রিক ইকথায়োসর সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় ডিমপাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণীরও আবির্ভাব হয়।

2. জুরাসিক (Jurassic) : 20 কোটি বৎসর পূর্বের যুগ। উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া এর বৈশিষ্ট্য। মহাদেশগুলির উচ্চতাবৃদ্ধি এবং মহাদেশীয় সমুদ্রের উদ্ভব এ যুগেই হয়। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের আধিক্য দেখা যায় এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে।

প্রাণীদের মধ্যে ডাইনোসরের প্রতাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর্কিওপটেরিক্স (Archaeopteryx) নামক দাঁতওয়ালা পাখীর পূর্বসুরীর আবির্ভাব এ যুগেই ঘটে। পতঙ্গ, শামুক ও বাইভালবের বিবর্তন হয়।

3. ক্রিটেশাস্ (Cretaceous) : 14 কোটি বৎসর পূর্বেকার যুগ। জলবায়ু ক্রমশঃ শীতল হয়ে আসে। রকি, আন্দিজ, আল্পস ও হিমালয় প্রভৃতি পর্বতের সৃষ্টি এ যুগেই হয়। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ক্রমশঃ অবলুপ্তি ঘটে। প্রথম একবীজপত্রী উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। ওক্, মেপল প্রভৃতি অরণ্যের সৃষ্টি হয়।

ডাইনোসরের সর্বাধিক উন্নতিলাভ ঘটে এবং এ যুগের শেষভাগে অবলুপ্তিও ঘটে। দাঁতযুক্ত পাখীর অবলুপ্তি হয় এবং আধুনিক পাখীর উদ্ভব হয়। এ যুগে প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রাচুর্য ছিল।

এ যুগের পর **লারামাইড বিপ্লব (Laramide Revolution)** ঘটে। এই বিপ্লবকে আবার **শিলাপর্বতের বিপ্লব (Rocky Mountain Revolution) বলে।**

নবজীবীয় অধিযুগ (Coenozoic Era) : লারামাইড বিপ্লবের পর এই অধিযুগের সূচনা হয়েছিল। এ যুগে মহাদেশ, সমুদ্র, পর্বত ও নদীর সৃষ্টি হয়। প্রায় 8 কোটি বৎসর ধরে এর বিস্তৃতি ছিল। এই অধিযুগকে স্তন্যপায়ী, পক্ষী, পতঙ্গ ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের যুগ বলা হয়।

এই অধিযুগকে আবার তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। এগুলির নীচে বর্ণনা দেওয়া হল।

1. প্যালিওজিন বা নিম্ন টার্শারী (Palaeogene or Lower Tertiary) : এই যুগকে তিনটি উপযুগে ভাগ করা হয়।

(a) প্যালিওসিন (Palaeocene) : প্রায় 8 কোটি বৎসর আগের যুগ। এই যুগে ক্লাইমেটিক বেল্ট (Climatic belt)-র সৃষ্টি হয়। এ সময়ে জলবায়ু উষ্ণ ছিল। পর্ণমোচী বৃক্ষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিস্তার ও আদি অমরাযুক্ত (Placental) স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব হয়।

(b) ইয়োসিন (Eocene) : 6.5 কোটি বৎসর পূর্বেকার যুগ। এ যুগে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। জলবায়ু উষ্ণ ছিল। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের আধিক্য ও বিবর্তন হয়। তৃণভূমির স্থায়িত্বলাভ ঘটে। অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিস্তার এবং উন্নতি ঘটে।

(c) অলিগোসিন (Oligocene) : প্রায় 3.8 বৎসর পূর্বের যুগ। স্থলভাগের অবনমন ঘটে। জলবায়ু উষ্ণ ছিল। এ সময় অরণ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের আবির্ভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে এবং ক্ষুরযুক্ত প্রাণীর অভিযোজন ঘটে। প্রথম বনমানুষের আবির্ভাব হয়।

2. নিওজিন বা উর্ধ্ব টার্শারী (Neogene or Upper Tertiary) : এই যুগকে আবার দুটি উপযুগে ভাগ করা হয়।

(a) মায়োসিন (Miocene) : 2.5 কোটি বৎসর পূর্বের যুগ। এ যুগে সিয়েরা, কাসকেড পর্বতশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ যুগে উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। তারপর জলবায়ু ধীরে ধীরে শীতল হতে শুরু করে। পর্ণমোচী বৃক্ষের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর সর্বাধিক বিবর্তন ঘটে। এ যুগেই প্রথম মনুষ্যসদৃশ এপস্ (Apes)-এর আবির্ভাব ঘটে।

(b) প্লায়োসিন (Pliocene) : 8 কোটি বৎসর পূর্বের যুগ। এ যুগে বারংবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমপার্শ্বীয় পর্বতমালার উত্থান ঘটে। অরণ্যের অবলুপ্তি হয়। তৃণভূমির আকার এবং আয়তন বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক যুগের সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তন ও বিস্তার এ যুগেই হয়েছিল। এ যুগে প্রথম অষ্ট্রালোপিথেকাস *(Australopithecus)* নামক প্রথম বনমানুষের আবির্ভাব ঘটে। এরাই প্রাক্‌মনুষ্য এপস্ নামে পরিচিত।

প্রথম মহাতুষারযুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

3. কোয়ার্টারনারী (Quaternary) : বারংবার তুষারযুগের আবির্ভাব এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সময় পর পর চারটি তুষারযুগ সংঘটিত হয়েছিল। তুষারযুগের অন্তে আবহাওয়া ধীরে ধীরে উষ্ণ হতে শুরু করে।

এ যুগের অন্তর্বর্তী উপযুগের নাম প্লেসটোসিন।

প্লেসটোসিন (Pleistocene) : প্রায় 10 লক্ষ থেকে 10 হাজার বৎসর পূর্বের যুগ। এ যুগে বিস্তীর্ণ এলাকা বরফের আস্তরণে আচ্ছাদিত ছিল। ফলে পুরাতন প্রজাতির বহু উদ্ভিদের ধ্বংস হয়েছিল। সেই জায়গায় নূতন নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরও অবলুপ্তি ঘটে। শুধুমাত্র লোমশ গণ্ডার, লোমশ ম্যামথ এবং গুহাভল্লুকেরা বেঁচে ছিল। এ যুগেই প্রাণীদের প্রথম সমাজবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত হয়।

এই যুগের শেষে কাসকোডিয়ান বিপ্লব (Casacadian Revolution) ঘটেছিল। ফলে কিছু কিছু জীবাশ্মের ক্ষতিসাধন হয়।

সাইকোজোয়িক অধিযুগ (Psychozoic Era) : এই অধিযুগের অন্তর্বর্তী মাত্র একটি উপযুগ **হলোসিন বা রিসেন্ট (Holocene or Recent)**। এ যুগ প্রায় দশহাজার বৎসর পূর্বে শুরু হয়েছিল এবং অদ্যাবধি চলছে।

তুষারযুগে অবসানে আবহাওয়া ক্রমশঃ উষ্ণ হতে শুরু করে। এ যুগেই বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব এবং আধিক্য ঘটে। বনাঞ্চল বিস্তার লাভ করে।

আধুনিক প্রজাতির মানুষ অর্থাৎ আমরা, *Homo sapiens sapiens* (হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স) আবির্ভূত হই। মানুষের মননশীলতা বৃদ্ধি পায়। বিশ্বসভ্যতার সৃষ্টি হয়। এই যুগকে মানুষের **মনঃস্তাত্ত্বিক জীবনের যুগ** (Era of mental life) বলে।

অনুশীলনী—1

সংক্ষেপে উত্তর দিন :

1. 'ভূতত্ত্বীয় কাল' কাকে বলে? **2.** জৈবিক অঞ্চল বলতে কি বোঝ? **3.** ভূতাত্ত্বিক অধিযুগগুলি কি কি? **4.** ক্যাম্বিয়ান যুগে পাওয়া যেত এরকম একটি মধ্যবর্ত্তী জীবের নাম লিখুন। **5.** কোন্ যুগকে মৎস্যের যুগ বলা হয়? **6.** কার্বনিফেরাস যুগের দুটি উপযুগের নাম লিখুন। **7.** আধুনিক প্রজাতির মানুষ অর্থাৎ আমাদের উদ্ভব কোন সময়ে?

4.3 ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ ও জীবগোষ্ঠীর বিস্তারণের সারণী

ভূতত্ত্বীয় যুগ সম্বন্ধে 4.2 অংশে সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিত্তিতে একটি সারণী প্রস্তুত করা হল। এতে ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ, বিভিন্ন বিপ্লব, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীর বিস্তারের বিবরণ একসঙ্গে দেওয়া হল। (পৃষ্ঠা নং 49)।

ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ এবং জীবগোষ্ঠীর বিস্তারণ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	অধিযুগ (Era)	যুগ (Period)	উপযুগ (Epoch)	বয়স কোটি বর্ষে	প্রধান উদ্ভিদ ও প্রাণী	ভূতত্ত্বীয় আবহাওয়া	প্রধান উদ্ভিদ	প্রধান প্রাণী
ছ	সাইকোজোয়িক (Psychozoic)		হলোসিন (Holocene) বা রিসেন্ট (Recent)	0.011	মানুষের যুগ	তুষারযুগের অবসান, উষ্ণ আবহাওয়া	কাষ্ঠল উদ্ভিদের অবনতি বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের আর্বিভাব	মানুষের যুগ, সভ্যতার শুরু মনস্তাত্ত্বিকযুগের সূচনা (Era of mental life)
	কাসকেডিয়ান রেভলিউশন (Cascadian Revolution)							
ক	সিনোজোয়িক বা নবজীবীয় (Coenozoic)	কোয়াটারনারী (Quaternary)	প্লেসটোসিন (Pleistocene)	0.1	স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং আধুনিক উদ্ভিদের যুগ	বারংবার তুষারযুগ; চারটি তুষারযুগ অন্তে উষ্ণ আবহাওয়া শুরু।	বহু প্রাচীন উদ্ভিদের অবলুপ্তি	বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবলুপ্তি; প্রাচীন মানুষের সামাজিক জীবন শুরু।
ম		নিওজিন (Neogene) বা উর্ধ্ব টার্শারী (Upper Tertiary)	প্লায়োসিন (Pliocene)	0.8		অগ্ন্যুৎপাত; উত্তর আমেরিকার পশ্চিমপার্শ্বীয় পর্বতমালার উত্থান।	অরণ্যের অবলুপ্তি; তৃণভূমির বৃদ্ধি; সপুষ্পক একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৃদ্ধি।	মনুষ্য জাতীয় এপস্ (Apes) থেকে মানুষের আবির্ভাব। প্রায় আধুনিক হাতী, ঘোড়া ও উটের আবির্ভাব।
ড			মায়োসিন (Miocene)	2.5		সিয়েরা এবং কাসকেড পর্বত শ্রেণীর সৃষ্টি; উঃ পঃ আমেরিকায় অগ্ন্যুৎপাত; জলবায়ু ক্রমশঃ শীতল।	পর্ণমোচী বৃক্ষের সংখ্যাধিক্য	স্তন্যপায়ী প্রাণীর সর্বাধিক বিবর্তন; প্রথম মনুষ্যসদৃশ এপস্ (Apes) এর উদ্ভব।
ভ		প্যালিওজিন (Palaeogene) বা নিম্ন টার্শারী (Lower Tertiary)	অলিগোসিন (Oligocene)	3.8		স্থলভাগ নিম্নমুখী; জলবায়ু উষ্ণ।	অরণ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি। সপুষ্পক একবীজপত্রী উদ্ভিদের আবির্ভাব।	প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবলুপ্তি অ্যানথ্রোপয়েড (Anthropoid) স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব।
			ইয়োসিন (Eocene)	6.5		পর্বতমালার ভঙ্গুরতা; জলবায়ু উত্তপ্ত।	গুপ্তবীজী উদ্ভিদের আধিক্য ও বিবর্তন; তৃণভূমির স্থায়িত্বলাভ।	অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীর বিস্তৃতি এবং উন্নতি; পক্ষীর বর্তমান বর্গগুলির উত্থান।
			প্যালিওসিন (Palaeocene)	8.0		জলবায়ু উষ্ণ	আধুনিক পর্য্যায়ের সপুষ্পক উদ্ভিদের সৃষ্টি।	পুরাতন স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিস্তার; প্রাচীন অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব

[Table Contd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	লারামাইড রেভলিউশন (Laramide Revolution) শিলা পর্বতের আবির্ভাব; জীবাশ্মের সামান্য অবলুপ্তি							
[illegible]	মেসোজোয়িক বা মধ্যজীবীয় (Mesozoic)	ক্রিটেশাস (Cretaceous)		14.0	স রী সৃ পে র যু গ	রকি, আন্দিজ, আল্পস, হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি। অন্তর্দেশীয় সমুদ্র ও জলাভূমির সৃষ্টি; শীতল আবহাওয়া।	প্রথম একবীজপত্রী; প্রথম ওক এবং মেপ্‌ল অরণ্যের সৃষ্টি; ব্যক্তবীজী বৃক্ষের ক্রমশঃ অবলুপ্তি।	ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীর সর্বাধিক উন্নতি ও পরিশেষে অবলুপ্তি; বৃহৎ সরীসৃপের অবলুপ্তি; দন্তযুক্ত পক্ষীর অবলুপ্তি; আধুনিক পক্ষীর উদ্ভব; প্রাচীন স্তন্যপায়ীর প্রাচুর্য্য।
		জুরাসিক (Jurassic)		20.4		মহাদেশগুলির উচ্চতাবৃদ্ধি; ইউরোপ ও পশ্চিম আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে অগভীর সমুদ্রের উদ্ভব।	দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সংখ্যাবৃদ্ধি; কনিফার এবং সাইকাড জাতীয় উদ্ভিদের বাহুল্য।	দন্তযুক্ত পক্ষীর উদ্ভব: ডাইনোসরের কলেবর বৃদ্ধি এবং বিশেষীকরণ। প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিক্রমা।
		ট্রায়াসিক (Triassic)				মরুভূমির বিস্তার শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু।	ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের প্রকটতা সীড ফার্ন (seed fern) জাতীয় উদ্ভিদের অবলুপ্তি।	প্রথম ডাইনোসর এবং টেরোসরের আবির্ভাব, ডিমপাড়া (egg laying) স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব; প্রাচীন উভচরের অবলুপ্তি।
	আপ্পালাচিয়ান রেভলিউশন (Appalachian Revolution) কিছু কিছু জীবাশ্মের বিলুপ্তি							
	প্যালিওজোয়িক বা পুরাজীবীয় (Palaeozoic)	পার্মিয়ান (Permian)		29.0		মহাদেশের আবির্ভাব; আপ্পালাচিয়ান সৃষ্টি; বরফের বৃদ্ধি; শুষ্ক জলবায়ু।	হর্সটেল (Horsetails) এবং লাইকোপড (Lycopods) জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা হ্রাস।	বহু প্রাচীন প্রাণীর মৃত্যু; স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ এবং পতঙ্গের আবির্ভাব।
		কারবনিফেরাস (Carboniferous)	পেনসিলভেনিয়ান (Pennsylvanian)	32.0	উ ভ চ রে র যু গ	নীচু ভূমির সৃষ্টি; বৃহৎ কয়লাযুক্ত জলাভূমির সৃষ্টি।	সিড ফার্ন (seed fern) জাতীয় উদ্ভিদের এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের অরণ্যের বিস্তার।	প্রথম সরীসৃপের আবির্ভাব; প্রাচীন উভচরের বিস্তার; পতঙ্গের প্রাচুর্য্য।
			মিসিসিপ্পিয়ান (Mississippian)	35.0		প্রথমে জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র; পরে স্থলভাগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া শীতল।	লাইকোপড (Lycopods) ও হর্সটেলের (Horse-tails) প্রাচুর্য্য; ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ব্যাপক বিস্তার।	উভচরের প্রাধান্য; পতঙ্গের সংখ্যাধিক্য; ব্রাকিওপডের (Brachiopods) সংখ্যা হ্রাস।

[Table Contd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
প্যালিওজয়িক		ডেভনিয়ান (Devonian)		41.0	মৎস্যের যুগ	অন্তর্দেশীয় সমুদ্রের সৃষ্টি; ভূমির উচ্চতাবৃদ্ধি, বরফপাত; জলবায়ু শুষ্ক।	প্রথম অরণ্যসৃষ্টি; স্থলজ উদ্ভিদের প্রাধান্য; প্রথম ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের আবির্ভাব।	প্রথম উভচরের আবির্ভাব; ফুসফুসধারী (Lungfish) মৎস্য ও হাঙ্গরের প্রাধান্য।
		সিলুরিয়ান (Silurian)		44.5		মহাদেশীয় সমুদ্রের বিশালতা; নিম্নভূমি উচ্চ হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুর শুষ্কতা।	প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি। শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের প্রকটতা।	সামুদ্রিক অ্যারেকনিড (Arachnid)-এর প্রাবল্য, প্রথম ডানাবিহীন পতঙ্গের উদ্ভব; মৎস্যের আবির্ভাব।
		অরডোভিসিয়ান (Ordovician)		50.5	খোলক যুক্ত অমেরুদণ্ডীয় যুগ	বৃহৎ ভূমিখণ্ডের জলে নিমজ্জন; উষ্ণ জলবায়ু; এমনকি মেরুদেশেও উষ্ণতা বৃদ্ধি।	স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব; সামুদ্রিক শৈবালের প্রাচুর্য্য।	প্রথম মৎস্যের আবির্ভাব; স্বাদু জলের কোরাল, কোরাল ও ট্রিলোবাইটের প্রাচুর্য্য; বিভিন্ন প্রকার কম্বোজ প্রাণীর প্রাধান্য।
		ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian)		60.5		নিম্নভূমির সৃষ্টি; জলবায়ু ঈষৎ নরমভাবাপন্ন; প্রাচীন শিলায় জীবাশ্মের প্রাচুর্য।	সামুদ্রিক শৈবাল	জীবাশ্মের প্রাচুর্য; ট্রিলোবাইট এবং ব্রাকিওপডের প্রাধান্য; আধুনিক খোলকযুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব।
	দ্বিতীয় মহা রেভলিউশন (Second Great Revolution) প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্মের অবলুপ্তি							
	প্রটেরজয়িক (Proterozoic)			200.0		বৃহৎ পলল সঞ্চয়, পরবর্তীকালে অগ্ন্যুৎপাত; স্তরীভবন শুরু; পুনঃ পুনঃ শিলাক্ষয়।	প্রাচীন জলজ উদ্ভিদ: শৈবাল এবং ছত্রাক।	বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক আদ্যপ্রাণী; অন্যান্য প্রাচীন সামুদ্রিক প্রাণী।
	প্রথম মহা রেভলিউশন (First Great Revolution) প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্মের অবলুপ্তি							
	আর্কিওজয়িক (Archeozoic)			360		পুনঃ পুনঃ অগ্ন্যুৎপাত; পলল সঞ্চয়; প্রবল ভূমিক্ষয়।	কোন জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায় না।	চিহ্নিত করার মত কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায় না; শিলাখণ্ডে জৈববস্তুর অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র।
	অ্যাজয়িক (Azoic)					পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল; জীবনের আবির্ভাবের পটভূমিকা তৈরী; আগ্নেয় শিলা।	জীবের কোন অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না।	

4.4 জীবাশ্ম ও জীবাশ্ম সৃষ্টির পদ্ধতি

আসুন এই অংশে আমরা জীবাশ্ম সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি। জীবাশ্ম কথাটির অর্থ হল জীব + অশ্ম (অর্থাৎ প্রস্তর)। জীব যখন প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায় তাকেই জীবাশ্ম বলে। ভূত্বকের শিলাস্তরে, বিশেষত পলল শিলাস্তরে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সম্পূর্ণ দেহ অথবা দেহাংশ চাপা পড়ে যখন অবিকৃত অবস্থায় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শিলায় রূপান্তরিত হয় তখন তাকেই **জীবাশ্ম (Fossil)** বলে। এক কথায় জীবাশ্ম প্রাচীন যুগের জীবের শিলীভূত রূপ। ফসিল (Fossil) কথাটির অর্থ খনন করে পাওয়া (Fossilum—something dug up)। বরফ, আলকাতরা, অ্যামবার (Amber) উৎকৃষ্ট সংরক্ষক হিসেবে পরিগণিত হয়। কয়লার স্তর, চুনাপাথরের স্তর চক্ (chalk) অথবা সাধারণ শিলায় জীবাশ্ম অনেক বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়।

জীবাশ্ম সৃষ্টির পদ্ধতি ঃ জীবাশ্ম বিভিন্ন পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো জীবদেহ অবিকৃত অবস্থায় জীবাশ্মে পরিণত হয়। কখনো বা জীবদেহের জৈবিক কণা অজৈবিক মণিক (mineral) বস্তুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে জীবাশ্ম সৃষ্টি করে। এগুলি ছাঁচে ফেলা মূর্তির মত হতে পারে বা ছাপ (impression) এর মতও হতে পারে।

এখন দেখা যাক জীবাশ্ম কি কি পদ্ধতিতে সৃষ্টি হতে পারে।

1. অবিকৃত সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম ঃ শীতল এবং শুষ্ক স্থানে কখনো কখনো জীবের অবিকৃত সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া যায়। এই প্রকার জীবাশ্ম সাধারণত বরফ, তেল, মোম, অ্যামবার (পাইন গাছের রজনের প্রস্তরীভূত রূপ) প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে ঢাকা পড়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়। সাইবেরিয়াতে বরফের স্তূপে ম্যামথ (লোমশ হাতী) এবং শ্বাদন্ত বাঘের সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এভাবেই অ্যামবারে আবদ্ধ পিঁপড়ের বা অন্য পতঙ্গের সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া যায়। (চিত্র নং 4.2)

ম্যামথ

অ্যামবারে আবদ্ধ পিঁপড়ে

চিত্র নং 4.2

2. শিলীভবন বা পেট্রিফিকেশন (Petrification) : কখনো কখনো জীবদেহ বা দেহাংশ খনিজ পদার্থে পরিণত হয়ে জীবাশ্ম সৃষ্টি করেছে। এই রকম জীবাশ্মের ক্ষেত্রে মাটির নীচে চাপা পড়া ঐ সব দেহ বা দেহাংশের জৈব পদার্থগুলির ধীরে ধীরে পচন ঘটে এবং অজৈব পদার্থগুলি ঐ স্থান দখনল করে। জৈব পদার্থের পচনের ফলে জীবদেহে যে ছিদ্র সৃষ্টি হয় ঐ ছিদ্রপথে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ, যথা সিলিকেট্, সালফেট্, কার্বনেট্, লৌহ ইত্যাদির অণু প্রবেশ করতে থাকে এবং কালক্রমে জীবাশ্মে পরিণত হয়। এ ধরনের জীবাশ্ম প্রাণী বা উদ্ভিদের শিলীভূত রূপ।

3. প্রাকৃতিক মোল্ড বা কাষ্ট (Natural moulds or casts) : কখনো কখনো জীবদেহ মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। ঐ মাটি ক্রমশ তাপ ও চাপে কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে জীবদেহের পচন ঘটে। পললস্তরের ছিদ্রপথে ঐ পচা অংশ বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে শিলার মধ্যে জীব বা জীবদেহাংশের অবিকল ছাঁচ তৈরী হয়। এ ধরনের জীবাশ্মে কেবলমাত্র দেহের বা দেহাংশের উপরিভাগের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। পরে ঐ জীবের শূন্য দেহের ছাঁচে অন্যান্য বস্তু জমা হয়ে নির্দিষ্ট জীবদেহের অবিকল আকার সৃষ্টি করে। এই ধরনের জীবাশ্মকে প্রাকৃতিক কাষ্ট বলে। কখনো কখনো আভ্যন্তরীণ নরম অঙ্গেরও এরকম কাষ্ট তৈরী হতে পারে।

4. পায়ের বা দেহের ছাপ (Impression) : অনেক সময়ে পায়ের বা দেহের ছাপযুক্ত মাটি শিলায় রূপান্তরিত হলে ঐ ছাপ অবিকৃত থাকে এবং জীবাশ্মে পরিণত হয়। এই ছাপ পরীক্ষা করে জীবদেহের আকার বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়। ব্যাভেরিয়ার চুনাপাথরে *Archaeopteryx* (আর্কিওপটেরিক্স) এর দেহে সরীসৃপ ও পক্ষীর দ্বৈত চরিত্র দেখা গেছে (চিত্র নং 4.3)। শম্বুক জাতীয় প্রাণীর পদচিহ্নের ছাপ, জেলিফিসের শুঁড়, মাছের পাখনা, এবং ক্রাষ্টেশিয়া প্রাণীর চলনের ছাপের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

5. কয়লায় রূপান্তর (Carbonization) : ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটির প্রচন্ড চাপে চাপ পড়া উদ্ভিদের দেহ থেকে যখন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নির্গত হয়ে কেবলমাত্র কার্বন অবশিষ্ট থাকে তখন এ ধরনের জীবাশ্ম তৈরী হয়। এর ফলে উদ্ভিদদেহ কয়লায় রূপান্তরিত হয়।

6. কপ্রোলাইটস (Coprolites) : প্রাচীন সরীসৃপ ও মৎস্যের অন্ত্রের ভিতরে বস্তু বা মল জীবাশ্মে পরিণত হতে পারে। এ ধরনের জীবাশ্মকে কপ্রোলাইটস বলে।

জীবাশ্ম সৃষ্টির শর্তসমূহ

নিম্নলিখিত শর্তগুলি জীবাশ্ম সৃষ্টির সহায়ক

- কঠিন অঙ্গের উপস্থিতি
- জীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা পড়া

(ক) আর্কিওপটেরিক্সের জীবাশ্ম (খ) পুনর্গঠন দ্বারা আকৃতি প্রদর্শন

চিত্র নং 4.3

- জীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবর্তন অর্থাৎ চাপ, তাপ ও অম্লজলের সঞ্চালন ইত্যাদি
- সামুদ্রিক জীবের জলবাহিত হয়ে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পলল সঞ্চয় হওয়া
- অগ্ন্যুৎপাত
- চোরাবালি বা কাদায় জীবের জীবন্ত সমাধি। লস এঞ্জেলসের ঐ ধরনের মৃত্যু গহ্বরে পতিত হাতীসদৃশ Mastodon (মাস্টোডন) ইত্যাদির জীবাশ্ম পাওয়া যায়।

অনুশীলনী—2

1. জীবাশ্ম কাকে বলে? সংক্ষেপে উত্তর দিন।

2. দক্ষিণ ও বাম স্তম্ভের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করুন ঃ

(a)	অ্যাম্বার	(i)	বরফ
(b)	ম্যামথ	(ii)	আর্কিওপটেরিক্স
(c)	দেহের ছাপ	(iii)	পিপঁড়ে
(d)	মল	(iv)	জীবাশ্ম
(e)	অজৈবিক প্রতিস্থাপন	(v)	কপ্রোলাইট।

4.5 জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় অথবা ভূতত্ত্বীয় ঘড়ি (The Clock of the Rock)

তেজস্ক্রিয় মণিকের পরিমাণবাচক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাচীনতম শিলাস্তরগুলির বয়স নির্ণয় করা যায়। তেজস্ক্রিয়তার নীতি অনুসারে কতগুলি মণিক কঠিনদেহ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভুত মৌল (Molecule) নিরন্তর বিশ্লিষ্ট হয়ে ভিন্ন মৌলে রূপান্তরিত হয়। যেমন—

(i) তেজস্ক্রিয় ফসফরাস (P40) অতেজস্ক্রিয় আর্গন (Ar40) তে রূপান্তরিত হয়

(ii) তেজস্ক্রিয় কার্বন (C14) অতেজস্ক্রিয় কার্বনে (C12) রূপান্তরিত হয়

(iii) তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম (U235) সাধারণ সীসায় (Pb207) রূপান্তরিত হয়

(iv) তেজস্ক্রিয় রুবিডিয়াম (Rb87) অতেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনসিয়ামে (Sr87) রূপান্তরিত হয়

কোন মৌলের আইসোটোপগুলি (isotopes) বিকিরণের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে অতেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত হওয়ার সময়কালকে আইসোটোপের অর্ধ্বজীবন (Half-life) বলে। যেমন কার্বন আইসোটোপের (C14) অর্ধ্বজীবন মাত্র 5,568 বৎসর। যদি এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির অতেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত হওয়ার হার (rate) জানা যায় তবে ঐ মৌলযুক্ত শিলার রূপান্তরের সময় জানা যাবে। বহিঃপ্রভাবকে বাদ দিলে মণিকদেহের মধ্যে নবমৌলের পরিমাণ এবং পুরাতন তেজস্ক্রিয় মৌলটির পরিমাণ, এই দুই রাশির অনুপাত কালের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং কালের পরিমাপ করে। তেজস্ক্রিয় মণিক ভূতত্ত্বীয় ঘড়ি (Clock of the Rock)-র ন্যায় কাজ করে। মণিকদেহে তেজস্ক্রিয়তার অনুপাত নির্ণয়ের জন্য ফ্লেমফটোমিটার ও মাসস্পেকট্রোমিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে জীবাশ্মর বয়স মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা যায়। যেমন—

1. লেড পদ্ধতি (Lead method) : 1 গ্রাম তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম (U^{235}) প্রতি বৎসর 1/7,600,000,000 গ্রাম লেড (Pb207) তৈরী করে। সুতরাং খননের সময় যদি ইউরেনিয়ামকে M1 এবং লেডকে M2 ধরা হয় তাহলে জীবাশ্মের বয়স নিম্নলিখিত সূত্রটির দ্বারা জানা যাবে।

শুরুতে ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি = m1 + M2

$(m_1 + m_2)$ গ্রাম ইউরেনিয়ামের t বৎসরে সৃষ্ট লেডের (M_2) পরিমাণ $= \frac{t(m_1 + m_2)}{7,600,000,000} = M_2$ গ্রাম

সুতরাং $t = \frac{M_2 \times 7,60,000,000}{m_1 + m_2}$ বৎসর।

2. রেডিও কার্বন পদ্ধতি (Radio carbon method) : সমস্ত জীবন্ত জীবদেহে কিছু পরিমাণ তেজস্ক্রিয় কার্বন (C^{14}) থাকে। ঐ কার্বনের অর্ধাংশ বিশ্লিষ্ট হতে 5,568 বৎসর সময় লাগে। অর্থাৎ 5,568 বৎসর কার্বনের অর্ধজীবন (Half life)। তেজস্ক্রিয় কার্বন (C^{14}) বিশ্লিষ্ট হয়ে সাধারণ কার্বন (C^{12}) এ পরিণত হয়। সুতরাং খননকালে জীবাশ্মের তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাণ এবং জীবিত প্রাণীর কার্বনের পরিমাণ তুলনা করে জীবাশ্মের বয়সকাল নির্ণয় করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র 45,000 বৎসরের কম জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা যায়।

3. পটাসিয়াম আর্গন পদ্ধতি (Potassium-argon Method) : পটাসিয়ামে 0.01% (শতাংশ) তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থাকে। এই পটাসিয়ামের অর্ধজীবন হল 1.3×10 বৎসর। অর্থাৎ পটাসিয়াম বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্যালসিয়াম ও আর্গন হতে ঐ সময় লাগে। এই পদ্ধতিতে 2,00,000 বৎসরের প্রাচীন জীবাশ্মেরও বয়স নির্ণয় করা যায়।

4.5.1 জীবন্ত জীবাশ্ম (Living Fossil)

জীবাশ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে জীবন্ত জীবাশ্মের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আসুন আমরা জীবন্ত জীবাশ্মের বিষয়ে কিছু আলোচনা করি।

জীবন্ত জীবাশ্ম হল সেই সব জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদ যা সুদূর অতীতে আবির্ভূত হয়েও কোনরকম

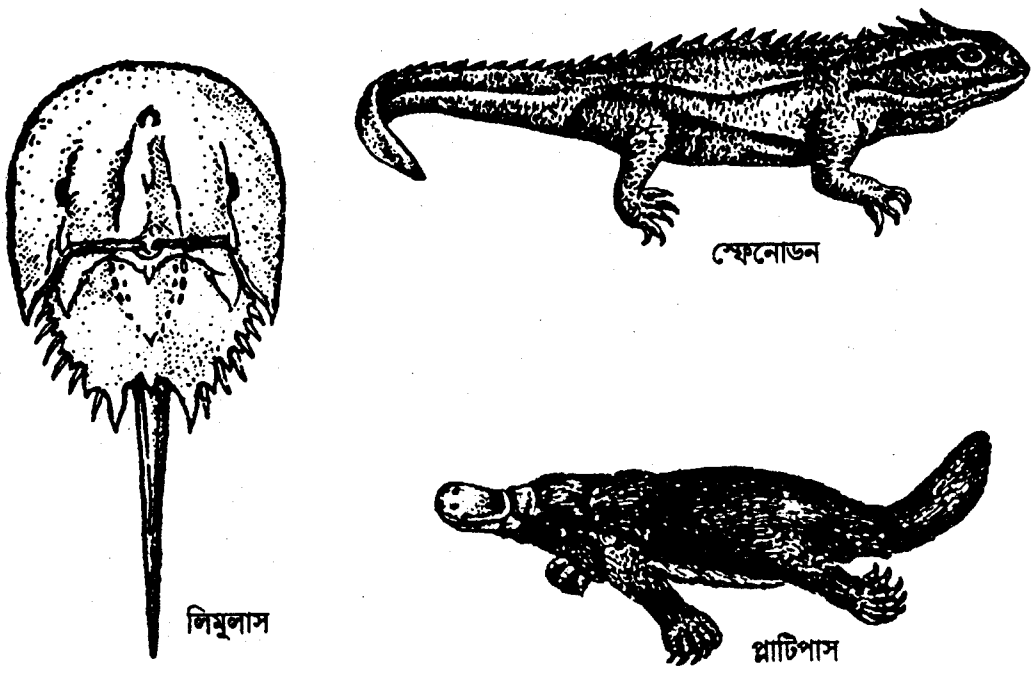

চিত্র নং 4.4

পরিবর্তন ছাড়াই প্রাচীন সব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আধুনিক যুগেও পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় বসবাস করছে। অথচ তাদের সমসাময়িক জীবেদের বহুকাল পূর্বেই অবলুপ্তি ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ *Limulus* (লিমুলাস), *Coelacanth* (সিলাকান্থ), *Sphenodon* (স্ফেনোডন), *Peripatus* (পেরিপেটাস), *Platypus* (প্লাটিপাস) ইত্যাদি প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে *Ginkgo* (গিংগো), *Biloba* (বাইলোবা) ইত্যাদি (চিত্র নং 4.4)।

4.5.2 জীবাশ্মের গুরুত্ব

1. জীবাশ্ম জৈব বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। জীবাশ্মের সাহায্যে উদ্ভিদ বা প্রাণীদের অতীত ইতিহাস জানা যায়। যেমন *Archaeopteryx* (আর্কিওপটেরিক্স) জুরাসিক কালের জীবাশ্ম। এর দেহে কিছু সরীসৃপ ও কিছু পক্ষীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেজন্য এটিকে সরীসৃপ ও পক্ষীর অন্যতম যোগসূত্র (Connecting link) বলা হয়।

2. জীবাশ্ম প্রাচীন ভূগোলবিদ্যা (Palaeography) জানার বিশেষভাবে সহায়ক। প্রাচীনযুগে সমুদ্র এবং ভূমিভাগের জীবাশ্মের উপস্থিতি সে যুগের স্থলভাগ এবং জলভাগকে চিহ্নিত করে। যেমন হিমালয় পর্বতের শিলায় উপস্থিত সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে প্যালিওজোয়িক ও মেসোজোয়িক যুগে হিমালয় পর্বতের স্থানে সমুদ্র ছিল। মেসোজোয়িক যুগে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ মেরু ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত একই রকমের স্থলজ জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে ঐ সব মহাদেশগুলি একই ভূমিখণ্ডের সাহায্যে যুক্ত ছিল। পরে ভূমিখন্ডের চলনের ফলে ঐ সব মহাদেশ পৃথক হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করবো।

3. এ ছাড়াও কয়লা একটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ জীবাশ্ম। জীবাশ্মের সাহায্যে ভূতত্ত্ববিদগণ ভূগর্ভস্থ আকরিক পদার্থ, যেমন কয়লা, তেল এবং গ্যাসীয় পদার্থের উপস্থিতির বিষয় জানতে পারেন।

অনুশীলনী—3

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(a) তেজস্ক্রিয় ফসফরাস অতেজস্ক্রিয় _____ রূপান্তরিত হয়। (b) রেডিও _____ পদ্ধতিতে কেবল মাত্র 45,000 বৎসরের কম জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা যায়। (c) তিনটি জীবন্ত জীবাশ্মের নাম লিখুন।

4.6 সারাংশ

পৃথিবীর ভূত্বকের ইতিহাস এবং জীবসৃষ্টির ইতিহাস প্রায় পাশাপাশি শুরু হয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টির কালে ভূখণ্ড ছিল না। পৃথিবী তরল অবস্থায় ছিল। তরল অবস্থা থেকে যখন কঠিন হতে শুরু করল তখন থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কালকে **ভূতত্ত্বীয় কাল** বলে। এই ভূতত্ত্বীয় কালকে কয়েকটি বিশেষ অধিযুগে ভাগ

করা হয়েছে। মোট সাতটি অধিযুগ আছে। এই অধিযুগগুলি হল যথাক্রমে 1. এজোয়িক অধিযুগ, 2. আর্কিওজোয়িক অধিযুগ, **3.** প্রটেরোজোয়িক অধিযুগ, 4. পালিওজোয়িক অধিযুগ, 5. মেসোজোয়িক অধিযুগ, 6. সিনোজোয়িক অধিযুগ, 7. সাইকোজোয়িক অধিযুগ। প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয় আবার দুটি অধিযুগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই বিপর্যয়গুলিকে বিপ্লব বলে। এই বিপ্লবের ফলে পরিবেশের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। জীবকূলের উপর তার প্রভাব দেখা যায়। ফলে কোন কোন প্রাণী হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অল্পসংখ্যক জীবিত প্রাণীরা বিবর্তনের মাধ্যমে নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি ঘটায়। এই বিপর্যয় বা বিপ্লবগুলি যথাক্রমে :

1. প্রথম মহাবিপ্লব (আর্কিওজোয়িক ও প্রটেরোজোয়িকের মধ্যবর্তীকালে)

2. দ্বিতীয় মহাবিপ্লব (প্রটেরোজোয়িক ও প্যালিওজোয়িকের মধ্যবর্তীকালে)

3. আপ্পালাচিয়ান বিপ্লব (প্যালিওজোয়িক ও মেসোজোয়িকের মধ্যবর্তীকালে)

4. লারামাইড বিপ্লব (মেসোজোয়িক ও সিনোজোয়িকের মধ্যবর্তীকালে)

5. কাসকেডিয়ান বিপ্লব (সিনোজোয়িক ও সাইকোজোয়িকের মধ্যবর্তীকালে)

প্রত্যেকটি অধিযুগকে কতগুলি যুগে এবং প্রত্যেক যুগকে আবার কয়েকটি উপযুগে ভাগ করা হয়।

এই অধিযুগগুলির মধ্যে অ্যাজোয়িক যুগে কোন জীবনের চিহ্ন পাওয়া যায় না। আর্কিওজোয়িক যুগে পুনঃপুনঃ অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। এ যুগেও জীবনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে ভঙ্গুর শিলায় জৈববস্তুর অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর পর প্রত্যেকটি অধিযুগেই জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন যুগে বিভন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম সেই যুগে ঐ সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। জীবাশ্মের ইতিহাস উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসকেও সূচিত করে। ভিন্ন ভিন্ন যুগে প্রাপ্ত জীবাশ্ম সেই যুগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। যেমন অরডোভিসিয়ান ও ক্যাম্ব্রিয়ান যুগকে **খোলকযুক্ত অমেরুদন্ডী প্রাণীর যুগ** বলে। আবার ডেভনিয়ান ও সিলুরিয়ানকে **মৎস্যের যুগ** বলে। কার্বনিফেরাসকে **উভচরের যুগ** বলে। ক্রিটেশাস, জুরাসিক, ট্রায়াসিককে **সরীসৃপের যুগ,** সিনোজোয়িক যুগকে **স্তন্যপায়ী এবং আধুনিক উদ্ভিদের যুগ** ও হলোসিনকে **মনুষ্যের যুগ** বলা হয়। বিভিন্ন যুগে প্রাপ্ত জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণের সাহায্যে পৃথিবীতে তারা কতকোটি বৎসর পূর্বে বিরাজ করত তা জানা যায়।

4.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. পৃথিবীর ইতিহাসে কয়টি মহাবিপ্লব ঘটেছিল এবং কী কী? কোন্ বিপ্লব কোন্ কোন্ অধিযুগের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটেছিল? 2. ভূতত্ত্বীয় কাল কী? এর অধীনস্থ অধিযুগ, যুগ এবং উপযুগগুলি কী কী? কোন্

কোন্ যুগকে কোন্ কোন্ প্রাণীর যুগ বলা হয়? 3. জীবাশ্ম কী? কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে জীবাশ্ম সৃষ্টি হয়? জীবাশ্ম সৃষ্টির বর্ণনা দিন। 4. জীবাশ্ম তৈরী হওয়ায় পক্ষে অনুকূল শর্তগুলি কী কী? জীবাশ্মের বয়স কীভাবে নিরূপণ করা যায়?

4.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

1. 4.2 দেখুন। **2.** 4.2 দেখুন। **3.** 4.2.1 দেখুন। **4. পেরিপেটাস।** **5.** ডেভনিয়ান। **6.** মিসিসিপ্পয়ান ও পেনসিলভেনিয়ান। **7.** হলোসিন বা রিসেন্ট।

অনুশীলনী—2

1. 4.4 দেখুন। **2.** (a)—(iii); (b)—(i); (c)—(ii); (d)—(v); (e)—(iv)

অনুশীলনী—3

1. (a) আর্গনে। (b) কার্বন। **2.** 4.5.1 দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. 4.2.2 অনুচ্ছেদ দেখুন। **2.** 4.2.1 অনুচ্ছেদ দেখুন। **3.** 4.4 অনুচ্ছেদ দেখুন। **4.** 4.5 অনুচ্ছেদ দেখুন।

একক 5 ❑ প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ ও তাদের প্রাণীচরিত্র (Zoogeographical Realms and their Characteristic Fauna)

গঠন

5.0 প্রস্তাবনা

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বিভাগের ইতিহাস

5.3 প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলের বিভাজন

5.4 প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বর্ণনা

5.5 সারাংশ

5.6 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

5.7 উত্তরমালা

5.0 প্রস্তাবনা

পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে ও বাসস্থানে প্রায় 10 লক্ষ প্রজাতিরও বেশী প্রাণী বাস করে। অধিকাংশ প্রাণীরই বিস্তার সীমিত। বিভিন্ন প্রকারের বাধা (barrier) ঐসকল প্রাণীকে সর্বত্র বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করেছে। ফলে সব প্রজাতি পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায় না। আবার আলাদা করে ঐসব প্রজাতির ভৌগোলিক বিস্তার জানা প্রায় অসম্ভব। তাই কেবলমাত্র মেরুদন্ডী প্রাণীর বিস্তারের বিষয়টিই প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মেরুদন্ডী প্রাণীগোষ্ঠীর সমতার উপর নির্ভর করে সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এইসব অঞ্চলকে **প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চল বা রিয়েলম্‌স্ (Zoogeographical Realms)** বলা হয়। এইসব অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা, আবহাওয়া, জলজ ও স্থলজ মেরুদন্ডী প্রাণীর বিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার। পৃথিবীতে কোন প্রাণীপ্রজাতির বিস্তারের আয়তন (area of distribution) সীমিত স্থানে হতে পারে। আবার কোন কোন প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার অবিচ্ছিন্ন (continuous) হতে পারে। যেমন মানুষ **(Homo sapiens)**। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলেই মানুষ বসবাস করে। আর একটি উদাহরণ হল উট। উটের বিস্তার মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও আরবদেশে। আবার কোন কোন প্রাণীপ্রজাতির ভৌগোলিক বিস্তার বিচ্ছিন্ন (discontinuous)। উদাহরণস্বরূপ লাঙ ফিস (Lung fish)। এই ফুসফুসধারী মাছ দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। টাপির (Tapir) মালয় ও বোর্নিও দ্বীপে। এর মধ্যবর্তী কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় না। এইভাবে প্রাণীদের বসতির উপর ভিত্তি করেই প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়েই আলোচনা করবো।

5.1 উদ্দেশ্য

- এই অংশটুকু পড়ে আপনি পৃথিবীর প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ ভাগ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর বাসস্থান বর্ণনা করতে পারবেন।

5.2 প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বিভাগের ইতিহাস

প্রাণীভূগোলের ইতিহাস খুব পুরানো নয়।

(i) লিনিয়াস (Linnaeus, 1707-1778) জীবের শ্রেণীবিন্যাস রচনা করার সময় জীবের বসতি ও বিস্তার সম্বন্ধে আলোকপাত করেন।

(ii) বাফন (Bufon, 1750) নূতন পৃথিবী (New World) এবং পুরাতন পৃথিবী (Old World)-এর প্রাণীদের পার্থক্য আলোচনা করেছেন।

(iii) 1858 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স্কল্যাটার (Sclater) পাখীদের বিস্তারের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম সমগ্র পৃথিবীকে 6টি প্রধান প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেন।

(iv) 1876 খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালেস (Wallace) মেরুদন্ডী প্রাণীদের বিস্তারের ভিত্তিতে স্কল্যাটারের বর্ণনার কিছু পরিবর্তন করে একটি ছক প্রণয়ন করেন এটি **ওয়ালেসের ছক** (Scheme of Wallace) নামে বিখ্যাত। এই ওয়ালেসের ছকটিই পরবর্তীকালে গৃহীত হয়।

(v) ব্লানফোর্ড (1890) সালে 6টি অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান। তিনি পৃথিবীকে 3টি প্রধান ভাগে ভাগ করেন।

A. আর্কটোগিয়া (Arctogea : Charctos-north gea-land) 4টি উপবিভাগসহ পৃথিবীর প্রধান অংশ।

B. দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল (South American region)

C. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian region)

এরপর একজন অনামী (annoymous) প্রাণীবিদ্ দক্ষিণ আমেরিকাকে নিওগিয়া (Neogea) এবং অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলকে নোটোগিয়া (Notogea) নামকরণ করেন।

(vi) লাইডেকার (Lydeker, 1896) এই তিনটি ভাগকে রিয়েলম্স (realms) আখ্যা দেন।

(vii) ডারলিংটন (Darlington, 1957) এই প্রস্তাবের সামান্য অদলবদল করেন এবং আর্কটোগিয়াকে মেগাগিয়া (Megagea) নামকরণ করেন। কারণ আর্কটোগিয়া পৃথিবীর বৃহদাংশ জুড়ে অবস্থিত।

এইভাবে পরিবর্তনের পর সর্বজনস্বীকৃত নামগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

A. রিয়েল্‌ম মেগাগিয়া	B. রিয়েল্‌ম নিওগিয়া
1. ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopean region)	5. নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical region)
2. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental region)	C. রিয়েল্‌ম নোটোগিয়া (Noto-south gea-land)
3. প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic region)	6. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australilan region)
4. নিআর্কটিক অঞ্চল (Neartic region)	

অনুশীলনী-1

দক্ষিণ ও বাম স্তম্ভের বক্তব্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করুন ঃ

(a) লিনিয়াস	(i) লাইডেকার
(b) নূতন পৃথিবী	(ii) প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস
(c) আর্কটোগিয়া	(iii) মেগাগিয়া
(d) রিমেলম্‌স	(iv) 4টি উপবিভাগ
(e) ডারলিংটন	(v) বাফন

5.3 প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলের বিভাজন

প্রাণীগোষ্ঠীর বিস্তারের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে যে সমস্ত ভোগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ করা যায় তাকেই প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চল বা রিয়েলম্‌স বলে (Zoogeographical region or realms)। বৈজ্ঞানিক স্কল্যাটার পাখীর বিস্তারের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীপৃষ্ঠকে 6টি অঞ্চলে ভাগ করেন—

1. প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic realm : Palae-ancient)
2. ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopean realm)
3. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental realm)
4. নিআর্কটিক অঞ্চল (Neartic realm)
5. নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical realm)
6. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian realm)

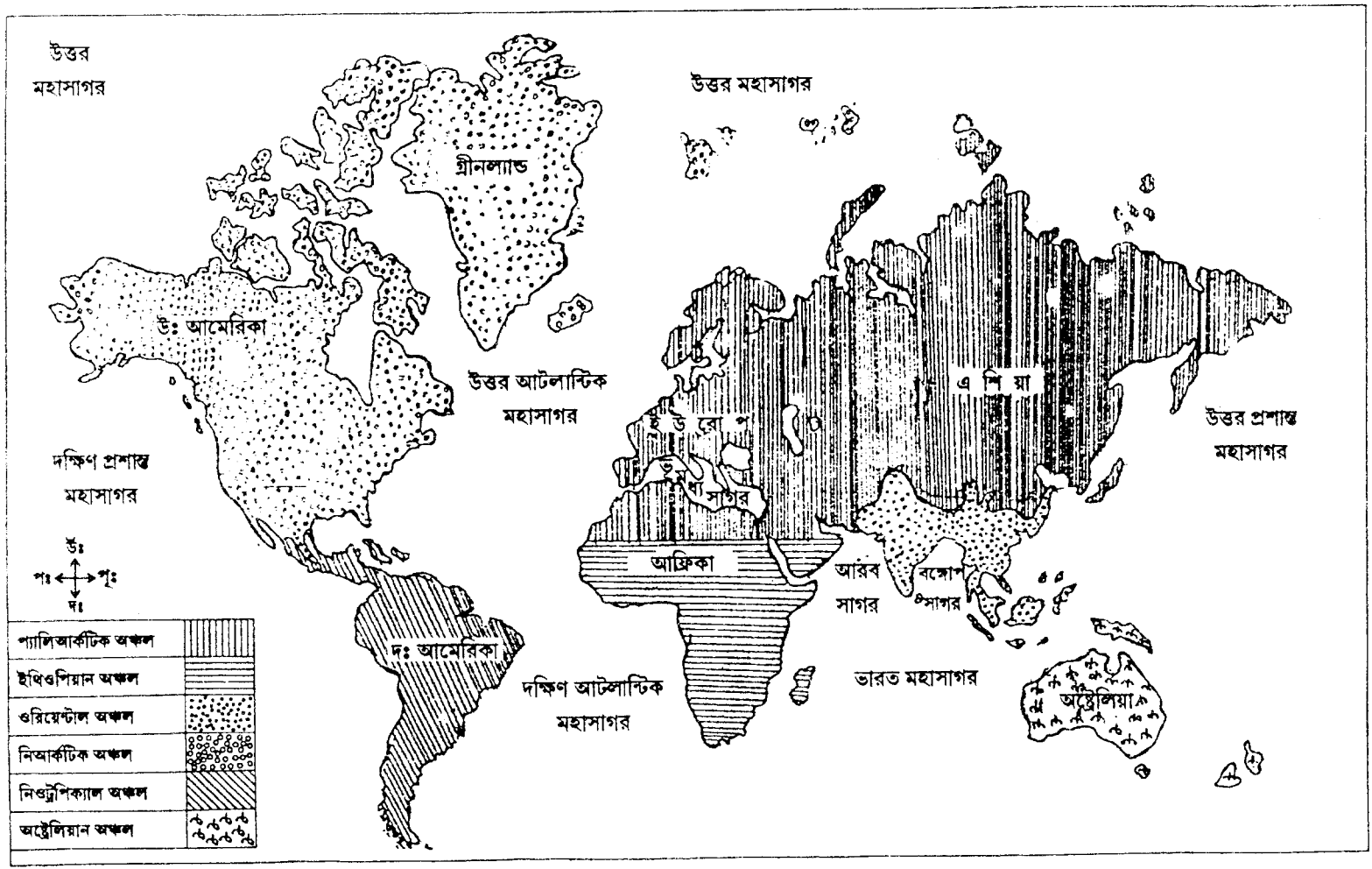

উত্তর
মহাসাগর
উত্তর মহাসাগর
গ্রীনল্যান্ড
উঃ আমেরিকা
উত্তর আটলান্টিক
মহাসাগর
ইউরোপ
এশিয়া
উত্তর প্রশান্ত
মহাসাগর
দক্ষিণ প্রশান্ত
মহাসাগর
ভূমধ্যসাগর
আফ্রিকা
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর
দঃ আমেরিকা
দক্ষিণ আটলান্টিক
মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
প্যালিআর্কটিক অঞ্চল
ইথিওপিয়ান অঞ্চল
ওরিয়েন্টাল অঞ্চল
নিআর্কটিক অঞ্চল
নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল
অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল

বিজ্ঞানী ওয়ালেস প্রতিটি অঞ্চলকে আবার কতগুলি উপঅঞ্চলে বিভক্ত করেন। এবার আমরা সেইসব অঞ্চল এবং উপঅঞ্চল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবো।

প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চল	উপঅঞ্চল
প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic realm)	1. ইউরোপীয় উপঅঞ্চল (European subregion) 2. ভূমধ্যসাগরীয় উপঅঞ্চল (Mediterranean subregion) 3. সাইবেরীয় উপঅঞ্চল (Siberian subregion) 4. মাঞ্চুরিয়া উপঅঞ্চল (Manchurian subregion)
নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic realm)	1. ক্যালিফোর্নিয়া উপঅঞ্চল (California subregion) 2. রকি পার্বত্য উপঅঞ্চল (Rocky Mountain subregion) 3. অ্যালিঘানী উপঅঞ্চল (Alleghany subregion) 4. কানাডা উপঅঞ্চল (Canadian subregion)
নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical realm)	1. চিলি উপঅঞ্চল (Chillian subregion) 2. ব্রাজিল উপঅঞ্চল (Brazilian subregion) 3. মেক্সিকো উপঅঞ্চল (Mexican subregion) 4. অ্যান্টিলিয়া বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান উপঅঞ্চল (Antillean or West Indian subregion)
ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopian realm)	1. পূর্ব আফ্রিকা উপঅঞ্চল (East African subregion) 2. পশ্চিম আফ্রিকা উপঅঞ্চল (West African subregion) 3. দক্ষিণ আফ্রিকা উপঅঞ্চল (South African subregion) 4. ম্যালাগাসী উপঅঞ্চল (Malagasy subregion)
ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental realm)	1. ভারতীয় উপঅঞ্চল (Indian subregion) 2. সিলোনীজ উপঅঞ্চল (Ceylonese subregion) 3. ইন্দোচীন উপঅঞ্চল (Indo-Chinese subregion) 4. ইন্দোমালয় উপঅঞ্চল (Indo-Malayan subregion)
অষ্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian realm)	1. অষ্ট্রোমালয় উপঅঞ্চল (Austro-Malayan subregion) 2. অষ্ট্রেলিয়ান উপঅঞ্চল (Australian subregion) 3. পলিনেশিয়ান উপঅঞ্চল (Polynesian subregion) 4. নিউজিল্যাণ্ড উপঅঞ্চল (New Zealand subregion)

স্কল্যাটার (Sclater) পৃথিবীকে দুটি ভাগে ভাগ করেন—

1. **ওল্ড ওর্য়াল্ড (Old World) বা ক্রিয়েশিও প্যালিওগিয়ানা (Creatio Palaeogeana : Palaco-ancient, gea-land)**

   এর অধীনস্থ 4 টি অঞ্চল হল—

   (i) প্যালিআর্কটিক অঞ্চল

   (ii) মধ্য প্যালিওট্রপিক বা ভারতীয় অঞ্চল

   (iii) পশ্চিম প্যালিওট্রপিক বা ইথিওপিয়ান অঞ্চল

   (iv) পূর্ব প্যালিওট্রপিক বা অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল

2. **নিউ ওর্য়াল্ড (New World) বা ক্রিয়েশিও নিওগিয়ানা (Creatio Neogeana : Neo-new, gea-land)**

   (i) নিআর্কটিক অঞ্চল

   (ii) নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল

অনুশীলনী-2

দক্ষিণ ও বাম স্তম্ভের বক্তব্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করুন ঃ

(a) প্যালিআর্কটিক	(i) পশ্চিম আফ্রিকা
(b) অ্যালিঘানী	(ii) ওরিয়েন্টাল
(c) ইথিওপিয়ান	(iii) ভূমধ্যসাগরীয়
(d) সিলোনীজ	(iv) পলিনেশিয়ান
(e) অস্ট্রেলিয়ান	(v) নিআর্কটিক

5.4 প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বর্ণনা

1. **প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaeartic Realm)**

এই অঞ্চলটি সমস্ত রিয়েলম্‌স-এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অঞ্চল।

ভৌগোলিক সীমা ঃ পৃথিবীর উত্তরাংশে অবস্থিত এই অঞ্চলটি সমগ্র ইউরোপ, চীন, জাপান, আফ্রিকার উত্তরে সাহারা, সাইবেরিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আরব অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের সঙ্গে ইথিওপিয়ান ও ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ভূমিসংযোগ আছে।

জলবায়ু ঃ শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়প্রকার আবহাওয়াই এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি উষ্ণ। উত্তরের মেরু অঞ্চল ও পূর্বে সাইবেরিয়ার শৈত্যপ্রবাহে এর বেশীরভাগ অঞ্চল প্রভাবিত হয় উত্তর আফ্রিকা এবং এশীয় মহাদেশের কিছু অংশ আবার বেশ শুকনো। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতও কমবেশী হয়।

উদ্ভিদ ঃ এই অঞ্চলের শুকনো মরুভূমি অঞ্চলে গাছপালা খুব কম, প্রায় নেই। আবার যেখানে যেখানে বেশী বৃষ্টিপাত হয় সেখানে অরণ্যও দেখা যায়। এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে কনিফার উদ্ভিদের অরণ্য দেখা যায়।

প্রাণী ঃ প্রাণীবিস্তার বিভিন্ন প্রকারের হয়। উষ্ণ অঞ্চলে প্রাণীদের ঘন সমাবেশ দেখা যায়। আবার উত্তরে শীতের প্রভাব বেশী থাকায় প্রাণীবৈচিত্র্য ও সংখ্যা খুব কম হয়। এই অঞ্চলের প্রাণীদের সঙ্গে নিআর্কটিক অঞ্চলের প্রাণীদের প্রচুর মিল পাওয়া যায়। প্রায় 13টি গোত্রের স্বাদুজলের মাছ, 10টি গোত্রের উভচর, 24টি গোত্রের সরীসৃপ ও 33টি গোত্রের স্তন্যপায়ী প্রাণী পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রায় 68টি গোত্রের পাখী পাওয়া যায়।

মাছ ঃ যে 13টি গোত্রের মাছ পাওয়া যায় তারা হল কার্প (carp), স্যালমন (Salmon), পাইক (pike), পার্চ (perch), এবং ষ্টিকলব্যাকস্ (stickle backs) ও পেট্রোমাইজন (Petromyzon)।

উভচর ঃ উভচর গোষ্ঠীর বেশীরভাগ লেজযুক্ত অর্থাৎ ইউরোডেলা বর্গভুক্ত। নেকচুরাস (Necturus) সালামান্ডার (Salamander), প্রোটিয়াস (Proteus), অ্যাক্সোলোট্‌ল (Axolotl) ইত্যাদি। লেজবিহীন হল অ্যালাইটিস (Alytes), রানা (Rana), হাইলা (Hyla) বা গেছোব্যাঙ, বুফো (Bufo) বা কুনোব্যাঙ ইত্যাদি।

সরীসৃপ ঃ বালিবোড়া (Sand Boa), বোডা, কলুব্রিড এশিয় পিট ভাইপার (pit viper) জাতীয় সাপ পাওয়া যায়, এছাড়া কচ্ছপ (Trionys), টেষ্টুডো (Testudo), ভারানাস (Varanus), বহুরূপী (chamacleon), চীনদেশে অ্যালিগেটর (Alligator), টিফলপ (Typhlop) ইত্যাদি পাওয়া যায়। এছাড়া ট্রাইগনোফিস (Trigonophis) জাতীয় গিরগিটিও পাওয়া যায়।

পাখী ঃ বিডলিং রবিন, কাক, সোয়ালো (swallow), ফিঞ্চ (finches), রেন (wren), টার্ন (tern), ওয়ার্বলার (wrabler), হাঁস, কোকিল, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা ইত্যাদি পাওয়া যায় তবে তোতাপাখী প্রায় দেখাই যায় না।

স্তন্যপায়ী ঃ ছুঁচো, পাণ্ডা, কাঠবিড়ালী, খরগোস, হরিম, শূকর, হেজহগ (Hedgchog), বিভার (Beaver) মেরু বিড়াল, বেড়াল, কুকুর, নেকড়ে ইত্যাদি। সেলভিনিডি (Selvinidae), এবং এলিউরোপোডিডি (Ailuropodidae) এই অঞ্চলের আঞ্চলিক (endemic) প্রাণী। ইলাফোডাস (Elaphodus) হরিণ একমাত্র মাঞ্চুরীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। মেরু বিড়াল, বাইসন, বল্গা হরিণ, নেকড়ে, উট এবং বিভিন্ন গোত্রের বাদুড়ও পাওয়া যায়। লাফানো ইঁদুর (Jumping mouse ; Zapus sp.) এবং জারবোয়া (Jerboa : Dipus sp.) এই অঞ্চলের বিশেষত্ব।

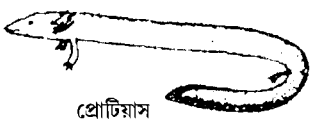
প্রোটিয়াস

নেকচুরাসা

হাইলা

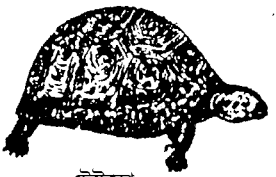
টেস্টুডো

অক্সোলোটিল লার্ভা

ট্রায়োনিক্স

শজারু

মাছরাঙা

পেট্রোমাইজন

মেরু বিড়াল

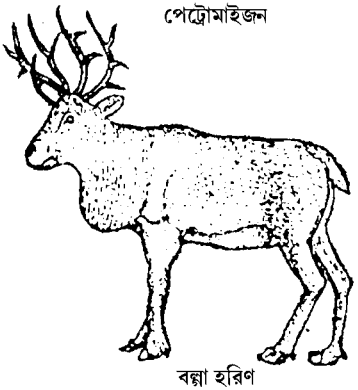
বল্গা হরিণ

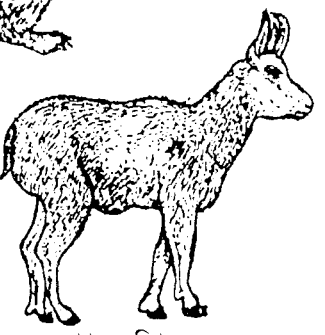
শ্যাময় হরিণ

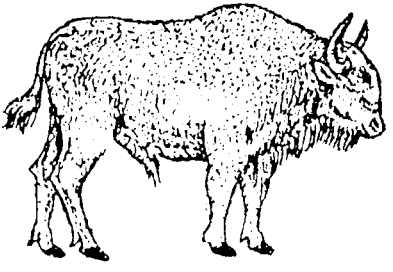
ইউরোপীয় বাইসন

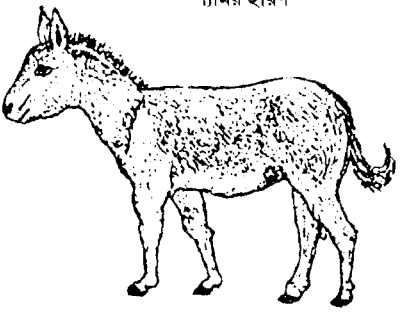
বুরো গাধা

প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের কিছু প্রাণী

ওয়ালেস এই অঞ্চলকে 4টি উপঅঞ্চলে ভাগ করেছেন। সেই উপঅঞ্চলগুলির নাম আগেই আলোচনা করেছি। এবার আসুন সেই উপঅঞ্চলগুলির সম্বন্ধে একটু ধারণা করি।

(i) **ইউরোপীয় উপঅঞ্চল ঃ** উত্তর ও মধ্য ইউরোপ এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। দক্ষিণে পিরেনিজ পর্বত, আল্পস পর্বত, ককেশাস পর্বতের দক্ষিণাংশ, বল্কান এবং কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি।

উভচরের মধ্যে ইউরোপীয় স্যালামাণ্ডার প্রোটিয়াস (Proteus), পাখীদের মধ্যে ট্রিট, থ্রাস, ওয়াগটেল, স্তন্যপায়ীর মধ্যে নেকড়ে, ছুঁচো, সজারু, শ্রু (shrew), মায়গেল ইত্যাদি এই অঞ্চলের বিশেষত্ব।

(ii) **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ঃ** অবশিষ্ট ইউরোপ, আরব, আফ্রিকার কিছু অংশ, এশিয়ামাইনর, পারস্য, আফগানিস্তান এবং বালুচিস্তান এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

শকুন, উপাপা, প্যাষ্টর পাখী এবং হাতী, হায়না, সজারু, সিভেট, হাইরাক্স (Hyrax) ইত্যাদি এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

(iii) **সাইবেরীয় উপঅঞ্চল ঃ** হিমালয়ের উত্তরে এশিয়ান অঞ্চল এই উপঅঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে প্রচন্ড শীত হওয়ায় প্রাণীদের উপস্থিতি কম।

কস্তুরী মৃগ (Musk deer) এবং বৈকাল হ্রদে শীল **(Phoco siberica)** পাওয়া যায়।

(iv) **মাঞ্চুরিয়ান উপঅঞ্চল ঃ** জাপান, কোরিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া এই অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত।

এই অঞ্চলের তিব্বতী লেঙ্গুর, বৃহৎ পাণ্ডা, ইলাফোডাস হরিণ (Elaphodus) প্রভৃতি পাওয়া যায়।

2. নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic Realm)

ভৌগোলিক সীমা ঃ উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণে মেক্সিকো, পূর্বে গ্রীনল্যাণ্ড, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে অ্যালুসিয়ান (Aleutian) দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের চারিদিকে সমুদ্র। দক্ষিণে সঙ্কীর্ণ স্থলভাগ দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত।

জলবায়ু ঃ প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের জলবায়ুর সঙ্গে এখানকার জলবায়ুর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ প্রবল শীত এবং গরম দুটোই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। উত্তরের আর্কটিক বা মেরু অঞ্চলের অবস্থানের জন্য উত্তরের জলবায়ু প্রচণ্ড শীতল। দক্ষিণের অঞ্চল বিষুবরেখার কাছে হওয়ায় ঐ অঞ্চলের জলবায়ু অত্যধিক উষ্ণ।

উদ্ভিদ ঃ পূর্বাঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের ঘন অরণ্য দেখা যায়, কিছু কিছু অঞ্চলে কনিফার বনভূমি দেখা যায়। মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ প্রেইরী অঞ্চল দক্ষিণে অঞ্চলে শুষ্ক মরুভূমি।

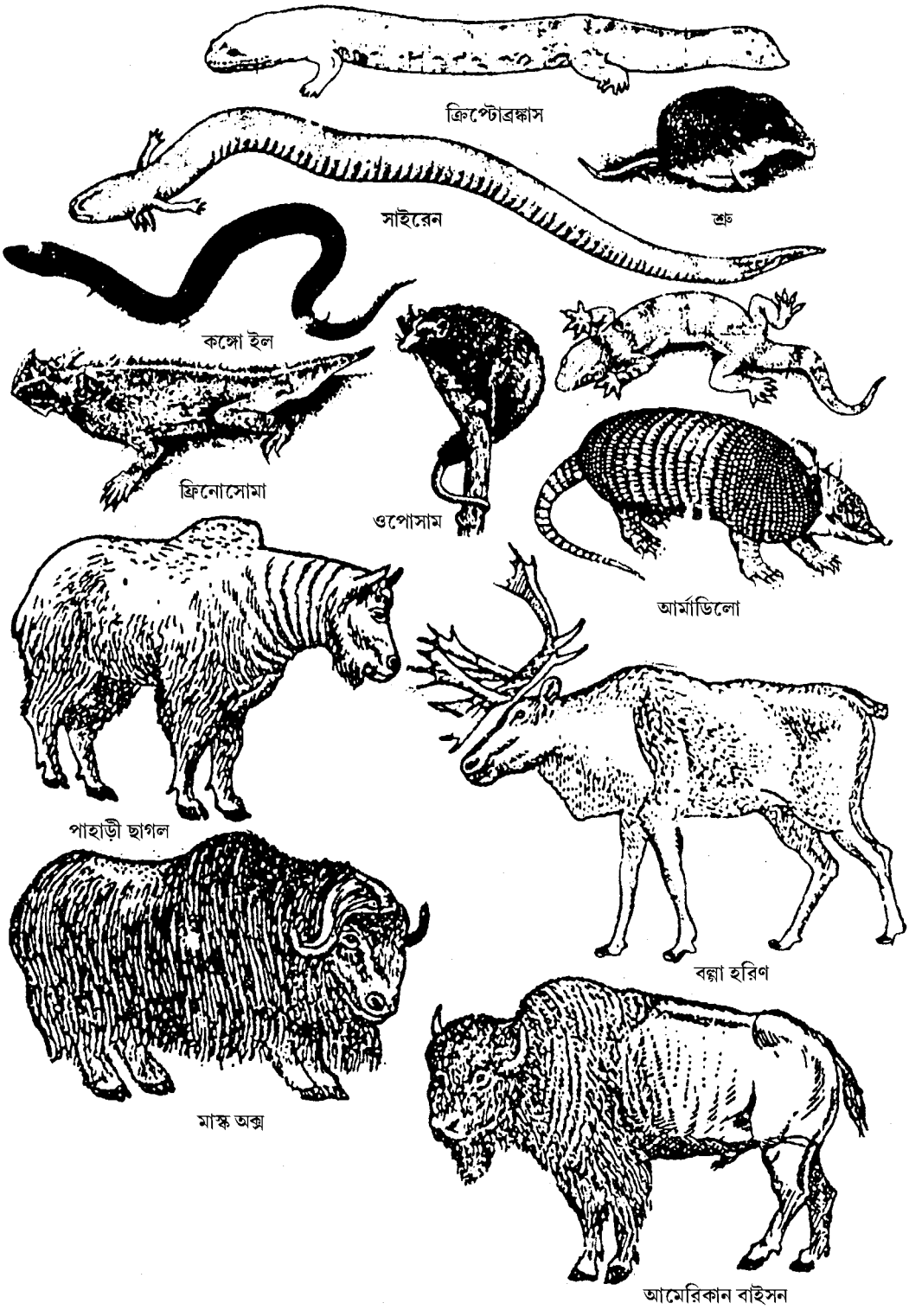

নিআর্কিটক অঞ্চলের কিছু প্রাণী

প্রাণী ঃ এই অঞ্চলের সঙ্গে যেহেতু প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের জলবায়ু মিল আছে তাই প্রাণীগোষ্ঠীর প্রচুর মিল পাওয়া যায়। প্রায় 14টি উভচর গোষ্ঠীর, 21টি সরীসৃপগোত্রীয়, 59টি পাখীগোত্রীয় এবং 26টি গোত্রের স্তন্যপায়ী পাওয়া যায়।

মৎস্য ঃ গারপাইক বা লেপিসসটিয়াস (Lepisosteus), পলিডন **(Polydon),** বিভিন্ন প্রজাতির পার্চ, স্টার্জিয়ন **(Acipenser),** পারালাব্রাক্স **(Paralabrux),** হুরো **(Huro),** বোলেসোমা **(Bolesoma)** ইত্যাদি পাওয়া যায়।

উভচর ঃ লেজযুক্ত উভচর অ্যাম্ফিউমা **(Amphiuma),** অ্যাম্বাইস্টোমা **(Ambystoma),** আক্সোলোট্‌ল (Axolotl), ক্রিপ্টোব্রঞ্চাস **(Cryptobronchus),** সাইরেন **(Siren)** ইত্যাদি। লেজবিহীন বিউফো **(Bufo),** রানা **(Rana),** হাইলা (Hyla) পাওয়া যায়।

সরীসৃপ ঃ ট্রায়োনিক্স **(Trionix),** চেলিড্রা **(Chelydra),** অ্যারোমোচেলিস **(Aromochelys)** ইত্যাদি কচ্ছপ, ফ্রিনোসোমা **(Phrynosoma),** উটা **(Uta),** গেক্কো **(Gekko),** অফিউসরাস (Ophioceros), কাইলোমেনিসকাস **(Chilomeniscus),** পিটুওফিস **(Pituophis),** ফারানসিয়া **(Farancia),** প্রবাল সাপ **(Coral Snake),** পাইথন, পিটবোড়া ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পাখী ঃ এই অঞ্চলের অধিকাংশ পাখী পরিযানশীল। প্রায় 54টি গণের পাখী পাওয়া যায়। টার্কি (Turkey), পেলিকান (Pelican), কাক, কোকিল, বাজ, বক, শকুন, হাঁস, মাছরাঙা, হার্মিং বার্ড, কাঠঠোকরা, ফ্লাই ক্যাচার (fly catcher), ইত্যাদি এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

স্তন্যপায়ী ঃ প্রায় 26টি গোত্রের স্তন্যপায়ী প্রাণী এই অঞ্চলে পাওয়া যায়, ওপোসাম **(Didelphis),** আর্মাডিলো **(Armadillo),** শ্রু (Shrew), বাইসন ক্যারিব্যু (Caribon), প্রংহর্ন (Pronghorn), পাহাড়ী বিভার (Beaver) এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাণী। ষ্টার-নোজড মোল (star-nosed mole : **Condylura cristata),** লম্বা পায়ের বাদুড় এবং লিফ-নোজড বাদুড় (leaf-nosed bat : **Phyllostoma)** এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাণীদের অন্যতম।

এই অঞ্চলের 4টি উপবিভাগ—

(i) **ক্যালিফোর্নিয়ান উপঅঞ্চল (Californian Subregion)**

উত্তর আমেরিকার সিয়ারা নেভাদা এবং কাসকেড পর্বতমালার মধ্যবর্তী একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

হ্যাপ্লোডনচিডি (Haplodontidae), ক্যামাসিডি (Chamacidae) এবং অ্যানিয়েলিডি (Aniellidae)— এই তিনটি শ্রেণীর প্রাণী এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। ভ্যাম্পায়ার (Vampire / রক্তচোষা বাদুড়) এই অঞ্চলে বিশেষ প্রাণী।

(ii) **রকি পার্বত্য অঞ্চল ঃ** ক্যালিফোর্নিয়ার পূর্বে অবস্থিত শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চল।

প্রঙ্ক বাফ **(Antelocarpa),** পার্বত্য ছাগল **(Haplocerus),** প্রেইরী কুকুর **(Cynomys)** এবং বিষাক্ত গিরগিটি এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

(iii) **অ্যালিঘানী উপঅঞ্চল ঃ** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। রকি পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত। এই অঞ্চলে বিশাল হ্রদ আছে।

ওপোসাম **(Didelphis),** ষ্টার-নোজড সাপ, ভ্যামপায়ান, বার্তাবহ পায়রা, ক্যারোলিনা তোতাপাখী, টার্কি, সাইরেন এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাণী।

(iv) **কানাডা উপঅঞ্চল ঃ** গ্রীনল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকার অবশিষ্ট অংশ নিয়ে বিস্তৃত।

রেনডিয়ার (raindeer), বাইসন, ভেড়া, মেরুভল্লুক এবং আর্কটিক খেকশিয়াল এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

3. **নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical Realm) :** দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকোর নিম্নভূমি এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজ নিয়ে গঠিত। নিআর্কটিক অঞ্চলের সঙ্গে মধ্য আমেরিকা যোজক (Central America isthmus) দ্বারা যুক্ত। বাকী সমস্ত দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা।

জলবায়ু ঃ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ এবং বাকী সমস্ত অঞ্চল উষ্ণ।

উদ্ভিদ ঃ উন্নত বনভূমিই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। আমাজন নদীর অববাহিকায় ঘন চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায়। সাভানা ও আর্জেন্টিনায় তৃণভূমির প্রাধান্য।

প্রাণী ঃ প্রায় 155টি গোত্রের মেরুদন্ডী প্রাণী পাওয়া যায়। তার মধ্যে 39টিই এই অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রাণী।

মাছ ঃ স্বাদু জলের মাছ বেশী পাওয়া যায়। কার্পজাতীয় মাছ পাওয়া যায় না। ক্যাট্‌ফিস, ইলেকট্রিক ইল পাওয়া যায়। লাঙফিস, অর্থাৎ ফুসফুসধারী মাছ **(Lepidosiren)** এবং গারপাইক (Lepisoteus) এই অঞ্চলের বিশেষ মাছ।

উভচর ঃ সিসিলিয়ান গোষ্ঠীর পদবিহীন উভচরের মধ্যে প্রধান হল রাইনোট্রিমা **(Rhinotrema)** এবং সাইফোনোপসিস **(Siphonopsis)** এ ছাড়াও গেছোব্যাঙ (Hyla), পাইপা (Pipa), সোনাব্যাঙ (Rana), কুনোব্যাঙ (Bufo) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সরীসৃপ ঃ কুমীর, অ্যালিগেটর (Alligator), কচ্ছপ **(Chelys),** তক্ষক **(Gecko)** এবং হেলোডার্মা **(Heloderma)** ইত্যাদি। সাপের মধ্যে ড্রোমিকাস **(Dromicus),** বোয়া **(Boa),** এপিক্রেটস **(Epicrates)** ইত্যাদি এবং ইগুয়ানা (Giant lizard : **Iguana**)।

পাখী ঃ প্রায় 67টি গোত্রের পাখী পাওয়া যায়। এর মধ্যে রিয়া **(Rhea),** টিনেমাস **(Tinamus)** এই অঞ্চলের বিশেষ পাখী। এরা উড়তে পারে না। এছাড়া হেরণ (Heron), ষ্টর্ক (Stork), হাঁস, প্লোভার (Plover), পায়রা, তোতাপাখী, জ্যাকানা (Jacana), সোয়ালো (Swallow), থ্রাস (Thrus) ইত্যাদি।

হেলোডার্মা

মিরমেকোবায়াস

অ্যালিগেটর

শ্লথ

ইগুয়ানা

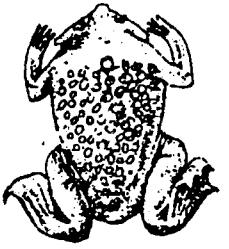

পাইপা

জ্যাকানা

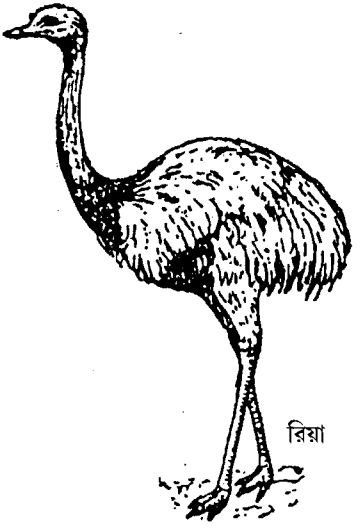

রিয়া

নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের কিছু প্রাণী

মিরমেকোফ্রাগা

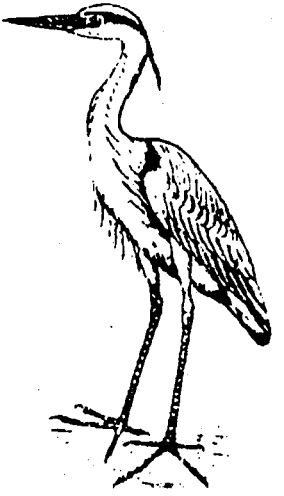

হেরন

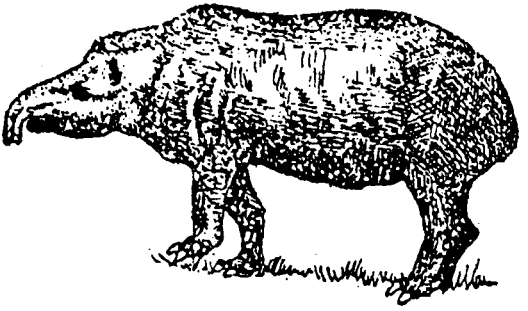

টাপির

স্পাইডর বানর

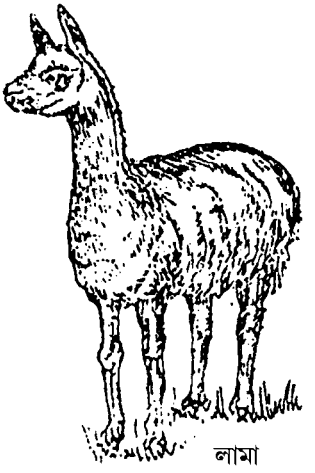

লামা

নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের কিছু প্রাণী

স্তন্যপায়ী : ওপোসাম **(Didelphis),** পিপিলিকাভুক **(Myrmecophaga),** আর্মাডিলো **(Armadillo),** শ্লথ (Sloth), পুমা (Puma), রক্তচোষা বাদুড় **(Desmodon)** উট ইত্যাদি।

এই অঞ্চলের 4টি উপঅঞ্চলগুলি হল—

(i) **চিলি উপঅঞ্চল ঃ** দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চল, পেরু, বলিভিয়া নিয়ে এই অঞ্চলের সীমানা। টিয়েরা ডেল ফিগোর শীতল জঙ্গল, পেটাগসিয়ার সমতলভূমি ও লা প্লাষ্টার পাম্পাস-এর অন্তর্গত।

চিনচিলা, রিয়া প্রভৃতি এর উল্লেখযোগ্য প্রাণী.

(ii) **ব্রাজিল উপঅঞ্চল ঃ** ব্রাজিল এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে ট্রপিক্যাল অরণ্য আছে। এ ছাড়াও গভীর বনবেষ্টিত অনেক চারণভূমি আছে।

রক্তচোষা বাদুড়, সজারু, শ্লথ, আর্মাডিলো, ওপোসাম এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

(iii) **মেক্সিকো উপঅঞ্চল ঃ** উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলই মেক্সিকো উপঅঞ্চল। সমগ্র মেক্সিকোই এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

টাপির (Tapir), প্লেথোডনটিডি, অ্যাঙ্গুইডি জাতীয় প্রাণী উল্লেখযোগ্য।

(iv) **অ্যান্টিলিয়ান বা ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ান উপঅঞ্চল ঃ** টোবাগে ও ত্রিনিদাদ বাদে সমস্ত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দ্বীপগুলি হল—কিউবা, জ্যামাইকা, পোর্টোরিকা, বারমুডা, গ্রেনাডা ইত্যাদি।

সেলিনোডনটিডি ও টডিডি এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাণী।

4. **ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopean Realm) :** উত্তরাংশে কিছু অঞ্চল বাদে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ, সৌদি আরব, মাদাগাস্কার এবং কিছু সামুদ্রিক দ্বীপ এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

জলবায়ু ঃ প্রধানত উষ্ণ জলবায়ু।

উদ্ভিদ ঃ এই অঞ্চলে চিরহরিৎ বনাঞ্চলের প্রাধান্য। কোন কোন অংশে বিস্তীর্ণ তৃণভূমিও পাওয়া যায়।

প্রাণী ঃ এই অঞ্চলের পাখী ও প্রাণীদের সঙ্গে ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের পাখী ও প্রাণীদের প্রচুর মিল আছে। এই অঞ্চলের প্রাণীসম্পদ বৈচিত্র্যপূর্ণ।

মাছ ঃ সিলুরিডি, সাইপ্রিনিডি, লাঙফিস (Protopterus) ইত্যাদি পাওয়া যায়, স্বাদু জলের মাছে ক্যাটফিস ও কার্প প্রচুর পাওয়া যায়। কার্প হল রুই, কাতলা প্রভৃতি এবং ক্যাটফিস-জাতীয় মাছ হল শিঙি, মাগুর, শোল ইত্যাদি।

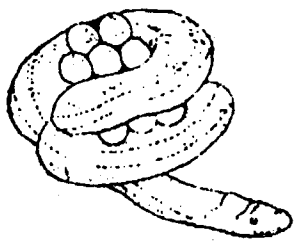

সিসিলিয়ন

জেনোপাস

ইথিওপিয়া অঞ্চলের ২টি উভচর প্রাণী

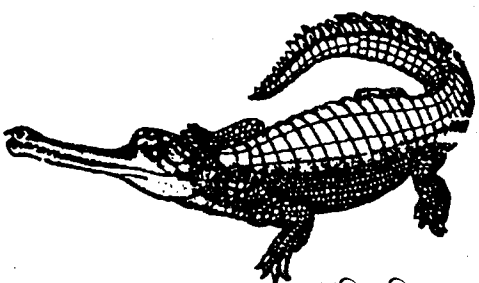

গ্যাভিয়েলিস

অস্ট্রিচ

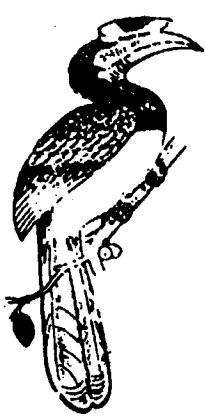

হনবিল

হেরন

ইথিওপিয়া অঞ্চলের কিছু প্রাণী

জেব্রা

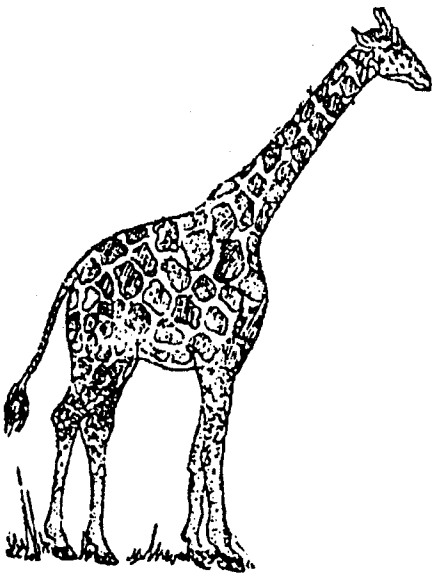

জিরাফ

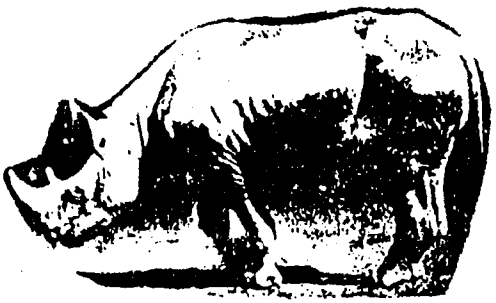

দুইশৃঙ্গ গণ্ডার

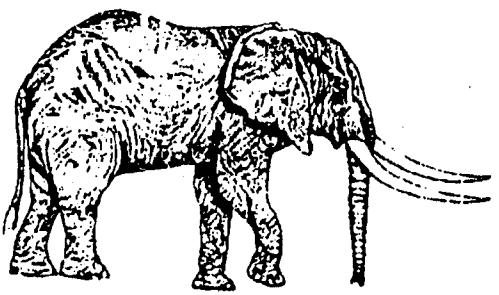

আফ্রিকান হাতি

জলহস্তী

গরিলা

উড়ন্ত কাঠবেড়ালী

ইথিওপিয়া অঞ্চলের কিছু প্রাণী

উভচর ঃ নখরযুক্ত ব্যাঙ **(Xenopus)** এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এ ছাড়া র‍্যাকোফোরাস **(Rachophorus),** সিসিলিয়ান (Caecilians), রেভিসিপিটিডি (Bravicipitidae), কুনো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, গেছোব্যাঙ ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সরীসৃপ ঃ ক্যামেলিয়ান **(Chamaeleon),** আগামা **(Agama),** মোনোট্রফিস **(Monotrophis)** ইত্যাদি গিরগিটি এখানে পাওয়া যায়। পাইথন, বোয়া কলুব্রিড, টিফ্লপ (Typhlop) ভাইপেরা, কুমীর, কচ্ছপ, ঘড়িয়াল, গোখুরো ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পাখী ঃ পাখীদের মধ্যে অষ্ট্রিচ (Ostrich), হুপিস (Hoopes), সেক্রেটারী পাখী, হেলমেট পাখী, মাউসবার্ড, হ্যামার-হেডেড বার্ড (Hammer-headed bird) ইত্যাদি আঞ্চলিক। এ ছাড়াও হর্ণবিল, হেরন, ষ্ট্রর্ক, থ্রাস, লার্ক, বি-ইটার (Bee-eater), বাষ্টার্ড, সোয়ালো ইত্যাদি।

স্তন্যপায়ী ঃ খরগোস, কাঠবিড়ালী, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রায় সবরকম সাধারণ স্তন্যপায়ী পাওয়া যায়। বিশেষ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে লরিস **(Loris),** লেমুর **(Lemur),** শিম্পাঞ্জী, গরিলা, প্যাঙ্গোলিন (Pangolin), দুইশৃঙ্গ গণ্ডার, হাতি **(Loxodonta),** জিরাফ, জেব্রা, বেবুন, সিভেট (Civet), অ্যান্টিলোপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই অঞ্চলের উপবিভাগগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

(i) **পূর্ব-আফ্রিকান উপঅঞ্চল ঃ** ট্রপিক্যাল আফ্রিকা ও ট্রপিক্যাল আরব এ অঞ্চলের অন্তর্গত।

গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রা, হোয়েল-হেডেড পাখী (whale-headed bird), ক্রেষ্টেড র‍্যাট (crested rat) এই অঞ্চলের বিশেষত্ব।

(ii) **পশ্চিম আফ্রিকান উপঅঞ্চল ঃ** পশ্চিমে জাম্বিয়া নদী থেকে চাড হ্রদ পর্য্যন্ত এই অঞ্চল। আফ্রিকার বেশীরভাগ বনভূমিই এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ প্রাণী হল গরিলা, শিম্পাঞ্জী, বাঁদর, উড়ুক্কু কাঠবিড়ালী ইত্যাদি।

(iii) **দক্ষিণ আফ্রিকান উপঅঞ্চল ঃ** আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চল মোজাম্বিক এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য প্রাণী হল সোনালী ছুঁচো, খরগোস, নেকড়ে, সেক্রেটারী বার্ড এবং উটপাখী।

(iv) **ম্যালাগাসী উপঅঞ্চল ঃ** মাদাগাস্কার, রড্রিগেজ মরিশাস, সেচেলিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত।

উল্লেখযোগ্য প্রাণী হল আয়া-আয়া (Aye-Aye), হেলমেট বার্ড ইত্যাদি পাখী এবং সিভেট, লেমুর, টেনরেক (tenrec) ইত্যাদি।

5. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental Realm)

ভারত, ইন্দোচায়না, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্নিও, ফর্মোসা এবং ফিলিপিনস দ্বীপপুঞ্জ এর অন্তর্গত। দক্ষিণ চীন ও তিব্বত এর অন্তর্গত। হিমালয় পর্বতমালা ওরিয়েন্টাল ও প্যালিআর্কটিক অঞ্চলকে পৃথক করেছে।

জলবায়ু ঃ উত্তর ভারতে নাতিশীতোষ্ণ, এছাড়া সমস্ত অঞ্চলই উষ্ণ। পশ্চিমাংশে মরুভূমি দেখা যায়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হারও বেশী। প্রায় 1500 mm এরও বেশী।

উদ্ভিদ ঃ পূর্বে চিরহরিৎ অরণ্য এবং দক্ষিণে ঘন ট্রপিক্যাল অরণ্য দেখা যায়।

প্রাণী ঃ এই অঞ্চলের প্রাণীদের সঙ্গে ইথিওপিয়ার অঞ্চলের প্রাণীর সাদৃশ্য দেখা যায়। কিছু প্রাণীর সঙ্গে আবার প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের প্রাণীদের মিল দেখা যায়। আবার কিছু সরীসৃপ, পাখী বাদুড়ের অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের সঙ্গেও মিল দেখা যায়।

মাছ ঃ কার্প (Carp) এবং ক্যাটফিস (Catfish) এই অঞ্চলের মাছ। এই অঞ্চল মৎস্যসমৃদ্ধ। কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাসু এবং জিওলমাছের মধ্যে ল্যাটা, মাগুর, সিঙ্গি, কৈ, ট্যাংরা, বোয়াল, ভেটকী ইত্যাদি।

উভচর ঃ ভারতীয় স্যালামাণ্ডার (Tylototriton verrucossus) এই অঞ্চলের একমাত্র লেজযুক্ত উভচর। এছাড়া লেজবিহীন উভচর, যথা— সোনাব্যাঙ (Rana tigrina), কুনোব্যাঙ (Bufo melatoslictus) গেছোব্যাঙ (Rachophorus) ইত্যাদি পাওয়া যায়। সিসিলিয়ানও পাওয়া যায়।

সরীসৃপ ঃ সাপের মধ্যে টিফলপ্ **(Typhlop),** কলুব্রিড, পাইথন, ভাইপার, পিটভাইপার নাজা (Naja) ইত্যাদি। এছাড়া গোকো (Gecko), ভারানাস (Varanus) ক্যামেলিয়ন-জাতীয় গিরগিটি ও কচ্ছপ, কুমীর, ঘড়িয়াল (Gavialls) ইত্যাদি পাওয়া যায়। কচ্ছপের মধ্যে ট্রায়োনিক্স (Trionix), টেষ্টুডো (Testudo) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পাখী ঃ কাঠঠোকরা, চড়ুই, দোয়েল, হাঁস, মুরগী, তোতাপাখী, টিয়া, ময়না, কাক, বাবুই, সারস, ময়ূর ইত্যাদি।

স্তন্যপায়ী ঃ সজারু, শ্রু, খরগোস, কাঠবেড়ালী, উড়ুক্কু কাঠবেড়ালী, পতঙ্গভুক, প্যাঙ্গোলিন, বেজী, একশৃঙ্গ গণ্ডার **(Rhinoceros unicornis),** হাতী **(Elephas),** সিংহ, বাঘ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, বন্য কুকুর, নেকড়ে, ইঁদুর, নানা ধরনের হরিণ, কস্তুরী মৃগ (Musk deer) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলের অন্তর্গত উপঅঞ্চলগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) **ভারতীয় উপঅঞ্চল ঃ** সমগ্র ভারতবর্ষ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

প্রাণীদের মধ্যে ব্ল্যাকবাক, অ্যান্টিলোপ, ভারতীয় ভল্লুক, ময়ূর, গণ্ডার, ইত্যাদি পাওয়া যায়। এশিয় সিংহ ভারতের গীর অঞ্চলে পাওয়া যায়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়।

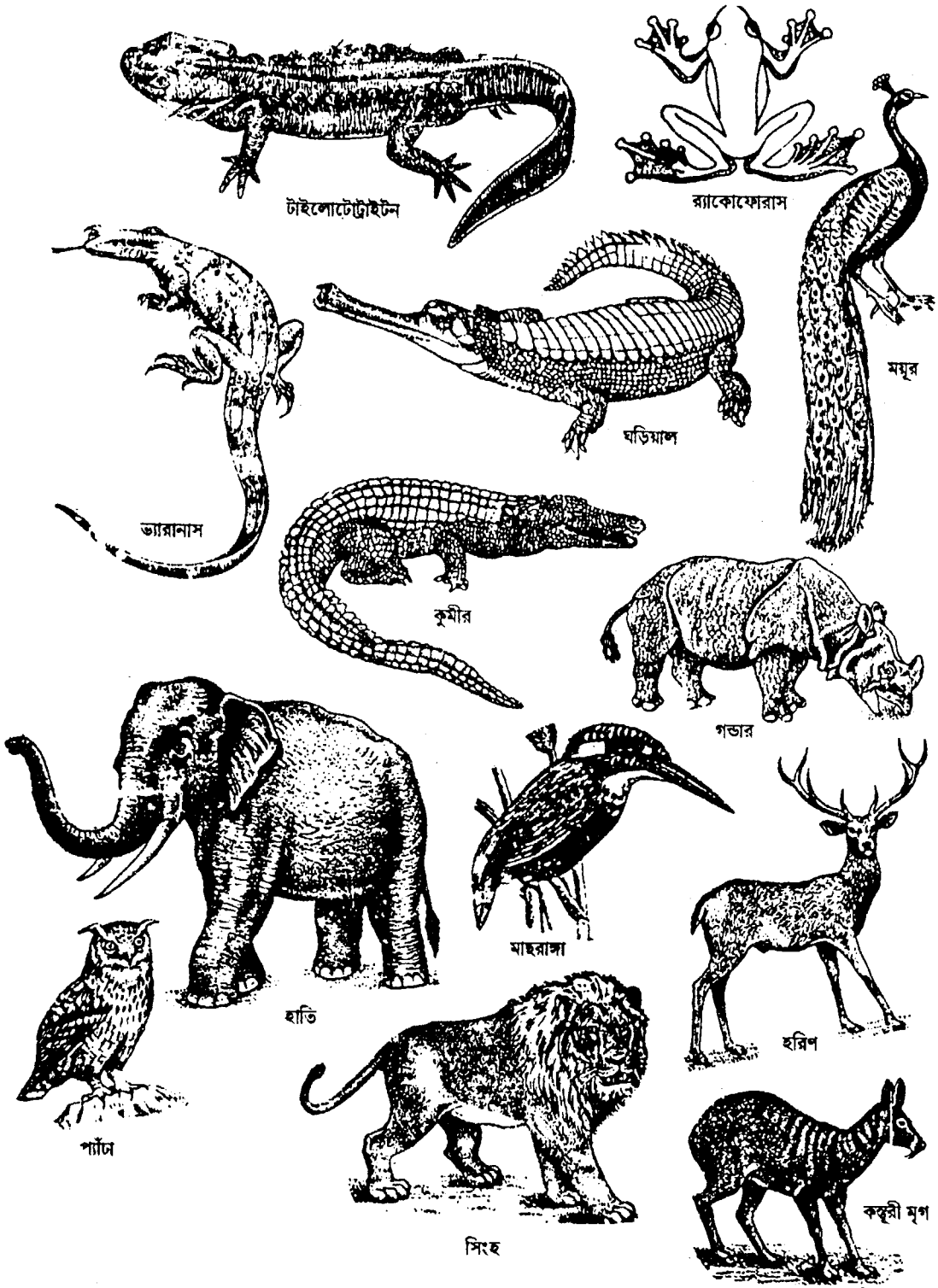

ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কিছু প্রাণী

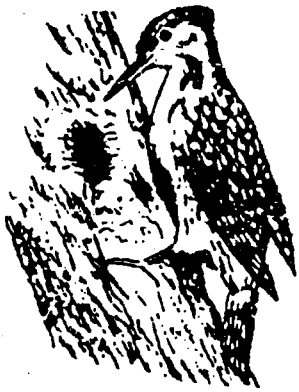

কাঠঠোকরা

বাঘ

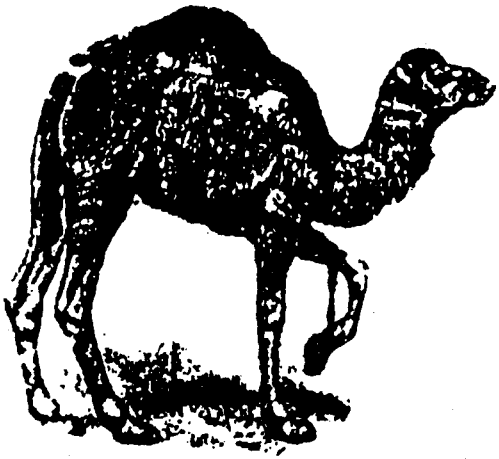

উট

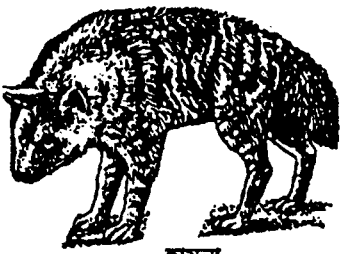

হায়না

গাউর

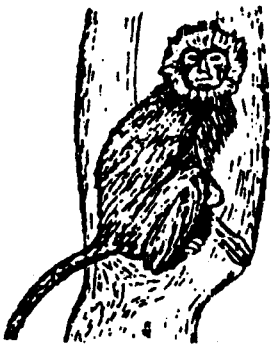

হনুমান

কৃষ্ণসার হরিণ

ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কিছু প্রাণী

(ii) **সিলোনীজ উপঅঞ্চল ঃ** দক্ষিণ ভারতের উপদ্বীপসমূহ এবং শ্রীলঙ্কা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

লবিস, স্প্রিংবাক, শীলটেল এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

(iii) **ইন্দোচীন উপঅঞ্চল ঃ** মায়ানমার, শ্যাম ও চীনের দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

উল্লেখযোগ্য প্রাণীগুলি হল গিবন, উড়ুক্কু লেমুর, গণ্ডার, পাণ্ডা ইত্যাদি।

(iv) **ইন্দোমালায়ান উপঅঞ্চল ঃ** মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোমালয় অঞ্চল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখযোগ্য প্রাণীগুলি হল ওরান ওটাং (Orang utang), উল্লুক (Gibbon), উড়ুক্কু লেমুর, গণ্ডার, টেপির, ব্যাজার এবং হনুমান।

6. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian Realm)

অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউগিনি, তাসমানিয়া, মালাস্কা, এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের সঙ্গে অন্য কোন অঞ্চলের স্থল যোগাযোগ নেই।

জলবায়ু ঃ অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশ উষ্ণ, নিউজিল্যান্ড ও তাসমানিয়া নাতিশীতোষ্ণ। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগের আবহাওয়া শুষ্ক। এই অঞ্চলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী।

উদ্ভিদ ঃ উষ্ণ অঞ্চলের ঘন অরণ্য দেখা যায়। বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ায় উদ্ভিদ সম্পদ প্রচুর। তবে শুষ্ক স্থানে গাছপালা কম।

প্রাণী ঃ এই অঞ্চলের প্রাণীসম্পদ বৈচিত্র্যময়।

মাছ ঃ ফুসফুসযুক্ত নিওসেরাডোটাস **(Neoceradotus)** এবং অস্টিওগ্লসিড (Osteoglossid) এই অঞ্চলের বিশেষ মাছ।

উভচর ঃ হাইলা (Hyla), রানা (Rana), সিউডোফ্রিন (Pseudophryne), প্যাকিব্যাট্রাকাস (Pachybatrachus), হেলিওপোরাস (Helloporus), পোলোডাইরাস (Polodyras) ইত্যাদি। জেনোবাইনিডি (Xenorhinidae) পরিবারভুক্ত উভচর নিউগিনিতে পাওয়া যায়।

সরীসৃপ ঃ পাইথনিডি ও ইলাপিডি পরিবারভুক্ত সাপ পাওয়া যায়। যেমন—পাইথন, টাইগার স্নেক (Tiger snake) এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এছাড়া তক্ষক, কুমীর, গোসাপ, টিফ্‌লপ প্রভৃতি এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। জীবন্ত জীবাশ্ম স্ফেনোডন **(Sphenodon)** বা টুয়াটারা (Tuatara) একমাত্র এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। স্নেক নেকড কচ্ছপ **(Chelodina)** এই অঞ্চলের বিশেষ কচ্ছপ।

পাখী ঃ এই অঞ্চলের পাখীদের মধ্যে বাজ, পায়রা, মাছরাঙা, তোতাপাখী, কোকিল, প্যাচাঁ, উড সোয়ালো (wood swallow) ইত্যাদি। বাওয়ার পাখী, ক্যাসুয়ারী, লায়ারবার্ড, ম্যাগপাই, এমু, কিউই, স্বর্গের পাখী (Birds of Paradise), স্ক্রাব এই অঞ্চলের আঞ্চলিক পাখী।

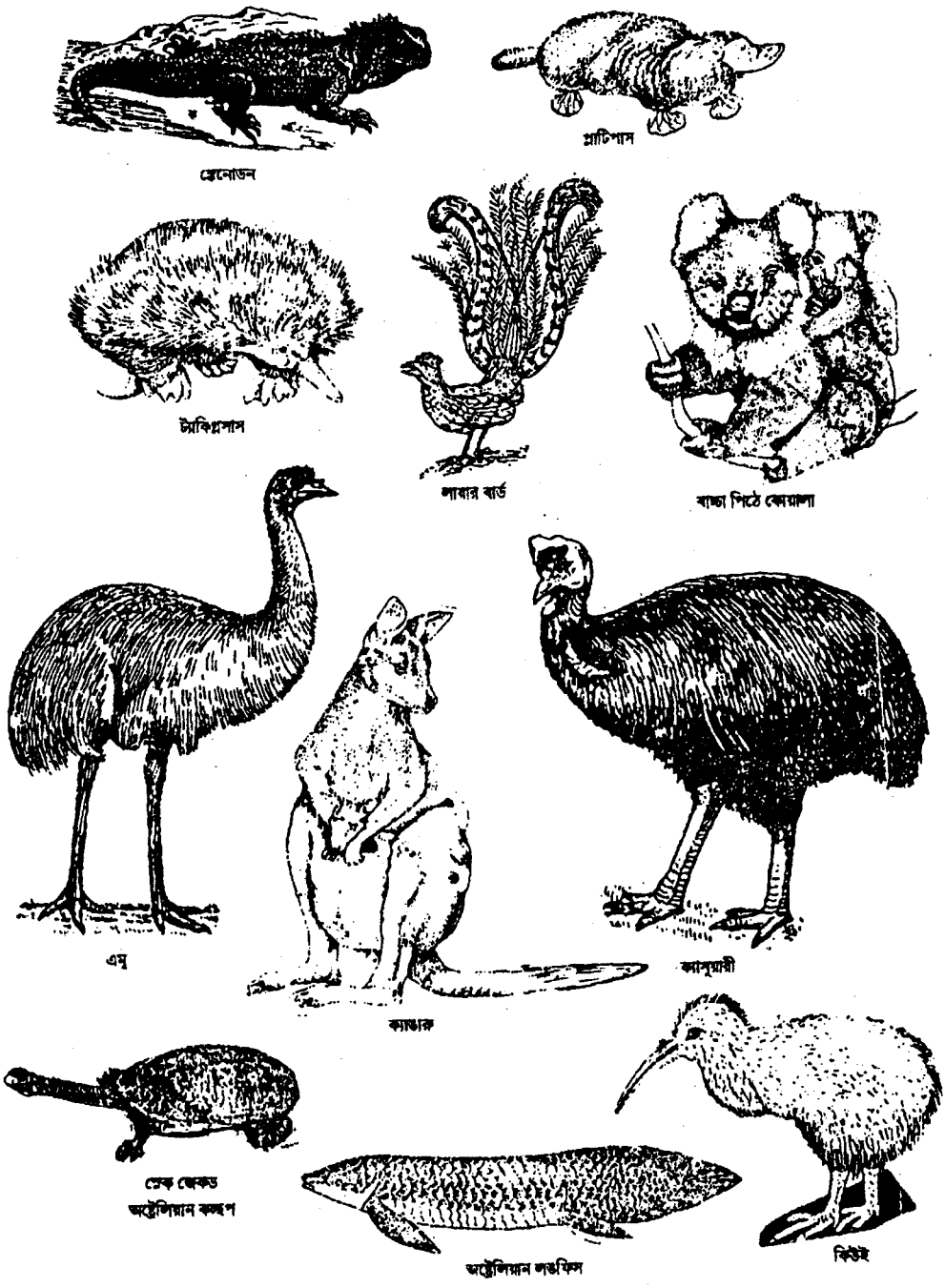

অষ্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের কিছু প্রাণী

স্তন্যপায়ী ঃ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মনোট্রিম বা হংসচঞ্চু **(Ornithorhynchus),** কাঁটাওয়ালা পিপিলীকাভুক **(Tachyglossus),** কাঙারু এই অঞ্চলের আঞ্চলিক স্তন্যপায়ী। এছাড়া বাদুড়, উড়ুক্কু ফালেনজার, কুকুর, খরগোস, কোয়ালা, তাসমেনিয়ার নেকড়ে উল্লেখযোগ্য।

এই অঞ্চলের উপবিভাগগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) **অষ্ট্রোমালয় উপঅঞ্চল ঃ** নিউগিনি, মালাস্কা, সোলেমান দ্বীপপুঞ্জসহ মালয় আর্কিপেলোগো দ্বীপপুঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত।

নিউগিনি অঞ্চলের ঝুঁটিওয়ালা পায়রা, ফ্লইরিভর কচ্ছপ পাওয়া যায়। নিউগিনিতে ক্যাঙারু **(Dendrolagus),** স্বর্গের পাখী (Birds of Paradise), মৌপাখী, ক্যাসুয়ারী, কাকাতুয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়।

(ii) **অষ্ট্রেলিয়ান অঞ্চল ঃ** অষ্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া নিয়ে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলকে মারসুপিয়্যালের ঘর বলা হয়। এই অঞ্চলে ক্যাঙারু-জাতীয় প্রচুর মারসুপিয়াল পাওয়া যায়। উমব্যাট, মারসুপিয়াল মোল (Notoryctes), মারসুপিমাল ক্যাট, মারসুপিয়াল ব্যাণ্ডিকোট, হংসচঞ্চু, লায়ার বার্ড, এমু ইত্যাদি।

(iii) **পলিনেশিয়ান উপঅঞ্চল ঃ** পলিনেশিয়া ও স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপ নিয়ে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রাণীর সংখ্যা খুব কম। ডেপ্রনিডিড ও টুথবিল পায়রা এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাণী।

(iv) **নিউজিল্যাণ্ড উপঅঞ্চল ঃ** নিউজিল্যান্ড, নরফক দ্বীপ, ক্যামবেল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। বাদুড়, মুরিডি, জেসিড, কিউই, টুয়াটারা ইত্যাদি। লিওপেলমা (Leiopelma) জাতীয় ব্যাঙ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

অনুশীলনী-3

দক্ষিণ ও বাম স্তম্ভের বক্তব্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করুন ঃ

(a) স্যালমন	(i) গারপাইক
(b) নিওট্রপিক্যাল	(ii) শ্রু
(c) টেনরেক	(iii) হাইলা
(d) ইউরোপ	(iv) প্যালিআর্কটিক
(e) নিআর্কটিক	(v) ম্যালাগাসী

5.5 সারাংশ

প্রাণীবিস্তারের রীতিনীতি পর্যালোচনাকেই প্রাণীভূগোল বলে। প্রাণীদের বিশেষত মেরুদন্ডী প্রাণীদের বিস্তারের ভিত্তিতে এই পৃথিবীকে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল বা realm-এ ভাগ করা হয়েছে। স্কল্যাটার নামে এক বিজ্ঞানী এই পৃথিবীকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—(A) **ক্রিয়েশিও নিওগিয়ানা (Creatio Neogeana)** অর্থাৎ নিউ ওয়ার্ল্ড (New World) এই অঞ্চলের মধ্যে মোটামুটিভাবে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাকেও গ্রীণল্যান্ড ধরা হয়েছে। (B) **ক্রিয়েশিও প্যালিওগিয়ানা (Creatio Palaeogeana)** অর্থাৎ ওল্ড ওর্য়াল্ড (Old World)—এই অঞ্চলের মধ্যে সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, চীন, ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার, সিংহল প্রভৃতি দ্বীপসমূহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি পড়ে। ক্রিয়েশিও নিওগিয়ানাকে আবার দুটি অঞ্চল বা রিয়েলমস্-এ ভাগ করা হয়েছে—(1) **নিআর্কটিক অঞ্চল** ও (2) **নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল।**

এই **নিআর্কটিক অঞ্চলকে** আবার 4টি উপঅঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে— (i) ক্যালিফোর্নিয়া উপঅঞ্চল, (ii) রকি পার্বত্য উপঅঞ্চল, (iii) অ্যালিঘানী উপঅঞ্চল এবং (iv) কানাডা উপঅঞ্চল।

নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলেরও 4টি উপঅঞ্চল— (i) চিলি উপঅঞ্চল, (ii) ব্রাজিল উপঅঞ্চল, (iii) মেক্সিকো উপঅঞ্চল, (iv) অ্যান্টিলিয়া বা ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ান উপঅঞ্চল।

ক্রিয়েশিও প্যালিওগিয়ানাকে আবার 4টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে—(1) প্যালিআর্কটিক অঞ্চল; (2) ইথিওপিয়ান অঞ্চল; (3) ওরিয়েন্টাল অঞ্চল; (4) অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল।

আবার প্রত্যেকটি অঞ্চলকে 4টি করে উপরিভাগেও ভাগ করা হয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ ঃ

1. **প্যালিআর্কটিক অঞ্চল ঃ** (i) ইউরোপীয় উপঅঞ্চল; (ii) ভূমধ্যসাগরীয় উপঅঞ্চল; (iii) সাইবেরীয় উপঅঞ্চল; (iv) মাঞ্চুরিয়া উপঅঞ্চল।
2. **ইথিওপিয়া অঞ্চল ঃ** (i) পূর্ব আফ্রিকা উপঅঞ্চল; (ii) পশ্চিম আফ্রিকা উপঅঞ্চল; (iii) দক্ষিণ আফ্রিকা উপঅঞ্চল; (iv) ম্যালাগাসী উপঅঞ্চল।
3. **ওরিয়েন্টাল অঞ্চল ঃ** (i) ভারতীয় উপঅঞ্চল; (ii) সিলোনীজ উপঅঞ্চল; (iii) ইন্দোচীন উপঅঞ্চল; (iv) ইন্দোমালয় উপঅঞ্চল।
4. **অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল ঃ** (i) অস্ট্রোমালয় উপঅঞ্চল; (ii) অস্ট্রেলিয়ান উপঅঞ্চল; (iii) পলিনেশিয়ান উপঅঞ্চল; (iv) নিউজিল্যান্ড উপঅঞ্চল।

এইসব অঞ্চলের সীমা, জলবায়ু ও প্রাণীবিস্তারের বর্ণনা এই এককে দেওয়া হয়েছে।

5.6 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. ক্রিয়েশিও নিওগিয়ানা ও ক্রিয়েশিও প্যালিওগিয়ানা বলতে কী বোঝায়? **2.** ক্রিয়েশিও নিওগিয়ানা এবং ক্রিয়েশিও প্যালিওগিয়ানার কয়টি ভাগ এবং কী কী?

3. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) গ্রীনল্যান্ড _____ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। (b) ভারতের জাতীয় পাখী _____। (c) ভারতের জাতীয় পশু _____। (d) _____ অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের বিশেষ পশু। (e) চিলি উপঅঞ্চল _____ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। (f) আফ্রিকান উপঅঞ্চলের হাতীর নাম _____। (g) আফ্রিকার গণ্ডারের নাম _____। (h) Birds of Paradise _____ অঞ্চলের পাখী।

4. নিআর্কটিক অঞ্চলের উপবিভাগগুলি কী কী?

5. প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের উপবিভাগগুলি কী কী?

5.7 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

(a)—(ii), (b)—(v), (c)—(iv), (d)—(i), (e)—(iii)

অনুশীলনী—2

(a)—(iii), (b)—(v), (c)—(i), (d)—(ii), (e)—(iv)

অনুশীলনী—3

(a)—(iv), (b)—(iii), (c)—(v), (d)—(ii), (e)—(i)

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. 5.3 অনুচ্ছেদ দেখুন। 2. 5.3 অনুচ্ছেদ দেখুন। 3. (a) নিআর্কটিক, (b) ময়ূর, (c) বাঘ, (d) ক্যাঙারু, (e) নিওট্রপিক্যাল, (f) লোক্সোডোস্টা, (g) দুইশৃঙ্গ গণ্ডার, (h) অস্ট্রেলিয়ান। 4. 5.4 অনুচ্ছেদ দেখুন। 5. 5.4 অনুচ্ছেদ দেখুন।

একক 6 ❑ বিসরণ, বিসরণে বাধাসমূহ ও প্রাণীবিস্তারে বিসরণের প্রভাব (Disposal, Barriers and their Impact on Faunal Distribution)

গঠন

6.0 প্রস্তাবনা

6.1 উদ্দেশ্য

6.2 বিসরণ

6.2.1 বিসরণে বাধাসমূহ (Barriers of Dispersal)

6.2.2 বিসরণ ও প্রাণীবিস্তারে বিসরণের প্রভাব (Dispersal and their Impact on Faunal Distribution)

6.3 সারাংশ

6.4 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

6.5 উত্তরমালা

6.0 প্রস্তাবনা

পঞ্চম এককে আমরা প্রাণীভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বিভাজন ও প্রাণীর বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা প্রাণীর বিসরণ (Dispersal) সম্বন্ধে আলেনচা করব। এই বিসরণের প্রতিকূলে কি কি বাধার সৃষ্টি হয় এবং এইসব বাধার প্রভাব প্রাণীবিসরণে কিভাবে পড়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

6.1 উদ্দেশ্য

- এই এককটি আপনাকে প্রাণীদের বিস্তার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা দেবে।
- প্রাণীর বিসরণ কি কি কারণে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাণীদের বিসরণের পথগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিসরণের প্রতিকূল বাধাগুলির বিবরণ দিতে পারবেন।

6.2 বিসরণ

প্রাণীরা স্বাভাবিক অভ্যাসবশেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিচরণ করতে ভালবাসে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ও এই বিসরণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882) এই বিষয়গুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে জীবকে বেঁচে থাকার জন্যই প্রাণীদের বিসরণ ঘটে। যেমন খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব

ইত্যাদির জন্য প্রাণীরা বাধ্য হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। একই স্থানে বসবাসকালে খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে প্রাণীদের মধ্যে প্রজাতিগত সংগ্রাম শুরু হয়। প্রাণীবিসরণ এই সংগ্রামেরই ফল। এভাবেই প্রাণীরা বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং বিভিন্ন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণীদের এইভাবে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়াকেই বিসরণ বা Dispersal বলে।

কিছু কিছু কারণে প্রাণীদের এই বিসরণ বাধার সম্মুখীন হয়। প্রাণীদের বিসরণের পথে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় প্রাণীর বিসরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইসব প্রতিবন্ধকতাকেই বেরিয়ার (Barrier) বলে।

6.2.1 বিসরণে বাধাসমূহ (Barriers of Dispersal)

যে সব প্রতিবন্ধকতাগুলি প্রাণীর বিসরণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে তা হ'ল নিম্নরূপ :

A. ভৌত বাধা (Physical barrier)

B. এডাফিক বাধা (Edaphic barrier)

C. উদ্ভিজ্জ বাধা (Vegetative barrier)

D. জলবায়ুসংক্রান্ত বাধা (Climatic barrier)

E. জৈবিক বাধা (Biological barrier)

A. ভৌত বাধা (Physical barrier)

(i) পর্বতমালা : উঁচু এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতমালা প্রাণীদের বিসরণে বাধার সৃষ্টি করে। পর্বতমালা যদি বিষুবরেখার সমান্তরাল হয় তবে তা প্রাণীর বিসরণ বিশেষভাবে ব্যাহত করে। উদাহরণস্বরূপ হিমালয় পর্বতশ্রেণী। এই পর্বতশ্রেণী বিষুবরেখার সমান্তরাল। এর একদিকে উত্তরাঞ্চল ও অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চল। হিমালয়ের উত্তরাংশ শীতমন্ডলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের প্রাণীদের সঙ্গে ইউরোপের প্রাণীদের সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণাংশ কর্কটক্রান্তিমন্ডলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ এবং আর্দ্র। ভারতবর্ষ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের সঙ্গে আফ্রিকার জলবায়ুর বিশেষ মিল আছে। ফলে ভারতের জীবজন্তুর সঙ্গে আফ্রিকান জীবজন্তুর মিল দেখা যায়, যেমন হাতী, সিংহ ভারত এবং আফ্রিকা এই দুই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। কিন্তু হিমালয় পর্বতের প্রতিবন্ধকতা থাকায় ভারতের প্রাণীগোষ্ঠী কখনো হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে যেতে পারে না। বিপরীতভাবে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলের প্রাণীরাও হিমালয় অতিক্রম করে দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমের পর্বতমালা ও মেক্সিকোর মালভূমিও উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমভাগের পর্বতমালায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঐ জলপূর্ণ বায়ু যখন পর্বতশিখরে পৌঁছয় তখন তা ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে ঐ অঞ্চলে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু ঐ বায়ু যখন পূর্বদিকে পৌঁছায় তখন তাতে আর জলীয় বাষ্প থাকে না। ফলে সেখানে বৃষ্টিপাতও হয় না। বৃষ্টির অভাবে সেখানে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। অরণ্য অঞ্চলের প্রাণীগোষ্ঠীর সঙ্গে মরু অঞ্চলের প্রাণীগোষ্ঠীর প্রচুর পার্থক্য আছে।

আর একটি উদাহরণ হল মেক্সিকোর মালভূমি। মেক্সিকো মালভূমির আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ (Temperate)। এই মালভূমির দক্ষিণে ভূমি হঠাৎ করে নিম্নমুখী হওয়ায় ঐ অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র (Topical) হয়ে ওঠে। ফলে তা মালভূমি অঞ্চলের প্রাণীদের বিসরণে বাধার সৃষ্টি করে।

(ii) বিস্তীর্ণ জলরাশি ঃ বিস্তীর্ণ জলরাশি স্থলভাগের প্রাণীদের বিসরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এই বাধা কেবলমাত্র স্থলচর প্রাণীদের ক্ষেত্রেই ঘটে। খেচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ জলরাশি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

বিস্তীর্ণ জলরাশি দুরকমের হয়। মিষ্টি জল (sweet water) ও নোনা জল (Saline water)। এই দুই প্রকার জলের প্রাণীগোষ্ঠীর অভিযোজন ভিন্ন ভিন্ন। নোনা জলের অধিবাসীরা যথা ব্রাকিওপড, সমুদ্রতারা, একাইনয়েড, স্কুইড ইত্যাদি লবণাক্ত জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। এমনকি সমুদ্রের কোন অংশে লবণের পরিমাণ হ্রাস পেলে তারা সেখানেও বাস করতে পারে না। আবার মিষ্টি জলের অধিবাসীরা নোনা জলে বসবাস করতে পারে না। তবে এদের মধ্যে কিছু প্রাণী প্রজননের সময় পরস্পরবিরোধী জলে পরিযান করে। যথা ইলিশ মাছ। এরা লবণাক্ত জলের অধিবাসী। কিন্তু ডিম পাড়ার জন্য স্বাদু জলে পরিযান করে। একে বলে অ্যানাড্রোমাস পরিযান (Anadromous migration)। আবার বাইন, ইল মাছ মিষ্টি জলের অধিবাসী। কিন্তু প্রজননের সময় এরা লবণাক্ত জলে পরিযান করে। একে বলে ক্যাটাড্রোমাস পরিযান (Catadromous migration)। এই নোনা জলের জন্য কার্পজাতীয় মাছ অর্থাৎ রুই, কাতলা, মৃগেল, গারপাইক (garpike), শুঁড়ওয়ালা মাছ অর্থাৎ সিঙ্গী, মাগুর (cat fish) ইত্যাদি মাছ সবরকমের জলে পাওয়া যায় না।

উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও লবণাক্ত জল বাধাস্বরূপ। মাত্র 1 শতাংশ লবণের উপস্থিতিও উভচরের লার্ভাকে পরিণত প্রাণীতে পরিবর্তিত (metamorphosis) হতে বাধা দেয়। স্থলজ কচ্ছপও জলে সাঁতার কাটতে না পারায় জলরাশির বাধা অতিক্রম করতে পারে না।

সাপেরা যদিও জলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটতে পারে তথাপিও বিস্তীর্ণ জলরাশি অতিক্রম করতে পারে না। একমাত্র সামুদ্রিক সাপ (sea-snake) জলরাশির বাধা অতিক্রম করতে পারে।

পাখীদের মধ্যে রিয়া, অস্ট্রিচ, ক্যাসুয়ারী প্রভৃতি পাখী যারা উড়তে পারে না (Ratital bird) তাদের পক্ষেও বিস্তীর্ণ জলরাশি বিসরণে বাধার সৃষ্টি করে।

সাধারণ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পক্ষেও বিস্তীর্ণ জলরাশি বাধাস্বরূপ।

(iii) জলের লবণাক্ততা (Salinity of water) : জলে লবণের অভাবও বহু সামুদ্রিক প্রাণীর বিসরণে বাধা দেয়। যেমন কোরাল (Coral), স্পঞ্জ (Sponge), স্কুইড (Squid), তারামাছ (Starfish) এরাও স্বাদু জলে বেঁচে থাকতে পারে না।

(iv) প্রণালী (Strait) : বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত প্রণালী প্রাণীর বিসরণে বাধার সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ পক প্রণালী। 30 km চওড়া এই প্রণালী ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অবস্থিত। এই প্রণালীটি শ্রীলঙ্কায় বাঘের বিসরণে বাধার সৃষ্টি করেছে।

(v) **মরুভূমি ঃ** যে সকল প্রাণীদের জীবনচক্রের কোন না কোন পর্যায় জলে অতিবাহিত হয় মরুভূমি তাদের বিসরণে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ মরুভূমিতে জল না থাকায় ঐসকল প্রাণী বিশেষতঃ উভচর প্রাণীরা জলের অভাবে মরুভূমিতে জীবনচক্র সমাধা করতে পারে না। ফলে মরুভূমি পেরিয়ে তারা অন্য কোথাও যেতে পারে না।

(vi) **চাপ (Pressure) :** জলজ সামুদ্রিক প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা। সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে জলের চাপ বিভিন্ন প্রকার। তলদেশে জলের চাপ বেশী হওয়ায় সমুদ্রের উপরিভাগের পেলাজিক প্রাণী (Pelagic) সমুদ্রের নীচের তলে বসবাস করতে পারে না। বিপরীতভাবে তলদেশের বেশী চাপে অভ্যস্ত প্রাণীরা অপেক্ষাকৃত কম চাপযুক্ত সমুদ্রের উপরিভাগে বসবাস করতে পারে না। যথা হেটারোসোমাটা (Heterosomata)।

(vii) **আলো ঃ** নিশাচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে আলো একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। যথা বাদুড়। এরা রাতের অন্ধকারে যেমন স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে দিনের আলোয় তা পারে না।

B. এডাফিক বাধা (Edaphic barrier)

মাটির অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্ব স্থলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন শামুকজাতীয় প্রাণী। এদের দেহ খোলক দিয়ে আবৃত থাকে। এই গোলক চুণ দিয়ে তৈরী। যেখানে মাটিতে চুণের আধিক্য থাকে। এরা সেই মাটিতেই বসবাস করে। মাটিতে অম্লত্ব (acidity) বেশী থাকলে তা চুণকে ক্ষয় করে। তাই যে মাটিতে অম্লতার পরিমাণ বেশী থাকে সেই মাটিতে শামুকজাতীয় প্রাণী থাকতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে মাটির অম্লত্বও প্রাণীদের বিসরণের পক্ষে প্রতিবন্ধক।

C. উদ্ভিজ্জ বাধা (Vegetative barrier)

নিবিড় অরণ্যে বসবাসকারী জীব অরণ্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। যে সকল প্রাণীর গেছো অভিযোজন (arboreal adaptation) হয় তারা বৃক্ষবিহীন স্থানে বসবাস করতে পারে না। যেমন প্রাইমেট স্তন্যপায়ী। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় ইয়োসিন যুগে এই সব প্রাণীর আধিক্য ছিল। কিন্তু ইয়োসিন যুগের পরে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্য ঐ অঞ্চলে অরণ্যের ঘনত্ব কমে যায়। ফলে প্রাইমেটরা ঐ অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।

বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল আবার বৃহৎ আকৃতির প্রাণীদের বিসরণের পক্ষে বাধাস্বরূপ। যথা বৃহৎ আকৃতির এলিফাস ও মাস্টোডন হাতী প্লিসটোসিন যুগে ঘন বনাঞ্চলপূর্ণ মেক্সিকান মালভূমি পেরিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হতে পারেনি।

D. জলবায়ুসংক্রান্ত বাধা (Climatic barrier)

উষ্ণতা, আর্দ্রতা এবং শৈত্য প্রাণীদের বিসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(i) **তাপমাত্রা ঃ** শীতলশোণিত (Polikilothermal) উভচর এবং সরীসৃপেরা সাধারণত গ্রীষ্মমন্ডলে ও নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে বাস করে। অত্যধিক শীতে এরা বেঁচে থাকতে পারে না। তাই অত্যধিক শীতল স্থানে এদের দেখা যায় না, আবার শুষ্ক ও গরম মরুভূমিতে বহু প্রাণী বসবাস করতে পারে না। আর্দ্রত্বকযুক্ত প্রাণী (উভচর) উষ্ণ মরুভূমিতে বাস করতে পারে না, তবে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে

তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হেইলপ্রিণের (Heilprin, 1887) মতানুসারে তাপমাত্রার পরিবর্তন বাঘ ও হাতির ক্ষেত্রে কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ দেখা যায় যে বাঘ ভারতের উষ্ণ অঞ্চলে এবং হিমালয়ের শীতল আবহাওয়াতে সমভাবেই বিস্তার লাভ করেছে।

(ii) আর্দ্রতা (Moisture) : আর্দ্রতা প্রাণী বিসরণের প্রতিবন্ধক। আর্দ্রতাবিহীন মরু অঞ্চলে প্রাণীর বিস্তার কম। আর্দ্রত্বকবিশিষ্ট প্রাণীরা মরু অঞ্চলে বসবাস করে না। উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে আর্দ্রতা একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। আবার অত্যধিক আর্দ্রতা বা বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিভাগ স্যাঁতসেঁতে হয়ে জলাভূমির সৃষ্টি হয়। বহু প্রাণীর পক্ষে এইরকম স্থানে বসবাস করা সম্ভবপর হয় না।

(iii) আলোক (Light) : আলোক পরোক্ষভাবে প্রাণী বিসরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। উপযুক্ত আলোর অভাবে বৃক্ষ জন্মায় না। ফলে বৃক্ষবাসীর পক্ষে আলোক একটি বাধার সৃষ্টি করে। আবার নিশাচর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও আলোক একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

E. জৈবিক বাধা (Biological barrier)

(i) দৈহিক গঠন (Anatomical structure) : বিশেষ প্রকার দৈহিক গঠন প্রাণীর বিসরণে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার কিছু কিছু প্রাণীর দৈহিক গঠন তার বিসরণের পক্ষে সহায়ক হয়। যেমন-পুমা (Puma) । বিড়ালজাতীয় এই প্রাণী বৃটিশ কলম্বিয়া থেকে প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত বিস্তারলাভ করতে পেরেছে।

(ii) শারীরবৃত্তিয় (Physiological) : শারীরবৃত্তীয় চরিত্রও প্রাণীর বিসরণে বাধার সৃষ্টি করে, যেমন উভচর ও সরীসৃপ। উষ্ণ অঞ্চলে এরা যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি শীতল অঞ্চলে প্রায় দেখা যায় না। তুলনামূলকভাবে উষ্ণশোণিত প্রাণী প্রায় সর্বপ্রকার পরিবেশেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় কার্য্যকারণকে দায়ী করা যায়।

(iii) স্বভাব (Behaviour) : স্বভাব প্রাণীর বিসরণের জন্য একটি বিশেষ বাধা। যেমন মারসুপিয়াল প্রাণী। অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বভাবের এই প্রাণীগোষ্ঠী একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া অন্য কোথাও বিস্তারলাভ করেনি। দেখা গেছে যে প্রজননগত দিক থেকেও এই প্রাণীরা কম কৃতকার্য। কিন্তু প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ীর স্বভাব এবং প্রজননগত সাফল্য বেশী হওয়ায় তারা প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারলাভ করেছে।

(iv) মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় (Psychological) : মনস্তত্ত্ব প্রকারান্তরে প্রাণীর বিসরণে বাধার সৃষ্টি করে। যেমন কিছু কিছু প্রজাতির পাখীর নিজস্ব বাসস্থানের প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণ দেখা যায় (Philopatry)। স্বাভাবিকভাবেই তারা ঐ অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। আবার কিছু কিছু পরিযায়ী (migratory) পাখীদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের একটি সহজাত প্রবৃত্তি থাকে।

এছাড়াও বিশেষ বিশেষ পরিবেশ, উদ্ভিদ, খাদ্য, প্রতিযোগী, শিকারী ও পরজীবী প্রাণীর উপস্থিতিও প্রাণীদের বিসরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এক ধরণের অ্যাফিড (Aphid), এরা বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। ঐ বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদের অভাবে ঐ প্রজাতির অ্যাফিডের বিস্তার বাধা পায়। একইরকমভাবে বৃক্ষের অভাবে বৃক্ষাশ্রয়ী প্রাণী—যথা বানর, কাঠবেড়ালী বাস করতে পারে না। প্রেইরী (Prairie) তৃণ অঞ্চলে গেছো কাঠবেড়ালী দেখা যায় না। পরিবর্তে সেখানে মাটিতে বসবাসকারী কাঠবেড়ালী পাওয়া যায়।

শিকার প্রাণীর (Prey) অনুপস্থিতি শিকারী প্রাণীর (Predator) বিসরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সেটসি ফ্লাই (Tsetse fly) দ্বারা বাহিত পরজীবী ট্রাইপেনোজোমা (*Trypanosoma* sp.) আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলের আঙ্গুলেট (Ungulate) প্রাণীদের বিসরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এছাড়া সন্তানের পরিচর্যার কারণেও অনেক প্রাণীর বিসরণ বিঘ্নিত হয়। যেমন রাজহাঁস। রাজহাঁসের বাচ্চারা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হতে সময় লাগে। ফলে রাজহংসী মাতা তাদের ছেড়ে দূরে যেতে পারে না। এটি বিসরণের পক্ষে বাধাস্বরূপ। সিকলিড (Cichlid fishes) মাছেদের বাচ্চারা মায়ের মুখগহ্বরে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। তারা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হবার পরও পুরানো বাসস্থানে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে তারা অন্যত্র কোথাও পরিযান করে না (Fryer, 1959)। এ ছাড়াও স্থানু (Sedentary) প্রকৃতির প্রাণীরাও এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে যেতে পারে না।

6.2.2 বিসরণ এবং প্রাণীবিস্তারে বিসরণের প্রভাব (Dispersals and their Impact on Faunal Distribution)

ডেভিড জোর্ডান (David Jordan, 1928)-এর মতে প্রাণীর বিসরণ তিনটি নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(i) বেরিয়ার বা প্রতিবন্ধকতা (Barriers)

(ii) অভিযোজন (Adaptation) : প্রাণীরা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কোন স্থানে পৌঁছতে পারলেও সেই নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে অক্ষম হওয়ার কারণে ঐ অঞ্চলে বিস্তারলাভ করতে পারে না।

(iii) যদি নতুন পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে তাহলে অভিযোজনের কারণে ঐ প্রজাতিটির অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তনের কারণে প্রজাতিটি সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রজাতিতে পরিণত হয়।

প্রাণীদের বিসরণের কয়েকটি কারণ আছে। প্রাণীদের মধ্যে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির একটি সহজাত প্রবণতা থাকে। ঐ দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রজাতিটির মধ্যে গণসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি (population pressure) পায়। ফলে খাদ্য, বাসস্থান ও সঙ্গমসখা (mate) সন্ধান প্রভৃতির জন্য প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ফলে প্রথমে আন্তঃপ্রজাতি ও পরে বহিঃপ্রজাতি সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ফলে প্রাণীদের বিসরণ বা বিস্তার ঘটে। প্রথম প্রথম বাধাগুলির (barriers) জন্য বিসরণ হয় না। কিন্তু প্রাণীদের সহ্য করার ক্ষমতা সীমিত। যখন আন্তঃপ্রজাতি ও বহিঃপ্রজাতির মধ্যে যে সংগ্রাম দেখা যায় তা উচ্চতম সীমারেখা (Optimum limit) অতিক্রম করলেই প্রাণীর বিসরণ ঘটে। ভূপৃষ্ঠে প্রাণীর বিসরণ লিবিগের 'ল অব মিনিমাম' (Liebig's law of minimum) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সূত্রটি হল 'ভূপৃষ্ঠে প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তার পরিবেশের প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টরের (Factor) ন্যূনকল্প পরিমাণের উপস্থিতির প্রভাবে সীমিত হয়।' যখনই এর সীমা অতিক্রম করে তখনই বিসরণ ঘটে।

গণসংখ্যার চাপই (Population pressure) প্রাণী বিসরণের প্রধান কারণ। এই চাপের ফলেই প্রাণীরা বিভিন্ন পরিবেশে বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীর দেহে পরিব্যক্তি (Mutation) ঘটে। এর ফলে উপযুক্ত অঙ্গসংস্থানগত ও শারীরবৃত্তীয় এবং ব্যবহারগত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

আবার অনেক সময় পরিবেশের জৈবিক (Biotic) এবং অজৈবিক (Abiotic) অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ফলে ঐ অঞ্চলে নতুন নতুন প্রাণীদের ছড়িয়ে পড়ার ও বসবাসের যোগ্য স্থান হয়ে ওঠে। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়াতে অরণ্য অঞ্চল কেটে ফেলা এবং সেই স্থানে চাষ-আবাদের প্রবর্তন করার ফলে ঐ অঞ্চলে বহু ঝোপঝাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ঐ অঞ্চলে বসবাসের উপযোগী অনেক নতুন ধরনের পাখীর আগমন ঘটেছে। যেমন গায়ক চড়ুই (Song sparrow), গৃহ রেন (House wren), ওয়ার্বলার (Chestnut warbler), বিশেষ প্রজাতির লার্ক (Lark) পাখী ইত্যাদি।

অপর পক্ষে কোন অঞ্চলের পরিবেশে প্রতিকূল পরিবর্তন হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, ফলে খাদ্যের ঘাটতি, প্রাণীদের পক্ষে উপযোগী উদ্ভিদ এবং আবহাওয়ার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ফলে ঐ অঞ্চলের প্রাণীরা নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। যেমন আর্কটিক তুন্দ্রার (Arctic tundra) তুষার পেঁচা। এরা খাদ্যের জন্য লেমিং (Lemming) ও ইঁদুরের উপর নির্ভরশীল। লেমিং এর চক্রাকার (Cyclic) সংখ্যা হ্রাসের ফলেই পেঁচারা ঐ অঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

বিসরণ দুই প্রকারের (Means of dispersal) হয়। (A) স্বাভাবিক বিসরণ ও (B) কৃত্রিম বিসরণ।

(A) স্বাভাবিক বিসরণ (Natural dispersal) আবার দুই প্রকারের— (i) সক্রিয় (Active) ও (ii) নিষ্ক্রিয় (Passive)।

(i) সক্রিয় (Active) : প্রাণীরা স্বাভাবিক নিয়মেই বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ ও বসতি খুঁজে বের করে। একই প্রকার পরিবেশে প্রাণীরা স্বীয় বাসভূমি থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আদি বাসভূমিতে জনসংখ্যার চাপ যত বৃদ্ধি পায় তত দ্রুত দূরবর্তী অঞ্চলে বিসরণ (Dispersal) ঘটে। বিসরণের সহজ ও সাধারণ উপায় হল সন্তান-সন্ততিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপ্ত করে দেওয়া (Broadcasting)। এইভাবে সন্তানেরা মাতাপিতার থেকে আলাদা হয়ে দূরবর্তী প্রদেশে চলে যায়। সেখানে অনুকূল পরিবেশ পেলে পাকাপাকিভাবে বাস করতে শুরু করে। আর পরিবেশ প্রতিকূল হলে আরও দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন বৃটেনের লাল রঙের শ্রাইক (*Lanius Colluris*)। এরা বৃটেন থেকে বিসরিত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে। আমেরিকার আর্মাদিলো (*Dasypus* sp.) দক্ষিণ টেক্সাসের সীমাবদ্ধ বাসস্থান থেকে ক্রমশ ওক্লাহামা থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত বিসরিত হয়েছে।

(ii) নিষ্ক্রিয় (Passive) : অনেক সময় বায়ুপ্রবাহ বা জলস্রোত বা অন্যান্য মাধ্যম প্রাণীদের ডিম, স্পোর **(Spores)** ইত্যাদি বিশেষ দিকে বহন করে নিয়ে যায়। জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে জলজ পতঙ্গ, শামুক, মাছ প্রভৃতির ডিমগুলি স্রোতে বাহিত হওয়ার সময় ভেসে থাকার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। এরা বিভিন্ন ভাসমান বস্তুর উপর আটকে থাকে। যেমন কাঠের গুঁড়ি, উদ্ভিদ ইত্যাদি।

বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে শুধুমাত্র ডিম বা স্পোরই নয় কখনো কখনো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীও (স্থলবাসী মাকড়সা, শস্যের পোকা) জোরালো বাতাসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হতে পারে। প্রবল ঝড় (Hurricane) এবং ঘূর্ণিবাত্যার (Tornado) ফলে বাহিত জলজ প্রাণী এবং মৎস্যবৃষ্টি হতেও দেখা যায়।

অন্যান্য প্রাণীও নিষ্ক্রিয় বহনে ভূমিকা গ্রহণ করে। উদ্ভিদের কিছু অংশ, কৃমির ডিম, অথবা পূর্ণাঙ্গ প্রাণী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ, মৎস্য, জলজ প্রাণীর পায়ে অথবা পাখীর পালকে আটকে যায়।

এইভাবে এরা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণী ও স্থানীয় পাখীরাও এইসব ক্ষুদ্রাকার প্রাণীদের বিসরণে সাহায্য করে।

(B) কৃত্রিম বিসরণ (Artificial dispersal) : বর্তমান যুগে মানুষ কৃত্রিম বিসরণে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো বা অজান্তে প্রাণীর বিসরণ ঘটাচ্ছে। নিউজিল্যান্ডে হরিণ ও ট্রাউট মাছ (Trout fish) ওয়েষ্ট ইন্ডিজে বেজী এবং অষ্ট্রেলিয়ায় খরগোস বিস্তারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে।

অনুশীলনী—1

1. ভৌত বাধার দুটি উদাহরণ দিন।
2. জৈবিক বাধার দুটি উদাহরণ দিন।
3. প্রাণী বিসরণের প্রধান কারণ কি?
4. কৃত্রিমভাবে বিসরণ ঘটেছে এরকম দুটি প্রাণীর উদাহরণ দিন।
5. নিষ্ক্রিয়ভাবে বিসরণ ঘটে এরকম দুটি প্রাণীর উদাহরণ দিন।

6.3 সারাংশ

স্বীয় বাসভূমি ছেড়ে প্রাণীগোষ্ঠীর স্থায়ীভাবে স্থানান্তরে গমনকেই বিসরণ বা বিস্তার (Dispersal) বলে। ভূপৃষ্ঠে প্রাণীর বিসরণ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। প্রাকৃতিক কারণেই প্রধানতঃ প্রাণীর বিস্তার ঘটে। এই বিস্তারের গতিপ্রকৃতিও অত্যন্ত মন্থর। বংশপরম্পরায় তারা স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করতে করতে কালক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করে। গণসংখ্যার চাপ, বাসস্থানের অভাব এবং খাদ্যের অভাবেই প্রাণীরা দূরদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও কৃত্রিম পদ্ধতিতেও প্রাণীদের বিসরণ ঘটে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে মানুষই একমাত্র প্রাণীর বিসরণ ঘটায়।

কিন্তু এই বিসরণের পথে বিভিন্ন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা (Barriers) অতিক্রম করতে হয়। কোথাও কোথাও প্রাণীগোষ্ঠী বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় আবার কোথাও কোথাও পারে না। ঐ সব বাধা যা প্রাণীর বিস্তারের প্রতিবন্ধকতাকেই বেরিয়ার (Barrier) বলে। এই এককে সেইসব বেরিয়ার, বিসরণ ও বিসরণের পথসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

6.4 প্রশ্নাবলী

1. বেরিয়ার কাকে বলে? প্রাণীবিস্তারে ভৌত বাধাগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন। **2.** বিসরণ কাকে বলে? প্রাণীগোষ্ঠীতে বিসরণের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন। **3.** টীকা লিখুন ঃ (a) এডাফিক বাধা (Edaphic barrier) (b) জলের লবণাক্ততা কিভাবে প্রাণীর বিসরণে বাধার সৃষ্টি করে? (c) অ্যানাড্রোমাস ও ক্যাটাড্রোমাস পরিযান কী? (d) তাপমাত্রা কিভাবে উভচরের বিসরণ নিয়ন্ত্রণ করে?

6.5 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

1. পর্বতমালা, জলের লবণাক্ততা। **2.** শারীরবৃত্তিয়, মনস্তত্ব সম্বন্ধীয়। **3.** গণসংখ্যার চাপ। **4.** 6.3.2 (B) দেখুন। **5.** 6.3.2 (A) (ii) দেখুন।

প্রশ্নাবলী ঃ

1. 6.2 এবং 6.3.1 অংশ দেখুন। **2.** 6.2 এবং 6.3.2 অনুচ্ছেদ দেখুন। **3.** (a) 6.3.1 (B) অংশ দেখুন। (b) 6.3.1 (A) (iii) অংশ দেখুন। (c) 6.3.1 (A) (ii) অংশ দেখুন। (d) 6.3.1 (D) (i) অংশ দেখুন।

একক 7 ❑ মহাদেশীয় সঞ্চালন পদ্ধতি এবং প্রাণীবিস্তারে এর ভূমিকা (Continental Drift Mechanism and its Impact on Faunal Distribution)

গঠন

7.0 প্রস্তাবনা

7.1 উদ্দেশ্য

7.2 ভূত্বকের সৃষ্টি

7.3 মহাদেশীয় সঞ্চালন

7.3.1 মহাদেশীয় সঞ্চালন তত্ত্ব (Plate Tectonic Hypothesis)

7.3.2 মহাদেশীয় সঞ্চালনের কারণ

7.3.3 মহাদেশীয় সঞ্চালনের ইতিহাস

7.4 প্রাণীর বিস্তারে মহাদেশীয় সঞ্চালনের ভূমিকা

7.5 সারাংশ

7.6 প্রশ্নাবলী

7.7 উত্তরমালা

7.0 প্রস্তাবনা

প্রাণীদের বিস্তারণের ঘটনা আমরা আগের এককে আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা প্রাণীদের বিস্তারণের পথসমূহকে নিয়ে আলোচনা করবো। প্রাণীগোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে কিভাবে বিসরিত হয় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি বিতর্কমূলক প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। এই বিশেষ বিতর্কিত প্রসঙ্গই হল মহাদেশীয় সঞ্চালন তত্ত্ব। বিজ্ঞানীদের ধারণা বহুকাল পূর্বে পৃথিবী একটি সম্মিলিত ভূখন্ড ছিল। পরে বিভিন্ন কারণে সেই ভূখণ্ড খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একেই মহাদেশীয় সঞ্চালন মতবাদ বা মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব বলে (Continental Drift Theory) এই এককে এই ঘটনা এবং তার প্রভাবে প্রাণীদের বিস্তারণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হবে।

7.1 উদ্দেশ্য

- এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এই মহাদেশগুলির সঞ্চালনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে পারবেন।
- প্রাণীর বিসরণে মহাদেশীয় সঞ্চালন তত্ত্বের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- একটি মহাদেশের সঙ্গে অন্য মহাদেশ কোন্ কোন্ সেতুদ্বারা যুক্ত তা বলতে পারবেন।

7.2 ভূত্বকের সৃষ্টি

অনুমান করা হয় যে এখন থেকে প্রায় 400 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর জন্ম হয়। 1925 সালে জীনস্ (Jeans) ও জেফ্রিস (Jeffreis) একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁদের মত অনুযায়ী অতি পুরাকালে উপযুক্ত আকারের একটি বিরাট নক্ষত্র মহাশূন্যে বিচরণকালে সূর্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। এর প্রচন্ড আকর্ষণে সূর্য থেকে মাকুর আকারের একটি গ্যাসীয় পিন্ড ছিটকে পড়ে। এই পিন্ড থেকেই সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহানুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে জন্মকালে পৃথিবী একটি জলন্ত অগ্নিপিন্ড ছিল। পরে তাপ বিকীরণ করতে করতে ক্রমশ পৃথিবী একটি তরল পিন্ডে পরিণত হয়। ঐ সময় পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘনত্বের পদার্থের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে ভারী পদার্থগুলি (যেমন লোহা) ক্রমগাত পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে থিতিয়ে পড়ে এবং কম ঘনত্বের পদার্থ (যেমন অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি) পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে ভেসে উঠতে থাকে। বহু লক্ষ বৎসর ধরে এই প্রক্রিয়া চলে এবং পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠের দিকে ভারী থেকে হাল্কা পদার্থের স্তর তৈরী হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ঘনত্ব স্তরীকরণ** (Density statification) । স্তরীকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পৃথিবীপৃষ্ঠের পাতলা স্তর দ্রুত তাপ বিকীরণ করতে করতে শীতল এবং কঠিন হয়ে পড়ে। এইভাবে ভূত্বকের সৃষ্টি হয়।

রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে ভূত্বককে আবারদুভাগে ভাগ করা হয়। ভূত্বকের নিম্নভাগের মূল উপাদান হল সিলিকন (Silicon) ও ম্যাগনেশিয়াম (Magnesium)। ইংরেজী নামের আদ্য অক্ষরগুলি যুক্ত করে এই স্তরকে সিমা (Sima) বলা হয়। সমুদ্র তলদেশে এই সিমা দেখতে পাওয়া যায়। ভূত্বকের উপরিভাগের মূল উপাদান হল সিলিকন (Silicon) ও অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)। সিলিকনের সি (si) অ্যালুমিনিয়ামের অ্যাল (al) যুক্ত করে এই স্তরকে বলা হয় সিয়্যাল (Sial)। পৃথিবীর স্থলভাগ এই সিয়্যাল দ্বারা গঠিত।

ভূত্বকের ঠিক নীচেই থাকে ঘন অর্ধকঠিন অর্ধতরল একটি সান্দ্র স্তর। এখানে ঘন তরল শিলার (magma) সাথে মিশে থাকে কঠিন হয়ে যাওয়া পাথরের টুকরো। এই স্তরটির নাম অ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere)। এটি প্রায় 200 থেকে 400 কিলোমিটার গভীর। অগ্ন্যুৎপাতের সময় এই স্তরটিই গলিত লাভা হিসাবে বের হয়ে আসে। ভূত্বক এবং এই অ্যাসথেনোস্ফিয়ারকে একসাথে বলে শিলামন্ডল (Lithosphere)। আমাদের বর্তমান আলোচনা এই শিলামন্ডলকে নিয়েই।

অনুশীলনী—1

1. সংক্ষেপে উত্তর লিখুন ঃ

(a) ঘনত্ব স্তরীকরণ বলতে কি বোঝায়?

(b) Sima ও Sial কি?

2. দক্ষিণ ও বাম স্তম্ভের বক্তব্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করুন ঃ

A	B
(a) 460 কোটি বছর।	(i) অ্যাসথেনোস্ফিয়ার
(b) ম্যাগনেশিয়াম	(ii) ভূত্বক
(c) ম্যাগমা	(iii) পৃথিবীর বয়স
(d) সিলিকন	(iv) লিথোস্ফিয়ার
(e) শিলামন্ডল	(v) পৃথিবীপৃষ্ঠ

7.3 মহাদেশীয় সঞ্চালন

7.3.1 মহাদেশীয় সঞ্চালন তত্ত্ব (Plate Tectonic Hypothesis)

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে যদি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন মহাদেশগুলিকে একটির সাথে অপরটিকে যেন নিখুঁতভাবে জুড়ে দেওয়া যায়। তাদের মধ্যবর্তী সীমানা বরাবর কোন ফাঁক থাকে না। অর্থাৎ একটি মহাদেশের পরিসীমা অন্য একটি বা একাধিক মহাদেশের পরিসীমার সাথে একেবারে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই ঘটনাটি প্রথম প্রত্যক্ষ করেন ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon)। 1795 সালে বিখ্যাত জার্মান প্রকৃতিবিদ্ আলেকজাণ্ডার ভন্ হামবোল্ট (Alexandar von Humbolt) বলেন যে বিভিন্ন মহাদেশের সীমানাগুলির এত নিখুঁতভাবে মিলে যাওয়ার ঘটনা কখনই নিতান্ত আকস্মিক হতে পারে না। এইসব মহাদেশগুলিকে যদি তাদের মিলনযোগ্য সীমানা বরাবর মিলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তা একটি অতিমহাদেশের (Supercontinent) সৃষ্টি করে। তাহলে এমন মনে করা অমূলক নয় যে অতীতে সমস্ত মহাদেশগুলি একসাথে একটি অতিমহাদেশ (Supercontinent) হিসাবে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে একটির থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আল্‌ফ্রেড বেগেনারও (Alfred Wegener) এইরকম মনে করতেন। 1912 সালে এই ধারণার ভিত্তিতেই তিনি তাঁর মহাদেশীয় সঞ্চালন তত্ত্ব (Continental Drift Theory) প্রকাশ করেন। অতীতের এই অখণ্ড অতিমহাদেশের তিনি নামকরণ করেন প্যান্‌জিয়া (Pangaea), তিনি এও বলেন যে মেসোজোয়িক সময়ে এই অতিমহাদেশে ভাঙ্গন ধরে ও ভেঙ্গে যাওয়া টুকরোগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যেতে যেতে তাঁদের বর্তমান অবস্থানে আসে।

7.3.2 মহাদেশীয় সঞ্চালনের কারণ

মহাদেশীয় সঞ্চালন তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক চলাকালীন মহাদেশীয় সঞ্চালনের কারণ হিসাবে এক নূতন ধারণার জন্ম হয়। অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে ভূগর্ভে শিলামণ্ডলের নিম্নস্থ ম্যান্টল (Mantle) স্তরে তাপ ও চাপ এমন যে শিলাসমূহ সেখানে নরম প্লাষ্টিকের মত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত তাপ ও চাপে এই স্তরে তাপীয় পরিচলন (Thermal Convection) প্রক্রিয়া চলা অসম্ভব হয়। ব্যাপারটা অনেকটা একপাত্র জল গরম করার মত। পাত্রের তলদেশের জল তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয় এবং হাল্কা হয়ে পড়ে পাত্রের মধ্যাঞ্চল দিয়ে ওপরে ভেসে ওঠে। উপরের শীতল ও ভারী জল তখন পাত্রের গা বরাবর নীচে নেমে যায়। এইভাবে একটি চক্রাকার পরিচলন চলতে থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরেও যত গভীরে যাওয়া যায় তাপমাত্রা তত বাড়তে থাকে। ফলে ম্যান্টলের তলদেশের অতি উত্তপ্ত শিলা হাল্কা হয়ে উপরে উঠে আসে ও উপরের ভারী শিলা অন্য একটি পথ ধরে নীচে নামতে থাকে। এইভাবে ঘনত্বের পার্থক্যহেতু বেশ কয়েকটি পরিচলন চক্র (convection cell) এর সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদ্ আর্থার হোমস (Arthur Holmes) প্রথম এই পদ্ধতির বর্ণনা দেন। 1928 সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি বলেন যে মহাদেশগুলি কম ঘনত্বের শিলায় তৈরী এবং এগুলি প্লাষ্টিক ম্যান্টলে ভেলার মত ভেসে থাকে। ঐ পরিচলন চক্রের ফলে মহাদেশগুলিও সঞ্চালিত হয়।

পৃথিবীর শিলামন্ডল ছোট বড় নানা আকারের অনেকগুলি প্লেটের সমন্বয়ে তৈরী। আকার অনুযায়ী এই প্লেটগুলিকে তিনরকম ভাগে ভাগ করা যায়। বড় বা মুখ্য প্লেট (Major Plate); মাঝারী প্লেট (Medium Plate) ও ছোট প্লেট (Small Plate)। বর্তমানে 7টি মুখ্য প্লেট, 6টি মাঝারি প্লেট ও 20 টি ছোট মাপের প্লেটের অস্তিত্ব আছে। মুখ্য প্লেটগুলি হল—(i) ইউরেশিয়া (ii) অ্যান্টার্কটিকা (iii) উত্তর আমেরিকা (iv) দক্ষিণ আমেরিকা (v) প্রশান্ত (vi) আফ্রিকা (vii) অস্ট্রেলিয়া। মাঝারী প্লেটগুলি হল— (i) ফিলিপাইন (ii) স্কোশিয়া (iii) নাসকা (iv) কোকো (v) ক্যারিবীয় (vi) আরবীয়। এইসব প্লেটগুলিতে ক্রমাগত ভূগাঠনিক বলের প্রভাবে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই সব অঞ্চলের সীমানা বরাবর সাধারণতঃ তিনটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

1. দুটি প্লেটের মধ্যবর্তী সীমানায় শৈলশিরার ফাটলগুলি থেকে নূতন ভূত্বক সৃষ্টি হয়। তার ফলে প্লেটগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় (প্রতি বৎসর 1 cm করে)।
2. দুটি প্লেট একে অন্যের গা ঘেঁসে আড়াআড়িভাবে সরে যায়। যে চ্যুতি বরাবর এই ঘটনা ঘটে তার নাম Transfer fault.
3. মহাদেশীয় ভূত্বক সাধারণতঃ কম ঘনত্বের গ্র্যানাইট জাতীয়শিলায় তৈরী এবং মহাসাগরীয় ভূত্বক অধিক ঘনত্বের ব্যাসল্ট জাতীয় শিলায় তৈরী। ফলে দুটি সঞ্চরমান প্লেট পরস্পর মুখোমুখি ধাক্কা খেলে বেশী ঘনত্বের মহাসামুদ্রিক ভূত্বক ভূগর্ভের গভীরে প্রবেশ করে ও খাতে সৃষ্টি করে। কিন্তু হাল্কা মহাদেশীয় ভূত্বক বেশী নীচে নামতে পারে না। যদি দুটি মহাদেশীয় প্লেটের মধ্যে ধাক্কা হয় তখন একটি অপরটির তলায় ঢুকে ভূত্বককে পুরু করে তোলে এবং সেখানে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। আমাদের হিমালয় পর্বত এইভাবে ভারতীয় ও তিব্বতীয় প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্টি।

7.3.3 মহাদেশীয় সঞ্চালনের ইতিহাস

অনুমান করা হয় এখন থেকে প্রায় 22.5 কোটি বৎসর পূর্বে নিম্ন মেসোজোয়িক (ট্রায়াসিক) যুগে বর্তমানের সমস্ত মহাদেশগুলি একত্রিত ছিল এবং একটি অতিমহাদেশ (Supercontinent) হিসেবে বর্তমান ছিল। এই অতিমহাদেশের নাম ছিল প্যান্‌জিয়া (Pangaea)। (চিত্র নং 7.1)। প্যানজিয়া প্রোটো প্যাসিফিক সমুদ্র প্যান্থালাসা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

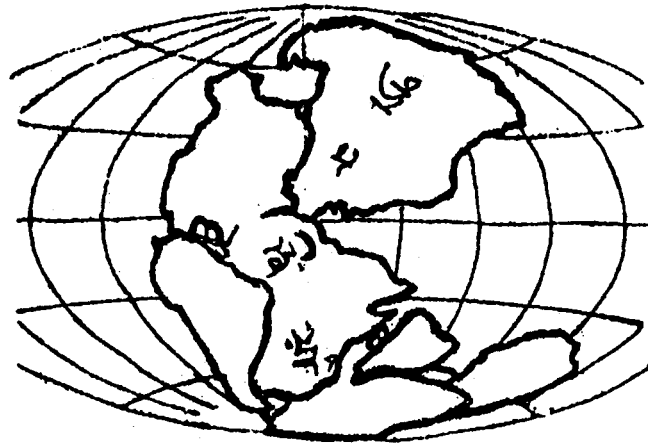

চিত্র নং 7·1 : 22·5 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর মহাদেশগুলির অবস্থান

পরে প্রায় 18 কোটি বৎসর পূর্বে মধ্য মেসোজোয়িক (Jurassic) সময়ে প্যানজিয়ায় ভাঙ্গন ধরে এবং এটি দুটি প্রধান ভূখণ্ডে খণ্ডিত হয়। উত্তরের ভূখণ্ডকে বলা হয় লরেসিয়া (Lauresia) এবং দক্ষিণের ভূখণ্ডটিকে বলা হয় গণ্ডোয়ানা (Gondwana)। মধ্যে যে সমুদ্র অঞ্চল ছিল তাকে বলা হত টেথিস সমুদ্র (Tethys Sea)। বর্তমানের উত্তর আমেরিকা, ইউরেশিয়া ও গ্রীনল্যাণ্ড ছিল লরেশিয়ার অংশ। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকা ছিল গণ্ডোয়ানার অংশ। এই সময় গণ্ডোয়ানাতেও একটি ভাঙ্গন ধরে যার ফলে অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা এই দুটি মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। (চিত্র নং 7.2)।

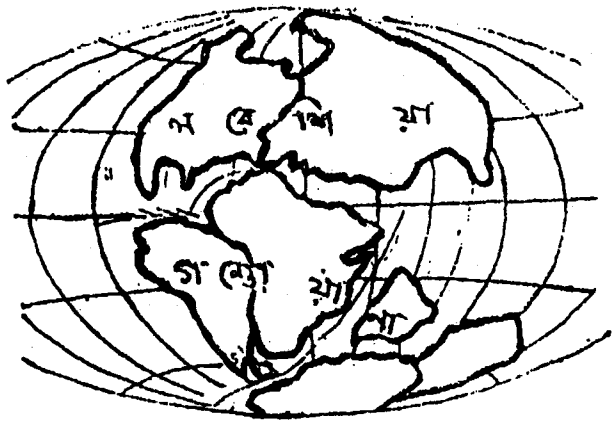

চিত্র নং 7·2 : 18 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর মহাদেশগুলির অবস্থান

তারপর প্রায় 13.5 কোটি বৎসর পূর্বে উর্ধ মেসোজোয়িক (ক্রিটেশাস) যুগে গণ্ডোয়ানার অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমাগত পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে দিকে সরে যেতে থাকে। মাদাগাস্কার দ্বীপের সাথে আফ্রিকার ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যেও ভাঙ্গন ধরে। লরেশিয়ার দক্ষিণ অংশেও সামান্য ফাটল দেখা যায়। (চিত্র নং 7.3)।

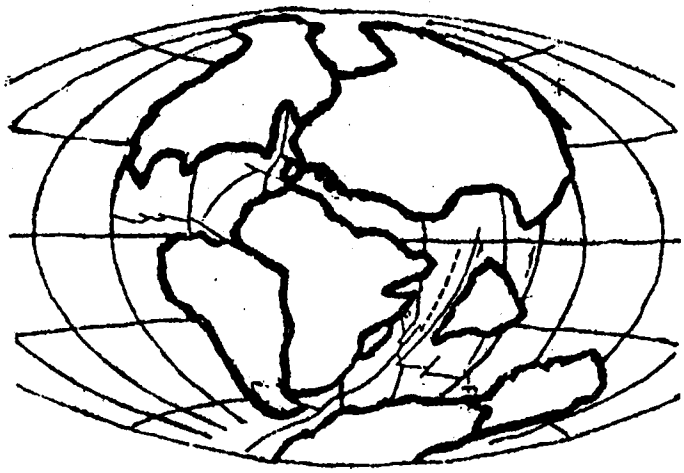

চিত্র নং 7·3 : 13·5 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর মহাদেশগুলির অবস্থান

এরপর প্রায় 6.5 কোটি বৎসর পূর্বে নিম্ন টারশিয়ারী (পেলিওসিন) যুগে দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমে সরে যায়। মাদাগাস্কার দ্বীপ আফ্রিকা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আফ্রিকাও সামান্য উত্তরমুখী হয় যার ফলে আফ্রিকা ও ইউরোপের দূরত্ব হ্রাস পায়। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশ অ্যান্টার্কটিকার খুব কাছে পৌঁছে যায়। লরেশিয়ার দক্ষিণাংশের ভাঙ্গন বৃদ্ধি পায়। (চিত্র নং 7.4)।

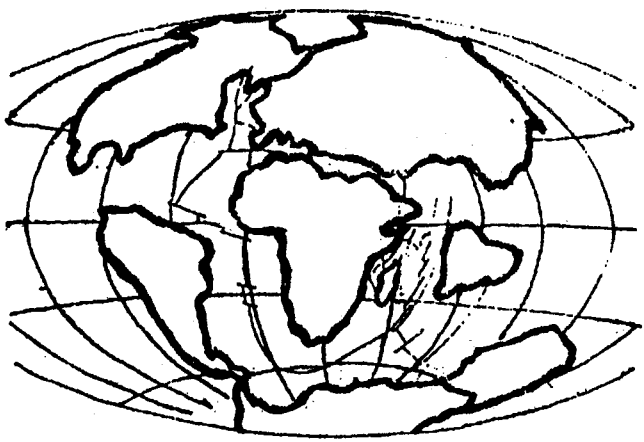

চিত্র নং 7·4 : 6·5 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর মহাদেশগুলির অবস্থান

সবশেষে অ্যান্টার্কটিকা আরও দক্ষিণে সরে গিয়ে দক্ষিণ মেরুতে অবস্থান নেয়। অস্ট্রেলিয়া আরও পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব দিকে সরে যায়। দক্ষিণ আমেরিকা চলে যায় আরও পশ্চিমে। দক্ষিণ আমেরিকার সাথে আন্টার্কটিকার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। আফ্রিকা আরও উত্তরে সরে গিয়ে ইউরেশিয়ার সাথে যুক্ত হয়। ফলে মাদাগাস্কার ও আফ্রিকার দূরত্বও বাড়ে। উত্তরে উত্তর আমেরিকা ও গ্রীনল্যান্ড ইউরেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। উত্তর আমেরিকা আরও পশ্চিমে সরে এসে দক্ষিণ আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়। এই সময় ইউরেশিয়া থেকে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার দ্বীপগুলিও বিচ্ছিন্ন হয়। এইভাবেই মহাদেশগুলি তাদের বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছায়। (চিত্র নং 7.5)।

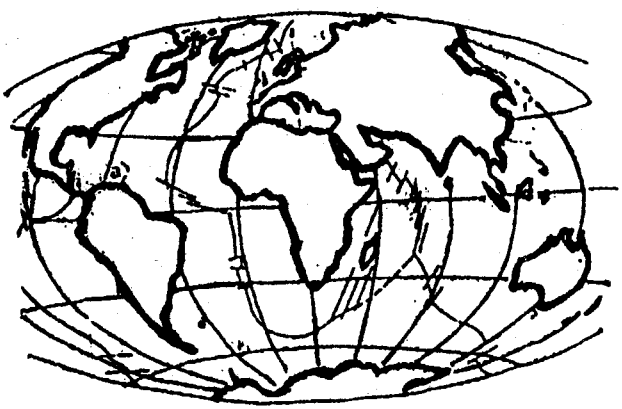

চিত্র নং 7·5 : বর্তমানে পৃথিবীর মহাদেশগুলির অবস্থান

অনুশীলনী—2

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. অতীতে সমস্ত মহাদেশগুলি একটি —— ছিল।

2. ম্যান্টল স্তরে শিলাসমূহ —— অবস্থায় থাকে।

3. —— বরাবর দুটি প্লেট আড়াআড়িভাবে সরে যায়।

4. উত্তর এবং দক্ষিণ ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সমুদ্র হল ——।

7.4 প্রাণীর বিস্তারে মহাদেশীয় সঞ্চালনের ভূমিকা

মহাদেশীয় সঞ্চালনের সময় প্রাণীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নিম্ন টার্শারী যুগে অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সমাবেশ দেখা যায়, প্লায়োসিন যুগে আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী মনোট্রিম ও মারসুপিয়ালরা অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। কিন্তু তখনো অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী অর্থাৎ মনোট্রিম ও মারসুপিয়ালদের প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় এখনো ঐ সব প্রাণী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র কিছুকাল আগেও বাদুড় ছাড়া অন্য কোন অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। তুলনায় দক্ষিণ আমেরিকায় উন্নত অমরাযুক্ত প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। মধ্য টার্শারী যুগ পর্যন্ত এখানে মারসুপিয়াল ছাড়াও অন্য আদিম অমরাযুক্ত প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল যেমন আর্মাডিল্লো (Armadillo), পিপীলিকাভুক (Anteater), বৃক্ষবাসী স্লথ (Tree Sloth) ইত্যাদি। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা যখন গণ্ডোয়ানার অংশ ছিল তখনই প্রাচীন স্তন্যপায়ীরা অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করেছিল। পরবর্ত্তীকালে অষ্ট্রেলিয়া গণ্ডোয়ানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণ-পূর্বদিকে সরে যায়। অনুমান করা হয় যে ক্রিটেশাস যুগের শেষপর্বে এবং টারশিয়ারী যুগে ইউথেরিয়ান স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব এবং উন্নতি ঘটে। সেই সময় অষ্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় ইউথেরিয়ান স্তন্যপায়ীরা অষ্ট্রেলিয়াতে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই ওখানকার মনোট্রিম ও মারসুপিয়ালদেরও ইউথেরিয়ানদের সঙ্গে অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত হয়নি। ফলে তারা প্রাচীন চরিত্রযুক্তই থেকে গেছে। যেহেতু দক্ষিণ আমেরিকা তখনও মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই সেখানে ইউথেরিয়ান ও মেটাথেরিয়ান স্তন্যপায়ীরা প্রোটোথেরিয়ান স্তন্যপায়ীদের সরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যায়। ফলে দক্ষিণ আমেরিকায় মেটাথেরিয়ান স্তন্যপায়ীদের বিবর্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নিজস্ব ধারায় ঘটে এবং তাদের মধ্যে আদিম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এই সময় লরেশিয়ায় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রচুর বিবর্তন ঘটে। ফলে সেখানে বহু উন্নত ধরণের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আবির্ভাব হয়। পরবর্তীকালে মহাদেশীয় সঞ্চালনের ফলে উত্তর আমেরিকা লরেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তা পানামা যোজকের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই ঘটনা ঘটে প্লিস্টসিন যুগে। এই সময় উত্তর আমেরিকার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে উন্নত মেটাথেরিয়ান স্তন্যপায়ীরা দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে। দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাচীন স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে উন্নত স্তন্যপায়ীদের সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংগ্রামে প্রচুর প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্লায়োসিন এবং

প্লিস্টোসিন যুগে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচুর প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জীবাশ্ম এই ঘটনার প্রমাণ। কিছু কিছু প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীত দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকা প্রবেশ করতে পারে। যেমন ওপোসাম (Opossum)। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় কোন ইউথেরিয়ান স্তন্যপায়ীদের জীবাশ্ম পাওয়া যায় না। কারণ অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে অন্য কোন মহাদেশের পরবর্তীকালে সংযোগ স্থাপন হয়নি। এই ঘটনাই মহাদেশীয় সঞ্চালন তত্ত্বের স্বপক্ষে একটি বড় প্রমাণ। মহাদেশীয় সঞ্চালন এইভাবেই প্রাণীদের বিস্তারকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

এছাড়া বিভিন্ন স্থলসেতুও বিভিন্ন মহাদেশে প্রাণীর বিস্তারকে প্রভাবিত করেছে। এই স্থলসেতুগুলিও মহাদেশীয় সঞ্চালন তত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্তি দেখায়। প্রায় 60 থেকে 100 কোটি বৎসরকাল যাবৎ মহাদেশগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। কিন্তু বর্তমানের এই বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলি অবশ্যই এককালে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিছু কিছু স্থলসেতুদ্বারা বর্তমান মহাদেশগুলি এখনও সংযোজিত। এইরকম স্থলসেতুর উদাহরণ হল পানামা যোজক (Isthmus of Panama)। এটি উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত। অতীতে এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে বেরিং প্রণালী (Bering Strait) ও বেরিং সমুদ্রের মধ্যেও একটি স্থলসেতু ছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এর কোন অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞানীদের মতে এই স্থলসেতুগুলি সাময়িকভাবে একটি মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে প্রাণীর বিস্তারে অংশগ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞানী সিম্পসন (Simpson, 1940) এই স্থলসেতুগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন।

1. করিডোর (Corridor)
2. ফিল্টার ব্রীজ (Filter bridge)
3. সুইপষ্টেকস পথ (Sweepstakes route)

1. **করিডোর ঃ** দুটি দেশের মধ্যে যে প্রশস্ত স্থলসেতু দেখা যায় তাকে করিডোর বলে। টারশিয়ারী যুগের পূর্বে এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে বেরিং প্রণালী ছিল। বেরিং সমুদ্রের মধ্য দিয়ে একটি স্থলসেতু ঐ দুটি দেশকে যুক্ত করে রেখেছিল। এই সেতুর মাধ্যমে ঐ দুই দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিনিময় ঘটেছিল। এক ধরনের কুমির অ্যালিগেটর (Alligator) এই দুটি অঞ্চলেই পাওয়া যায়। আবার ট্রাইটুরাস (Triturus) ও ক্রিপ্টোব্রঙ্কাস (Cryptobronchus) নামক উভচর প্রাণী ঐ দুটি অঞ্চলেই দেখা যায়। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে ঐ দুই অঞ্চলের মধ্যে স্থলসেতুর মাধ্যমে ঐ সব প্রাণীরা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ভূতাত্ত্বিক কারণেই ঐ সেতুটির বেশীর ভাগ অঞ্চল জলমধ্যে নিমজ্জিত হয়। শুধুমাত্র বেরিং প্রণালীর দ্বীপগুলিই বর্তমানে এই স্থলসেতুটির অস্তিত্ব বহন করছে।
   এইভাবে ইউরেশিয়ান করিডোর আজও ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। এই করিডোরের মাধ্যমে ঐ দুই মহাদেশের প্রাণীদের আদান-প্রদান ঘটে।

2. **ফিল্টার ব্রীজ** (Filter Bridge) **ঃ** যখন স্থলসেতুটি সরু এবং অপ্রশস্ত হয় তখন তাকে ফিল্টার ব্রীজ বলে। এই সেতুর মাধ্যমে কেবলমাত্র বিশেষ অভিযোজনসপন্ন প্রাণীরাই বিস্তারলাভ করতে পারে। বেরিং প্রণালীর সেতুটিও প্লিষ্টোসিন যুগে ফিল্টার ব্রীজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

প্লিষ্টোসিন যুগে পৃথিবী বরফাবৃত হয়ে পড়ে। যেসব প্রাণীর এই ঠাণ্ডার মধ্যে অভিযোজনে সক্ষম হয়েছিল কেবলমাত্র তারাই এই ব্রীজ অতিক্রম করতে পেরেছিল। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ভল্লুক, বিড়াল, বাইসন, হরিণ, ম্যামথ প্রভৃতি প্রাণীরা এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল। আবার কুকুর, ঘোড়া, উট প্রভৃতি স্তন্যপায়ীরা আমেরিকা থেকে এশিয়ায় প্রবেশ করতে পেরেছিল।

উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যেও একটি ফিল্টার ব্রীজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ক্রিটেশাস ও পেলিওসিন যুগে যে সব আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ঐ ব্রীজ অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল বিভিন্ন প্রকারে মারসুপিয়াল তাদের অন্যতম। পেলিওসিন যুগের শেষে ঐ স্থলসেতুটি সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হয়ে যায়। প্লিষ্টোসিন যুগে আবার ঐ স্থলসেতুটি পুনরায় আবির্ভূত হয়। ঐ পথে হরিণ, উট, টাপির ঘোড়া, বিড়াল, মাষ্টোডন উত্তর আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল। বিপরীতভাবে সজারু, আর্মাডিল্লো, স্লথ প্রভৃতি স্তন্যপায়ীরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করতে পেরেছিল।

অনুমান করা হয় যে এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যেও একটি ফিল্টার ব্রীজ ছিল। মালয় উপদ্বীপ থেকে বিস্তৃত মালয় দ্বীপপুঞ্জ এই ব্রীজের অস্তিত্ব বহন করে। মেসোজোয়িক যুগে যখন আদিম স্তন্যপায়ীদের উদ্ভব হয়েছিল তখন ঐ পথেই তারা অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করে। এইসব প্রাণীদের মধ্যে মনোট্রিম ও মারসুপিয়াল উল্লেখযোগ্য। পরে এই ফিল্টার ব্রীজটি জলমগ্ন হওয়ায় এশিয়ায় উদ্ভূত উন্নত স্তন্যপায়ীরা অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে পারেনি।

3. **সুইপষ্টেকের পথ ঃ** এটি কোন নির্দিষ্ট স্থলসেতু নয়। কাঠের গুড়ি, ভাসমান বৃক্ষ ইত্যাদি অনেক সময়ে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের বীজ, ক্ষুদ্র প্রাণী ইত্যাদিকে এক দেশ থেকে বহন করে অন্য মহাদেশে নিয়ে যেতে পারে। এগুলিই তখন সুইপষ্টেকের পথ হিসাবে চিহ্নিত হয়। যেমন আফ্রিকান মালাগাসী সুইপষ্টেকের পথ। আফ্রিকার বৈচিত্র্যময় প্রাণীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র প্রাণী এই পথেই মাদাগাস্কার দ্বীপে পৌঁছেছিল। যেমন ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, বিড়াল জাতীয় প্রাণী, একধরনের পতঙ্গভুক টেনরেক (Tenrec), ক্ষুদ্রাকার হিপোপটেমাস প্রভৃতি। সুইপষ্টেকের পথে প্রাণী বিস্তার সাধারণতঃ একমুখী। বিশাল মহাদেশ নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে সাধারণতঃ এই পথেই প্রাণীবিস্তার ঘটে থাকে।

অনুশীলনী—3

উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. তিন রকমের স্থলসেতু হল —— , —— এবং ——।
2. উন্নত মেটাথেরিয়ান প্রাণীরা —— এর মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে।
3. বেরিং সমুদ্রের মধ্য দিয়ে টারশিয়ারী যুগের পূর্বে একটি স্থলসেতু —— ও —— মহাদেশকে যুক্ত করেছিল।

7.5 সারাংশ

ভূত্বকের গঠন বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে তা দুটি অংশ দিয়ে তৈরী। উপরের অংশটি সিয়াল (Sial) এবং নীচের অংশটি সিমা (Sima) নামে পরিচিত। ভূত্বকের ঠিক নীচেই থাকে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere) । এই স্তরে কঠিন পাথরের টুকরো ঘন তরল শিলা বা ম্যাগমার সাথে মিশে থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় এই স্তরই গলিত লাভা হয়ে বেরিয়ে আসে। এই ভূত্বক এবং অ্যাসথেনোস্ফিয়ারকে একত্রে শিলামন্ডল বলে। এই শিলামন্ডলের নীচের স্তরে (যা ম্যান্টল বলে পরিচিত) তাপীয় পরিচলন (Thermal convection) দেখা যায়। এইভাবে ঘনত্বের পার্থক্য হেতু বেশ কয়েকটি পরিচলন চক্র দেখা যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠে আবারকয়েকটি ছোট, বড় ও মাঝারী প্লেট দিয়ে তৈরী। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ম্যান্টল স্তরে পরিচলন চক্রের ফলে এই উপরের প্লেটগুলি সঞ্চালিত হয়। ফলে মহাদেশগুলি ক্রমাগত সঞ্চরণশীল। বৎসরে প্রায় 1 cm করে। এই সঞ্চারণের ফলে মহাদেশগুলি কখনো একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় যা কখনো একে অন্যের কাছাকাছি চলে আসে। প্রাণীরাও এই প্রক্রিয়ার ফলে কখনও এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বিস্তৃত হয়ে পড়ে কখনও বা পারে না। যখন দুটি মহাদেশ কাছাকাছি আসে তখন এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে প্রাণীর বিস্তার ঘটে। যখন মহাদেশগুলি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন কোন প্রাণীর পক্ষে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বিস্তার লাভ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে মহাদেশীয় সঞ্চালন প্রাণীর বিস্তারকে প্রভাবিত করে।

7.5 প্রশ্নাবলী

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

(a) ভূত্বকের উপরিভাগের অংশকে _____ বলে। (b) ভূত্বকের নিচের অংশকে _____ বলে। (c) প্রতি বৎসর মহাদেশগুলি _____ করে সরে যায়। (d) পৃথিবীপৃষ্ঠে _____ টি বড় মাপের প্লেট আছে।

2. প্রারম্ভে পৃথিবী যে অতিমহাদেশ ছিল তার নাম কি? কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে লরেশিয়া ভূখণ্ড ছিল? গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডে কী কী মহাদেশ একত্রিত ছিল?

3. অষ্ট্রেলিয়ায় এত বেশী সংখ্যক আদিম স্তন্যপায়ী পাওয়া যাবার কারণ কী? কোন্ প্রাণীরা সফলভাবে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করতে পেরেছিল? উত্তর আমেরিকার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার যোজকের নাম কী?

4. করিডোর কাকে বলে? ফিল্টার ব্রীজ কী? সুইপষ্টেকের পথই বা কী? কীভাবে এরা প্রাণীর বিস্তারে সাহায্য করেছিল?

7.7 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

1. (a) 7.2 দেখুন। (b) 7.2 দেখুন।

2. (a)—(iii); (b)—(v); (c)—(i); (d)—(ii); (e)—(iv)

অনুশীলনী—2

1. অতিমহাদেশ **2.** প্লাস্টিক **3.** চ্যুতি **4.** টেথিস

অনুশীলনী—3

1. করিডোর, ফিল্টার ব্রীজ, সুইপষ্টেকের পথ। **2.** পানামা যোজক। **3.** এশিয়া, উত্তর আমেরিকা।

প্রশ্নাবলী ঃ

1. (a) সিমা; (b) সিয়াল; (c) 1 সেমি; (d) 7 **2.** 7.3-এর 3-অংশ দেখুন। **3.** 7.4-এর 2-অংশ দেখুন। **4.** 7.4-এর 1, 2 এবং 3 দেখুন।

একক 8 ❑ জীবনের সৃষ্টি-তত্ত্ব; লামার্ক ও ডারউইন তত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গঠন

8.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

8.2 জীবনের স্বরূপ ও সংজ্ঞা

8.3 জীবনের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব

8.3.1 বিশেষ সৃষ্টির তত্ত্ব

8.3.2 স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি তত্ত্ব

8.3.3 প্যানস্পার্মিয়া তত্ত্ব

8.3.4 রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব

8.4 লার্মাকের বিবর্তন মতবাদের প্রেক্ষাপট

8.5 ডারউইনের বিবর্তন মতবাদের প্রেক্ষাপট

8.6 সারাংশ

8.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

8.8 উত্তরমালা

8.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

জীবের সৃষ্টি এবং বিবর্তন সংক্রান্ত প্রশ্ন সভ্যতার প্রথম থেকেই মানুষের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে তৈরী হয়েছে নানা চিন্তা ও মতবাদ। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক প্রশ্নের সাম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পেয়েছে, তা সত্ত্বেও বাকি রয়েছে অনেক জিজ্ঞাসা। আমরা বর্তমান এককে জীবনের সৃষ্টি সংক্রান্ত মতবাদ ও বিবর্তন নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করবো। বিবর্তনের সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। প্রতিনিয়ত এর সপক্ষে পর্যালোচনা এবং উদাহরণের অবতারণা করা প্রয়োজন। জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত হোমিনিন ফসিলের অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্রমসজ্জার সাথে বর্তমানের হোমোসাপিয়েন্সের (*Homo sapiaes*) মায়োগ্লোবিন এবং হিমোগ্লোবিনের অ্যামাইনো

অ্যাসিডের ক্রমসজ্জার সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ঘোড়ার মত বা পাখীর মত জীবাশ্মের সাথে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাই রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং বস্তুর উপাদান গত নির্ণয় বিবর্তনের প্রক্রিয়া জানতে সাহায্য করে। জীবনের এত বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র, এবং প্রাণের উপাদানের ধারাবাহিক সঞ্চালনের নীতি সমানভাবে জীবিত বস্তুর উপর প্রভাবকে সার্বিক ভাবে নির্ণয় করাই এই বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- জীবনের বস্তুগত উপাদান কি তা জানতে পারবেন।
- জীবনের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদগুলি জানতে পারবেন।
- বিশেষ করে প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারনা পাবেন।
- লামার্ক এবং ডারউইনের বিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ জানতে পারবেন।

8.2 জীবনের স্বরূপ ও সংজ্ঞা

জীবনের সংজ্ঞা প্রদান করা খুবই কঠিন ব্যাপার। জীবনের কতগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যথা—পুষ্টি, শ্বসন, রেচন, জনন ইত্যাদির বিচারে জীবন সম্পর্কে একটি ধারনা দেওয়া সম্ভব। Strickberger (1996) তাঁর Evolution বইটিতে জীবনের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন—"বিভিন্ন জৈবিক কাজ, যথা—বিপাক, বৃদ্ধি এবং জীন বস্তুর প্রজনন সম্পন্ন করার যোগ্যতাকেই জীবন বলে।"

বিশেষ ভাবে বলতে গেলে—যে বস্তুর নিজস্ব একটি জিনোম (Genome) আছে, যা নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম তাকেই আমরা জীবন বলতে পারি। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, উদ্ভিদ ও সব রকম প্রাণীরই জীবন রয়েছে কিন্তু জড় বস্তুর জিনোম না থাকার জন্য তাকে জীব হিসাবে গন্য করা হয় না।

R. A. Wilson (2005) এর মতে জীবনের সংজ্ঞা এভাবে বলা যেতে পারে যে—

- যে বস্তুর জন্যে বিভিন্নতা এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে।
- আভ্যন্তরীণ ভাবে অনেকগুলি জৈবনিক প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়
- বহু উপাদান দিয়ে গঠিত যার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন আছে।
- যার বৃদ্ধি এবং পরিণতি আছে।
- বংশ বিস্তার করতে পারে
- আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম
- জৈবিক প্রক্রিয়া ঘটে
- পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টা থাকে এবং
- যে জায়গায় অবস্থা করে সেখানে আবহাওয়া এবং অন্যান্য সজীব উপাদানের সাথে অনুকূল পরিবেশ (niche) গঠন করে নেয়।

8.3 জীবনের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব

জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। এই তত্ত্বগুলির বেশ কিছুরই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বিশেষ বিশেষ তত্ত্বগুলো পরিবেশিত হলো।

8.3.1 বিশেষ সৃষ্টির তত্ত্ব (Theory of special creation)

এই তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর মোট ছদিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন। তৃতীয় দিনে উদ্ভিদ, পঞ্চম দিনে মাছ ও পাখি এবং শেষ দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠ দিনে অন্যান্য প্রাণীকূল এবং সবশেষে সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ এবং প্রথম মানুষটি ছিল মানবী। মূলতঃ বাইবেল ভিত্তিক এই মতবাদ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর কোন ভিত্তি নেই।

8.3.2 স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি তত্ত্ব (Theory of spontaneous generation or abiogenesis)

ডেমোক্রিটাস (465-372 B.C) অ্যারিস্টটল (384-322 B.C) এর সময় থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধারনা ছিল বিভিন্ন জড় পদার্থ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবের উৎপত্তি হয়। যেমন—এক টুকরো মাংস কিছুদিন রেখে দিলে তার মধ্যে ছোটো ছোটো পোকা দেখা যায়। এই মতবাদ অনুসারে মাছ, ব্যাঙ, ইঁদুর ইত্যাদি মাটি ও কাদা থেকে উৎপত্তি হতে পারে, এমনকি মানুষও প্রথমে কীট হিসাবে সৃষ্টি হয়েছিল। নিউটন, হারভে এই মতবাদকে সমর্থন করতেন। ল্যাজারো স্পালাজেওনি এবং লুই পাস্তুর পরীক্ষার সাহায্যে এই মতবাদের অসাড়তা প্রমাণ করেন।

8.3.3 প্যানস্পারমিয়া তত্ত্ব

এই মতবাদ অনুসারে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই একরকম স্পোরের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব ছড়িয়ে রয়েছে। এই স্পোরগুলি পৃথিবীতে অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় প্রাণময় হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানী রিকটার (1865), হেল্‌ম্‌-হোল্টজ (1884), অ্যারেনিয়াম (1859) এই মতবাদ সমর্থন করেন। ক্রক্‌স (1973), ক্রিক (1981), হয়েলি এবং বিক্রমসিংহে (1993) প্রমুখের মতে পৃথিবীতে জীবনের আগমন ঘটেছিল মহাশূন্য থেকে আসা স্পোর বা এইরূপ অন্য কিছু থেকে।

8.3.4 রাসায়নিক বিবর্তন মতবাদ (Theory of Chemical evolution)

জৈব এবং অজৈব রসায়নের জ্ঞানের আলোকে প্রাণ সৃষ্টির ব্যাখ্যাকে বলা হয় প্রাণের রাসায়নিক বিবর্তন মতবাদ। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার নিরিখে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন রুশ জৈব রসায়নবিদ্ ওপারিন (1924) এবং এই মতবাদকে সমর্থন করেন বৃটিশ জীব বিজ্ঞানী হ্যালডেন (1928)। তাই অনেকে প্রাণ সৃষ্টির রাসায়নিক বিবর্তন মতবাদকে বলেন, ওপারিন-হ্যালডেন প্রকল্প (Oparin-Haldane Hypothesis)।

এই মতবাদ অনুসারে প্রাণের উৎপত্তির বিষয়টিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমন—(১) প্রাণ সৃষ্টির আদি পরিবেশ, (২) রাসায়নিক বিবর্তন, (৩) জৈবিক বিবর্তন।

প্রাণ সৃষ্টির আদি পরিবেশ ঃ আদিম যে পরিমন্ডলে প্রাণের সৃষ্টি হয় বলে অনুমান করা হয়ে থাকে তার আবহাওয়ামণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন একেবারেই ছিল না। হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, মিথাইল অ্যালকোহল, হাইড্রো সায়ানিক অ্যাসিড, মিথেন ছিল মূল উপাদানগুলির অন্যতম। পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে বিজারিত অবস্থায় ছিল। উচ্চ তাপমাত্রার জন্য জল, জলীয় বাষ্প হিসাবে উপস্থিত ছিল। পৃথিবীর আবহাওয়া মন্ডলের চারপাশে ওজন গ্যাসের মোড়ক না থাকায় অতি সহজেই সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে পারত এবং এই অতিবেগুনী রশ্মিই বিভিন্ন জৈব অণুর সংশ্লেষে শক্তি সরবরাহ করেছিল বলে মনে করা হয়।

ওপারিন এবং হ্যালডেন মনে করেন, পৃথিবীর বিজারিত পরিবেশে বিভিন্ন সরল অজৈব অণু থেকে (CO_2, NH_3, H_2O) অতিবেগুনী রশ্মি ও তড়িৎ শক্তির প্রভাবে জটিল অনুর সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বপ্রথম উরে এবং মিলার (Urey and Miller, 1953) ওপারিনের মতবাদ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে সমর্থ হন।

স্টেনলী মিলার এবং হ্যারল্ড উরে (Stanly Miller and Harold Urey, 1953) পরীক্ষাগারে কৃত্রিম বিজারিত পরিবেশে হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্পের মিশ্রন থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে অ্যালডিহাইড, বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড এবং কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি করেন।

মিলারের পরীক্ষার যন্ত্রটির চিত্ররূপ (চিত্র-8.1) অনুসরণ করলে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝতে পারা যায়। 1নং চিহ্নিত ফ্লাক্সে প্রয়োজনীয় গ্যাসের মিশ্রণকে ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করেন। 2 নং চিহ্নিত ফ্লাস্কে জল ফুটিয়ে জলীয় বাষ্প তৈরি করা হয়। এই জলীয় বাষ্পই সমস্ত গ্যাসীয় উপাদানগুলিকে 1 নং ফ্লাস্কে ঠেলে পাঠায়। 1 নং ফ্লাস্কে অ্যালডিহাইড, কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের মিশ্রণ কনডেনসারের মাধ্যমে ঠান্ডা হয়ে চিত্রের 3 নং অংশে জলীয় মাধ্যমে জমে। বৈদ্যুতিক শক্তির পরিবর্তে অতিবেগুনী রশ্মি বা আয়নিত বিকিরণকেও শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে একই ফল পাওয়া যায়।

বর্তমান বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অ্যামোনিয়া এবং মিথেন গ্যাসের মিশ্রণ খুবই অস্থায়ী। ফলে আদিম পৃথিবীতে সম্ভবতঃ বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন এবং সামান্য পরিমাণে কার্বন-মনো-অক্সাইড ছিল। প্রাক্‌জীবিয় পরিবেশে বিভিন্ন অণুর সংশ্লেষকালে বিদ্যুৎ মোক্ষণ (electric discharge) অতিবেগুনী রশ্মি শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করছিল বলে ভাবা হয়। অন্যান্য সম্ভাব্য শক্তিগুলি হল তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত শক্তি এবং সৌরশক্তি।

প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি বিভিন্ন সরল অণু জল বিয়োজন পদ্ধতিতে মিলিত হয়ে পলিমারাইজেশানের (Polymerisation) দ্বারা প্রাণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় জটিল অণু সৃষ্টি করে। যেমন—অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি মিলিত হয়ে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠন করে। রাইবোজ, ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা, ফসফেট অণু, পিউরিন, পিরিমিডিন পরস্পর মিলিত হয়ে DNA এর নিউক্লিওটাইড গঠন করে। নিউক্লিওটাইডগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে বিভিন্ন নিউক্লিক অ্যাসিড গঠিত হয়। প্রাক্-জীবিয় পরিবেশে এই ধরনের বেশিরভাগ সংশ্লেষগুলি উত্তপ্ত সমুদ্রের জলরাশিতে হয়েচিল বলে মনে করা হয়। হ্যালডেন এই সমস্ত সম্ভাব্য সংশ্লেষিত পদার্থ সহ সমুদ্রের জলরাশিকে স্যুপ (soup) বলে অভিহিত করেন, তাই এই কল্পিত স্যুপকে অনেকে 'হ্যালডেন স্যুপ' (Haldane soup) বলেন। মনে করা হয় এই সব সংশ্লেষকালে কার্বোডিমাইড নামক (N=C=N) এক ধরনের অণু

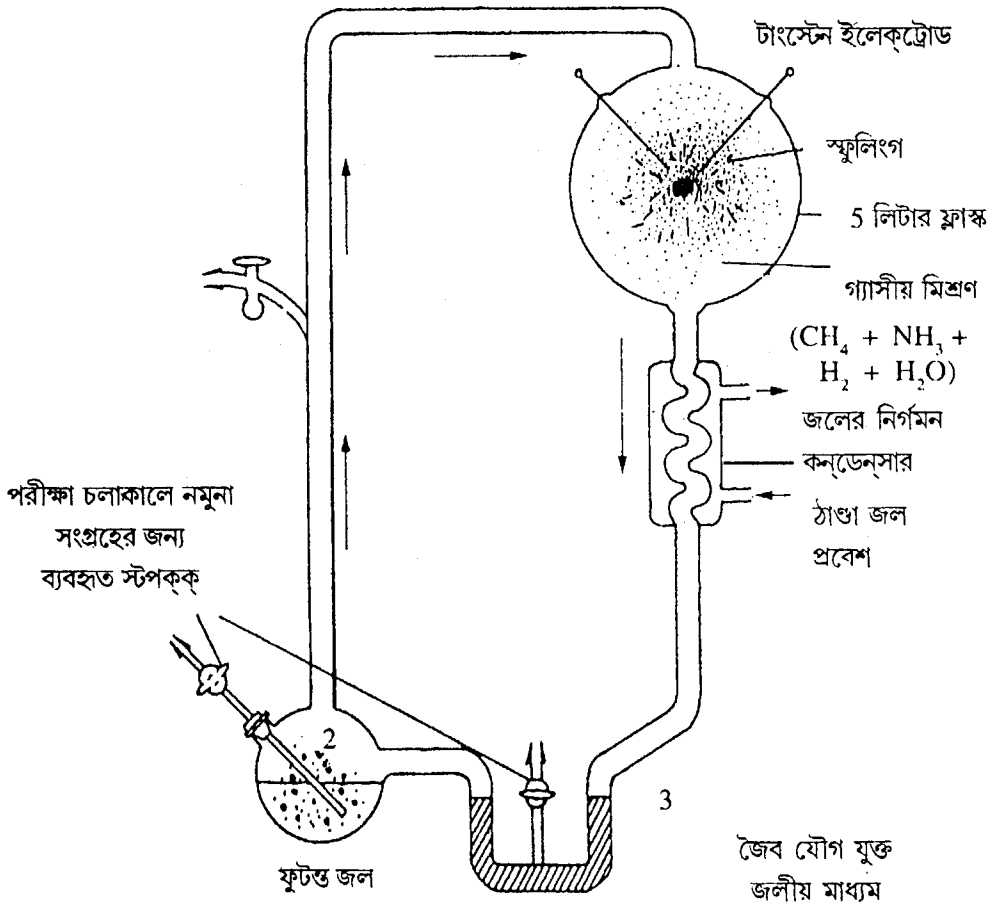

চিত্র 8.1 ঃ জৈব যৌগ সংশ্লেষের জন্য মিলারের এর ব্যবহৃত যন্ত্রের চিত্ররূপ।

উৎসেচক হিসাবে এবং শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করছিল। জিঙ্ক অ্যাপাটাইটের ক্যালসিয়াম ফসফেট, বেন্টোনাইট ইত্যাদি ধাতব বস্তুগুলি কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছিল বলে মনে করা হয়।

প্রাক্-কোরীয় সংগঠন হিসাবে প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার মডেল এবং কোয়াসারভেট (Coacervate) মডেলকে গ্রাহ্য মডেল হিসাবে গণ্য করা হয়।

ফক্স (1957) ও তাঁর সহকারী বিজ্ঞানীরা প্রায় 18 রকম অ্যামিনো অ্যাসিডের মিশ্রণ 150oC-200oC তাপমাত্রায় উত্তপ করে ঠান্ডা করেন। এর ফলে এক ধরনের পলিপেপটাইড শৃঙ্খল তৈরি হয়, এদের থার্মাল প্রোটিন বা প্রোটিনয়েড বলা হয়। প্রসঙ্গত প্রোটিনের উৎপত্তি জীবনের সৃষ্টির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রোটিনয়েড গুলি একত্রিত হয়ে প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার গঠন করে। প্রোটিনয়েড গুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

- থার্মাল প্রোটিনয়েডের সঙ্গে জল যুক্ত করলে মাইক্রোস্ফিয়ার তৈরি হয়।
- এরা আকৃতিতে কক্কাস ব্যাকটেরিয়ার মতো, কখনো কখনো স্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় শৃঙ্খল তৈরি করে।
- যথেষ্ট স্থায়ী।
- গ্রাম পজেটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ দু'ধরনের হতে পারে।
- অভিস্রবন ধর্ম যুক্ত।
- এদের মধ্যে উৎসেচক ক্রিয়া সম্ভব।
- মাইক্রোস্ফিয়ারগুলির দ্বি-বিভাজন এবং কোরকোদগম সম্ভব।

এই সকল কারণে অনেকে প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ারকে জীবের পূর্বসূরীর অবয়ব হিসাবে কল্পনা করেন। কারণ এই ধরনের মাইক্রোস্ফিয়ার প্রাক্-জীবিয় পরিবেশে সংগঠিত হওয়া সম্ভব।

অন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রাক্-জীবিয় সংগঠন হলো কোয়াসারভেট। ওপারিন (1924), ফক্স (1974) প্রমুখ বিজ্ঞানীর মতে আদি পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টি প্রাক্ পরিবেশে অজীবজাত পদার্থ থেকে সৃষ্ট কোলয়েড দানা বা কোয়াসারভেট গুলিই আদি কোষের নকশা। বর্তমানে বিপরীত বিদ্যুৎ শক্তি যুক্ত দ্রবণের মিশ্রনে কোয়াসারভেট তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু খুবই অস্থায়ী প্রকৃতির হওয়া প্রাক্-কোষীয় বস্তু হিসাবে এদের গুরুত্ব সহকারে গ্রাহ্য করা হয় না।

জীব সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো DNA এবং RNA সংশ্লেষ। প্রাক্-জীবিয় পরিবেশে নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষ-এর জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক সৃষ্টির সমস্যা বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট ভাবিয়েছে। ওরগেল (Orgel, 1989) প্রমাণ করেন RNA এমন একটি নিউক্লিক অ্যাসিড যার স্বপুনরুৎপাদন ক্ষমতা ও উৎসেচক হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে, ফলে RNA কে প্রথম সৃষ্ট নিউক্লিক অ্যাসিড বলে মনে করা হয়। পরে RNA তেকে reserve transcriptage দ্বারা DNA সংশ্লেষিত হয়।

নিচে প্রাণ সৃষ্টির বিভিন্ন সাম্ভাব্য পর্যায়গুলি 8.2 নং চিত্রে দেখানো হলো ঃ

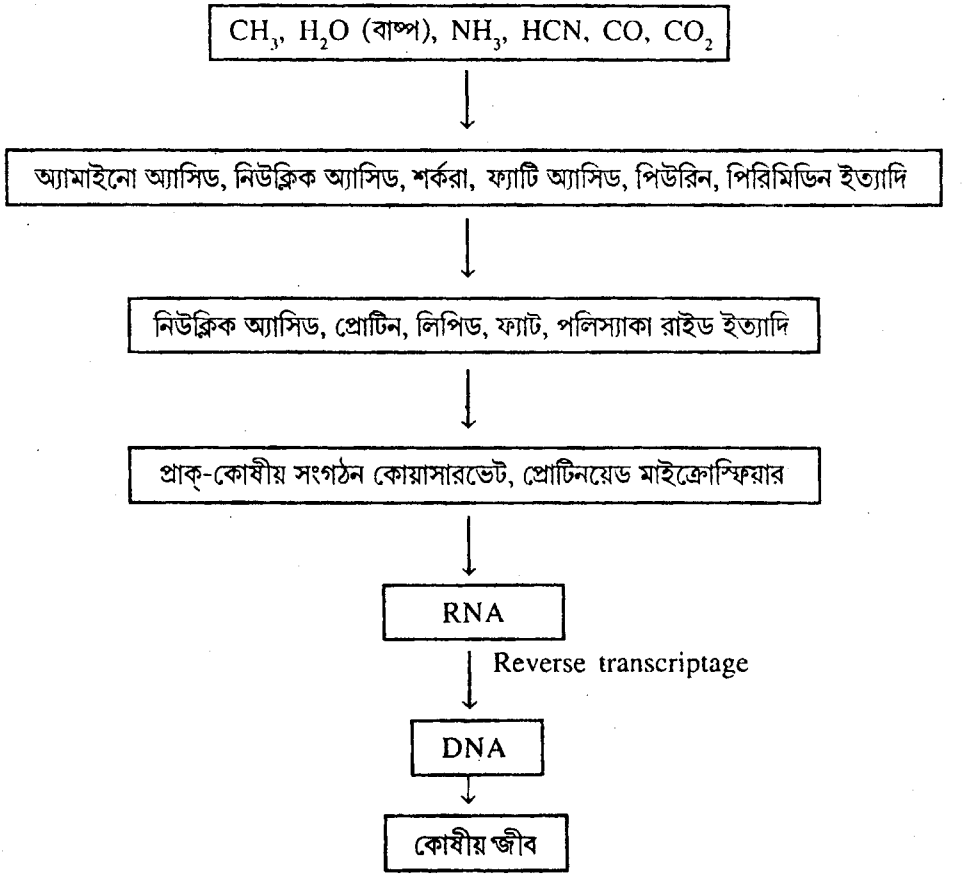

চিত্র - 8.2

গভীর সমুদ্রে যেখানে তাপমাত্রা 350^{0}C এ থাকে, অ্যামাইনো অ্যাসিড (Alanine) অ্যালেনিন এবং তার সাথে পেপটাইডের ছোট শৃঙ্খল সৃষ্টির সম্ভাবনার সপক্ষে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। রাসায়নিক ক্রিয়াটি নিম্নলিখিত ভাবে সংঘটিত হতে পারে,

জলজ কিছু ধাতব অণু $\rightarrow$ সক্রিয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড + কার্বন ডাই অক্সাইড $\rightarrow$ পাইরুভিক অ্যাসিড এবং কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়া $\rightarrow$ অ্যালেনিন, যে অণুগুলি জলের সাথে বিক্রিয়া করে ছোট ছোট পেপটাইড শৃঙ্খল তৈরী করতে পারে।

হিউবার এবং ওয়াটারসসার (1998) (Huber & Wathtershauser) এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে প্রথম অণুর সৃষ্টিকালে ধাতব অণুর যে ভূমিকা ছিল এখন উৎসেচক (enzyme) সেই কাজ করে। সমুদ্রতলে পাহাড়ে আয়রণ পাইরাইট প্রচুর পরিমাণে আছে।

পাঁচটি সম্ভাব্য বিক্রিয়ার উল্লেখ করা হল যেগুলি প্রকৃতিতে জৈব অণু সৃষ্টির পদক্ষেপ।

● **অ্যালডিহাইড** — প্রাকৃতিক পরিবেশে পৃথিবীতে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী হয়েছে অ্যালডিহাইড থেকে। যে উপাদানটি পরিবেশের স্বাভাবিক উপাদান অ্যালকহল (ইথানল, মিথানল) থেকে তৈরী হয়। অ্যালডিহাইডে CHO গ্রুপ বর্তমান।

$$R - \overset{\overset{O}{\|}}{C} - H$$

R বলতে বোঝায় যে কোন অ্যালফিল (aliphatic) অথবা অ্যারাইল (aromatic) গ্রুপ। স্বাভাবিক গ্যাসীয় উপাদান থেকে অ্যালডিহাইড তৈরী হতে পারে।

$$\left.\begin{matrix} N_2 + H_2 \\ N_2 + H_2O \end{matrix}\right\rangle NH_3$$

Ammonia

$$CH_4 + H_2O \rightarrow CH_3CHO(H_3C - \overset{\overset{O}{\|}}{C}H)$$

Acetaldehyde

$$CH_4 + \tfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow{[O]} CH_3OH \rightarrow HCOH$$

Formaldehyde

স্ট্রীকার পদ্ধতিতে (Strecker Synthesis) অ্যালডিহাইড থেকে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড প্রস্তুত হতে পারে। অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ সংকেত

যখন R = H সেই রাসায়নিক উপাদানটি গ্লাইসিন

R = $-CH_3$ সেই রাসায়নিক উপাদানটি অ্যালানিন

R = $-CH_2OH$ সেই রাসায়নিক উপাদানটি সেরিন

এইভাবে প্রকৃতিতে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়েছে। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিই প্রোটিনের গঠনগত উপাদান।

● **শর্করা** — ফরমালডিহাইডের ঘনীভূবন প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরী হয়। ছয় কার্বনযুক্ত (গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ) শর্করাই প্রধান জৈব প্রক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে। গ্লুকোজ শর্করাটি প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে এবং স্থায়ীভাবে থাকে। গেস্ট এবং স্কফ [Gest & Schoph (1983)]-এর মতে শর্করাযুক্ত কোষীয় প্রক্রিয়াগুলিতেই জৈবরাসায়নিক ও কোষীয় বিবর্তনের সাফল্যের সূচনা হয়।

● **পিউরিন ও পিরিমিডিন** — পিউরিন ও পিরিমিডিন ক্ষারই হল নিউক্লিক অ্যাসিডে অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। নিউক্লিক অ্যাসিডের পিউরিনক্ষারগুলিতে একটি ছয় কার্বনযুক্ত রিং এর সঙ্গে পাঁচকার্বনযুক্ত রিং সংযুক্ত অবস্থায় একত্রিত হয়ে থাকে। যেমন অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন।

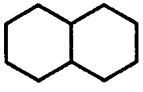

পিরিমিডিন ক্ষারগুলিতে দুটি N-পরমাণু যথাক্রমে 1 ও 3 নং অবস্থানে বিরাজ করে। যেমন সাইটোসিন, ইউরাসিল, থায়ামিন।

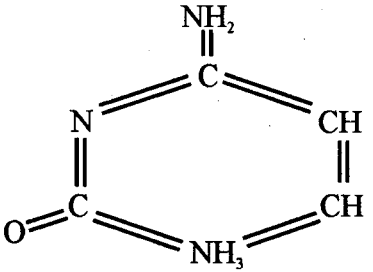

সাইটোসিন

● **ফ্যাটি অ্যাসিড** — অত্যধিক বায়ুমণ্ডলের চাপে γ-রশ্মির উপস্থিতিতে ইথিলিন থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন হয় যা সজীব বস্তুর কোষপর্দা ও সঞ্চয়কারী কলার মধ্যে থাকে।

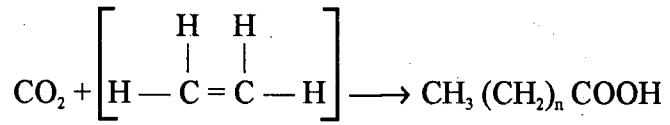

Ethylene mol

● **পাইরোল, পরফাইরিন রিং এবং কো-এনজাইম** — পরফাইরিন জাতীয় রাসায়নিক বস্তুর আধার হল পাইরোল গ্রুপ। পরফাইরিন CH_4, NH_3 এবং H_2O এই তিনটি উপাদানের রাসায়নিক বিক্রিয়া করে এবং পরে ফরমালডিহাইডি বা বেনজালডিহাইডের সাথে সংযুক্ত হয়ে পাইরোল গঠন করে।

পাইরোল একটি পাঁচ কার্বন যুক্ত রিং যেখানে N অসম (hetero) পরমাণু রূপে অবস্থান করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জৈবিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ক্লোরোফিল ও হিমোগ্লোবিনের উপাদান এই পাইরোল রিং। উদ্ভিদে ক্লোরোফিলে কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু রূপে Mg অবস্থান করে যার সঙ্গে চারটি পাইরোল রিং যুক্ত থাকে। এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু রূপে Fe অবস্থান করে।

এছাড়াও জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া নিউক্লিওটাইডের উপজাত বস্তু যেমন নিকোটিনামাইড অযাডেনিন নিউক্লিওটাইড (NAD) যেগুলি অনেক প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে। সেই উপাদানগুলিকে বলা হয় কো-এনজাইম।

8.4 লামার্কের মতবাদের প্রেক্ষাপট

বিবর্তনবাদের অন্যতম প্রবক্তা ফরাসি প্রকৃতিবিদ্ জ্যা ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক (Jean Baptiste Lamarck 1774-1829) জীব বিবর্তন সম্পর্কে (1801 সালে) তাঁর একটি বিশেষ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে (1815-1822) বিবর্তন সম্পর্কে তার প্রধান সূত্রগুলি প্রনয়ন করেন। সূত্রগুলি হল ঃ

ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র এবং অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশগতি।

ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র ঃ ল্যামার্ক-এর মতে কোন একটি বিশেষ অঙ্গকে ব্যবহারের মধ্যে রাখতে লাত বংশ পরম্পরায় বিশেষভাবে বিবর্তিত হয় এবং যে অঙ্গগুলি ব্যবহৃত হয় না তা আস্তে

আস্তে বংশ পরম্পরায় লুপ্ত হতে থাকে। চার্লস ডারউইন লামার্কের এই সূত্রটি বিশেষভাবে অনুধাবন করেন।

অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশগতি ঃ লামার্কের মত অনুযায়ী কোন প্রাণীর নিহিত ইচ্ছা থেকেই একটি বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে এবং কোন প্রজন্মে কোন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হলে তা বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। লামার্ক তার ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র দ্বারা জিরাফের লম্বা গলার বিবর্তনের ব্যাখা দেন, কিন্তু অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হওয়ার ঘটনা কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে পারেননি। লামার্কের সূত্রগুলির নানা বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা থাকায় তা বিজ্ঞানী মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়নি। পরবর্তীকালে চার্লস ডারউইন জীবের বিবর্তন সম্পর্কে বিশদ্ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন।

অনুশীলনী—2

a. লামার্ক তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি লিখুন।

b. লামার্ক-তত্ত্ব গ্রাহ্য না হওয়ার মূল কারণ কী?

8.5 ডারউইনের বিবর্তন মতবাদের প্রেক্ষাপট

চার্লস ডারউইন (1809-1882) তাঁর যুগান্তকারী "On the origin of speicies by means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the struggle for life" পুস্তকে 1859 খৃস্টাব্দে প্রচুর তথ্য প্রমাণ সন্নিবেশ করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) সাহায্যে প্রজাতি (Species) সমূহের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

ডারউইনের মতবাদকে অনেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বও (Theory of Natural Selection) বলেন। ডারউইনের সমসাময়িক প্রকৃতিবিদ্ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace, 1858) ডারউইনের মতবাদের অনুরূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পৌঁছান। পরবর্তীতে ডারউইন ও ওয়ালেস্ যৌথভাবে 1858 সালের পয়লা জুলাই লিনিয়ান সোসাইটি অব্ লন্ডনে তাঁদের প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

জুলিয়ান হাক্সলির (Julian Huxley, 1942) মতে ডারউইনের তত্ত্বটি কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা এবং তা থেকে কতগুলি সিদ্ধান্তের মিশ্রণ মাত্র।

প্রথম প্রাকৃতিক ঘটনা বা তথ্য—জীবের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঃ প্রতিটি জীবের ধর্ম হল প্রজনন দ্বারা দ্রুত নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। দুই থেকে চার, চার থেকে আট এইভাবে জ্যামিতিক গুণোত্তর শ্রেণী (Geometric progression series) অনুপাতে বংশ পরম্পরায় জীব সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে থাকবে। কিন্তু খাদ্য এবং বাসস্থান সীমাবদ্ধ থাকায় জীব সংখ্যা বৃদ্ধির হার অপরিমিত নয়।

দ্বিতীয় প্রাকৃতিক ঘটনা ঃ জীবের মোট সংখ্যা প্রায় একই থাকে।

প্রথম সিদ্ধান্ত ঃ উপরের দু'টি ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে জ্যামিতিক গুণোত্তর শ্রেণী অনুপাতে জীব সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভবনা থাকা সত্বেও সীমাবদ্ধ খাদ্য ও বাসস্থান থাকায় জীব সংখ্যা বৃদ্ধির হার অপরিমিত নয়, অর্থাৎ যে সংখ্যায় জীব জন্মায় সেই হারে বাঁচতে পারে না। বাঁচার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এই সংগ্রাম সাধারণতঃ তিন প্রকারের—

1. **অন্তঃ প্রজাতি সংগ্রাম** (Intraspecific struggle) ঃ একটি প্রজাতির সদস্যদের নিজেদের মধ্যে বাঁচার যে সংগ্রাম দেখা যায় তাকে অন্তঃ প্রজাতি সংগ্রাম বলে।

2. **আন্তঃ প্রজাতির সংগ্রাম** (Interspecific struggle) ঃ দুইটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে আন্তঃ প্রজাতি সংগ্রাম বলা হয়।

3. **পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম** (Environmental struggle) ঃ উপরিউক্ত দু'ধরণের সংগ্রাম ছাড়াও প্রতিকূল এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গেও জীবদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়।

তৃতীয় প্রাকৃতিক ঘটনা ঃ প্রকরণের সার্বিক উপস্থিতি (Universal occurrence of variation) ঃ জীব জগতে প্রকরণের উপস্থিতি একটি সার্বিক ঘটনা। একই প্রজাতির জীবদের মধ্যে এমনকি একই পিতা মাতার সন্তানদের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ঃ আগেই বলা হয়েছে প্রকৃতিতে নিজের অস্তিত্ব বজার রাখার জন্য জীবদের মধ্যে সংগ্রাম অনিবার্য এবং প্রকরণগত ভেদ বা পার্থক্য জীবজগতের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অধিকতর যোগ্য প্রাণীরাই জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। কতগুলি প্রকরণ জীবদের বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য করে—এই প্রকরণগুলিকে সহায়ক প্রকরণ বলে। এই সহায়ক প্রকরণ যুক্ত প্রাণীরাই জীবন সংগ্রামে অধিকতর যোগ্য। যাদের সহায়ক প্রকরণ থাকে না তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে সব প্রাণীরা বাঁচতে পারে তারাই যোগ্য এবং তাদেরকেই প্রকৃতি বাঁচার জন্য নির্বাচিত করে। প্রকৃতি দ্বারা অ-নির্বাচিত প্রাণীরাই বিলুপ্ত হয়। যোগ্য এবং অযোগ্যের নির্বাচন যেহেতু প্রকৃতির দ্বারা হয়ে থাকে, তাই এই মতবাদকে প্রকৃতিক নির্বাচন মতবাদও বলা হয়।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত ঃ নতুন প্রজাতি সৃষ্টি (origin of species) ঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রকৃতির পছন্দের সহায়ক প্রকরণ যুক্ত প্রাণীরাই পুরুষানুক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং সহায়ক প্রকরণগুলির উন্নতি ঘটতে থাকবে। এইভাবে ধীরে ধীরে সহায়ক প্রকরণের ক্রমোন্নতি ও সন্নিবেশের দ্বারা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় বলে ডারউইন মনে করতেন। এইভাবে খাটো গলা এবং লম্বা গলা বিশিষ্ট পূর্বসূরী মিশ্র জিরাফ প্রজাতি থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বর্তমানে লম্বা গলা যুক্ত জিরাফ প্রজাতি সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক তথ্য এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডারউইন এবং ওয়ালেসের মতবাদের সারাংশ নিচে দেওয়া হলো।

তথ্য	সিদ্ধান্ত
(i) সীমাবদ্ধ আহার্য ও বাসস্থান যুক্ত পরিবেশে জীবের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি। (ii) প্রত্যেক প্রজাতির জীব সংখ্যা প্রায়ই স্থির থাকে।	1. অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম।
তথ্য	**সিদ্ধান্ত**
(i) অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম (ii) জীব গোষ্ঠিতে সহায়ক এবং অসহায়ক প্রকরণের সার্বিক উপস্থিতি	2. প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা সহায়ক প্রকরণ যুক্ত যোগ্য প্রাণীর পুরুষানুক্রমে ধীরে ধীরে পরিবর্তন।
(i) যোগ্যতমের (সহায়ক প্রকরণ যুক্ত প্রাণী) উদ্‌বর্তন (ii) ধারাবাহিক পরিবর্তন (অভিযোজন)	3. নতুন প্রজাতি সৃষ্টি।

ডারউইনের মতবাদ বিজ্ঞানী সমাজে গৃহীত হলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এর বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেন। 1859 খৃস্টাব্দের পর জীব বিজ্ঞানের নানা নতুন তথ্য যেমন, বংশগতিবিদ্যা, শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান, তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানিক বিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, পরিবেশ বিদ্যা, জৈবরসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি থেকে নতুন তথ্য ও আবিষ্কারের ফলে ডারউইনবাদ সংশোধিত হয়। বিশেষ করে প্রকরণের উৎপত্তি এবং প্রজাতি সৃষ্টির ব্যাখ্যা নতুন মাত্রা পায়। হ্যালডেন বলেছিলেন, ডারউইন জীবিত থাকলে এই সব নতুন আবিষ্কারের ফলে নিজেই তার মতবাদকে সংশোধন করতেন। এই সংশোধিত ডারউইনবাদকে বলা হয় নব ডারউইনবাদ বা সংশ্লেষণবাদ (Neo Darwinism or The Synthetic theory)।

অনুশীলনী—3

a. ডারউইনের বিখ্যাত বইটির নাম কী?

b. ডারউইন মতবাদের অনুরূপ মতবাদ প্রবক্তার নাম কী?

c. ডারউইন এর প্রাকৃতিক তথ্যগুলি কী?

d. নব ডারউইনবাদ কাকে বলে?

e. প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে কি বোঝানো হয়েছে।

8.6 সারাংশ

● জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই জীবকে জড় থেকে আলাদা করা সম্ভব। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রজনন, রেচন, চলন, গমন ইত্যাদি।

● জীবন সৃষ্টির নানা মতবাদের মধ্যে একমাত্র রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর প্রাক-জীবিয় বিজারিত পরিবেশে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন ইত্যাদির উপস্থিতিতে অতিবেগুণী রশ্মী এবং বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা প্রথমে জটিল জৈব বস্তুর সংশ্লেষ হয় এবং পরে প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার, কোয়াসারভেট ইত্যাদি প্রাক্-কোষীয় অঙ্গে RNA যুক্ত জীবের সৃষ্টি এবং পরবর্তীকালে DNA যুক্ত জীবের উদ্‌বর্তন ঘটে।

● বিবর্তনের আদি প্রবক্তাদের মধ্যে লামার্ক এবং ডারউইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লামার্ক-এর অর্জিত বৈশিষ্ট্যের পুরুষানুক্রমে প্রবাহ এবং ব্যবহার ও অব্যবহার মতবাদ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভাবে বিশেষভাবে গৃহীত হয় নি। কিন্তু ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা সমৃদ্ধ। ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা সহায়ক প্রকরণ থেকে ধীরে ধীরে নতুন প্রজাতি উদ্‌বর্তনের সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তীকালে জীব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে ডারউইনের মতবাদ সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিশ্লেষিত হয় এবং এই মতবাদকে বলা হয় নব-ডারউইন মতবাদ।

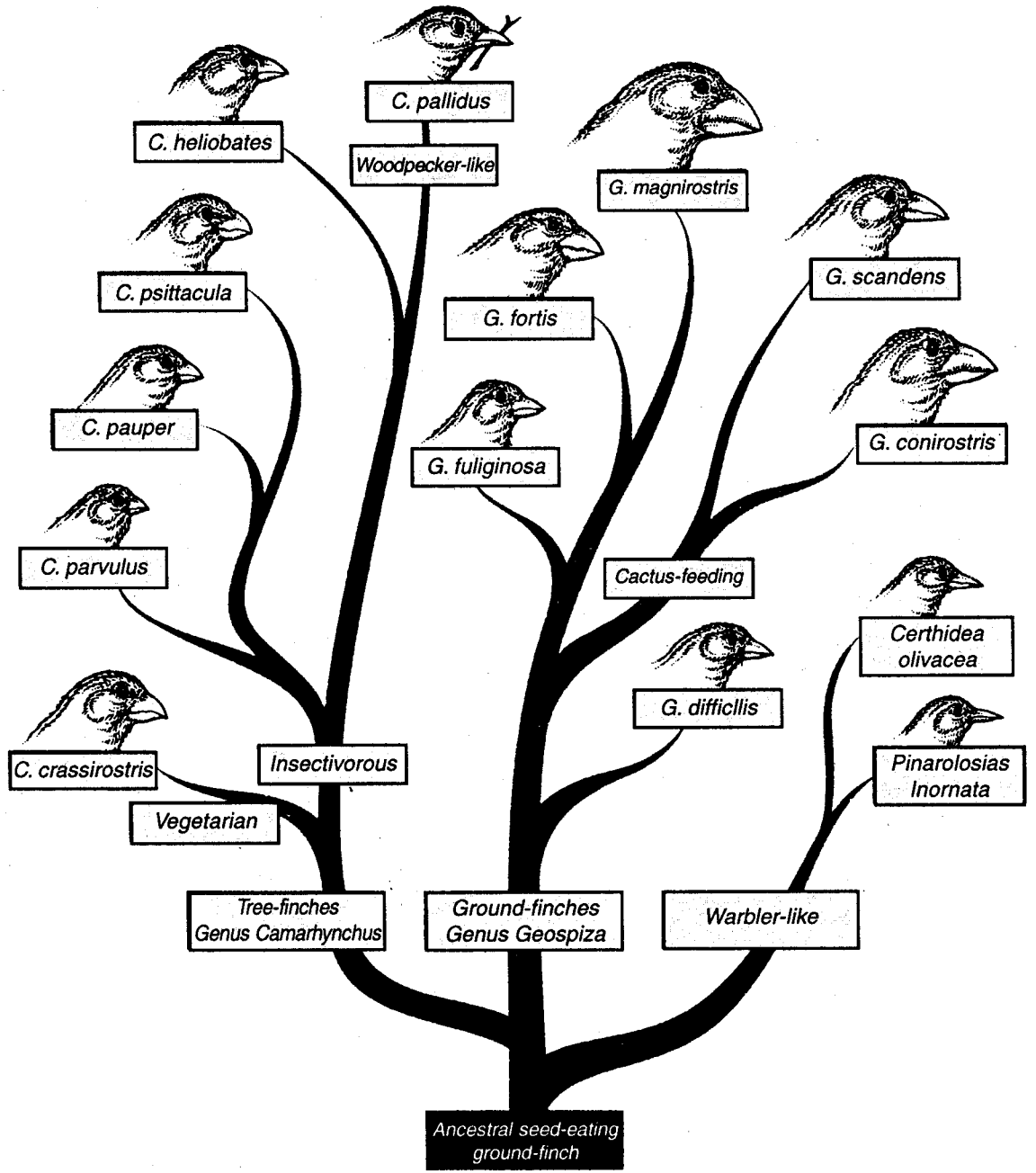

8.3 Evolutionary tree of Darwin's finches showing adaptations of the beaks of different species. A molecular study by Sato and coworkers (1990) supports some aspects of this phylogeny. Using conparisons among mitochondrial DNA sequesnces (see Chapter 12), the molecular study distinguishes between tree finches and ground finches, but shows that distinctions among members within each group have not yet been firmly established. This molecular study also indicates that these finches are all descended from a single species, now identified as a warbler-type, "dull-colored grassquit" (genus *Tiaris*). (Adapted from Lack, D., 1947. *Darwin's Finches.* Cambridge University Press, Cambridge, England.) ডারউইন তাঁর জলযাত্রায় বিভিন্ন দ্বীপে ফিনচ পাখীর বৈচিত্র পর্যবেক্ষণ করেন। 'প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ'—এই মতবাদের সপক্ষে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। (Evolution—Strickberger, 3rd Edition)

8.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

a. জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বটির বিশদ বিবরণ দিন।

b. লামার্ক মতবাদের প্রথম দুটি সূত্র বিবৃত করুন।

c. ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বটি পরিশেষ বিবৃত করুন।

8.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

a. নিজে চেষ্টা করুন।

b. উরে মিলারের পরীক্ষা অংশটি দেখুন।

c. নিজে চেষ্টা করুন।

d. নিজে লিখুন।

e. প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার অংশটি দেখুন।

f. RNA.

অনুশীলনী—2

a. নিজে লিখুন।

b. কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না থাকায় লামার্ক-এর তত্ত্ব গ্রাহ্য হয়নি।

অনুশীলনী—3

a. On the origin of species by means of Natural Selection'

b. আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।

c. নিজে চেষ্টা করুন।

d. নিজে চেষ্টা করুন।

e. নিজে চেষ্টা করুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

a. পাঠে জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি অংশটি দেখুন।

b. নিজে চেষ্টা করুন।

c. ডারউইন মতবাদ অংশটি দেখুন।

একক 9 ❑ জৈব বিবর্তনের আধুনিক রূপরেখা

গঠন

9.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

9.2 বিবর্তন ও তার আধুনিক মতবাদ

9.3 প্রকরণ (variation) এবং প্রকরণের উৎপত্তি

9.4 হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা

9.5 পরিব্যক্তি (Mutation) ও বিবর্তন

9.6 প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও বিবর্তন

9.7 জিন বিনিময় ব্যবস্থা (Gene flow) ও বিবর্তন

9.8 অসম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থা (Non Random mating) ও বিবর্তন

9.9 জেনোটিক ড্রিফট্ (Geneticdrift); ফাউন্ডার ইফেক্ট (Founder effect) এবং শিশি গ্রীবাবস্থা (Bottleneck effect) ও বিবর্তন

9.10 সারাংশ

9.11 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

9.12 উত্তরমালা

9.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে জৈব বিবর্তন তত্ত্ব এক মহান বৈপ্লবিক সংযোজন। চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের (1858) বিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানুষ ও জীবকূল সৃষ্টির বাইবেল প্রচারিত বদ্ধমূল ধারনার মূলে চরম কুঠারাঘাত করে। ডারউইনের (1809-1882) সমসাময়িক জীব-বিজ্ঞানীরা মনে করতেন প্রতিটি জীবই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের দান। বিখ্যাত শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী লিনিয়াস একই ধারণার বশবর্তী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীর সব জীবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট বিবর্তনের কোন ধারবাহিক প্রাকৃতিক ফল নয়। এইরকম একটি বিশেষ পটভূমিকায় ডারউইন এবং ওয়ালেস যুগ্মভাবে 1858 সালে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে জৈব বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেন। ডারউইনের পর জীব-বিজ্ঞানে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে বংশগতি বিদ্যার (Genetics) জ্ঞান, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার, প্রাণ-রসায়ন বিদ্যা এবং প্রাণ-পদার্থ বিদ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবহারে ও সর্বোপরি জিনের বংশগতিতে পরিসংখ্যান বিদ্যার প্রয়োগে ডারউইনের বিবর্তনবাদের আর এক ধরনের বৈপ্লবিক বিবর্তন ঘটে। এই আধুনিক বিবর্তনবাদের রূপরেখা নিয়েই আমরা এই এককে বিশদভাবে আলোচনার চেষ্টা করবো।

উদ্দেশ্য

আপনি এই এককটি পাঠ করে জানতে পারবেন—

- আধুনিক বিবর্তনবাদ কী?
- প্রকরণ ও প্রকরণের উৎস।
- হার্ডি-ওয়েনবার্গ এর সাম্যাবস্থা।
- হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা পরিবর্তনকারী শর্তসমূহ অর্থাৎ বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি সমূহ।

9.2 বিবর্তনের আধুনিক ধারণা

বিবর্তনের আধুনিক ধারণা পোষাকি নাম নব ডারউইনবাদ (Neo Darwinism) বা **বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণ তত্ত্ব** (Modern Synthetic Theory of Evolution)। এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিষয়টি মূলতঃ বংশগতিবিদ্যা এবং পপুলেশন জেনেটিক্স (Population Genetics) নির্ভর। হার্ডি-ওয়েনবার্গ (1908) ফিসার (Fisher), রাইট (Wright) হলডেন পরবর্তীকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন—

- ব্যক্তি (Individual) নয়, সমষ্টিই (population) বিবর্তনের একক।
- সমষ্টির (population) জিন ফ্রিকোয়েন্সির (Gene Frequency) পরিবর্তনই বিবর্তনের সূচনা।
- সমষ্টির জিন ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের মূলে কার্যকরী শর্তগুলি হলো পরিব্যক্তি (Mutation), জিন বিনিময় ব্যবস্থা (Gene flow), জেনেটিক ড্রিফট্ (Genetic drift), প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection), স্ব-প্রজনন (Inbreeding) ইত্যাদি।
- জিন ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের শর্তগুলি কার্যকরী না থাকলে জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি (Genotype frequency) এবং জিন ফ্রিকোয়েন্সি সমষ্টিতে (population) প্রজন্ম পরম্পরায় একই থাকে। এই ধরনের সাম্যাবস্থাকে বলা হয় হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যবস্থা।

  এই সকল পঠন-পাঠনের উপর নির্ভর করে 1930 সাল নাগাদ পপুলেশন জেনেটিক্স এর ভিত্তি স্থাপিত হয়।
- অনিয়মিত জিন পরিব্যক্তির (Random mutation of gene) ফলে সমষ্টিতে (population) সৃষ্ট জিন-প্রকরণই (Genetic Variation) বিবর্তনের মূল রসদ।
- বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে পারে এমন জিন-প্রকরণের উপর হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা পরিবর্তনকারী শর্তসমূহ কার্যকর হয়ে সমষ্টির (population) জিন-ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন সূচিত করে এবং এইভাবে একই প্রজাতির বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন সমষ্টি (population) বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়ে কালক্রমে নতুন প্রজাতি সৃষ্ট করে। একইভাবে দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনের ধারাবাহিক ফল হিসাবে উচ্চতর ট্যাক্সোনোমিক ক্যাটেগরি (Taxonomic category) অর্থাৎ গণ (Genus), গোত্র (Family), বর্গ (order) ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

  বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণ তত্ত্ব সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ

প্রজাতির বিভিন্ন সমষ্টির (Population) জিন পুলে (Gene pool) অনিয়মিত জিন পরিব্যক্তি — জিন-প্রকরণ (Gene variation) – কার্যকরি হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা পরিবর্তনকারী শর্তসমূহ — সমষ্টির জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ও বিবর্তনের সূচনা।

আধুনিক বিবর্তনবাদকে বোঝার জন্য পপুলেশন জেনেটিক্স এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আপনাদের সম্যকভাবে জানা দরকার। এই বিষয়গুলি নিম্নে উল্লিখিত হল—

● পপুলেশন (Population)/মেন্ডেলিয়ান পপুলেশন (Mendelian population) বা সমষ্টি ঃ

পপুলেশন জেনেটিক্সে পপুলেশনকে অন্তঃ যৌন প্রজননক্ষম (Sexual Interbreeding) জীবের সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়। যেহেতু মেন্ডেলের সূত্র দ্বারা এই ধরনের সমষ্টির মধ্যে জিন বিনিময় ব্যাখ্যা সম্ভব তাই এই ধরনের সমষ্টি বা পপুলেশনকে মেন্ডেলিয়ান পপুলেশনও বলা হয়। পপুলেশন বা সমষ্টির আকৃতি অনেক ধরনের হতে পারে কিন্তু মূলতঃ এরা স্থানীয় গোষ্ঠী (Deme), যার প্রতিটি জীব তার বিপরীত লিঙ্গের জীবের সঙ্গে সঙ্গমের সমান সুযোগ পায়।

● জিন ফ্রিকোয়েন্সি (Gene frequency) বা অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি (Allele frequency) ঃ

পপুলেশন বা সমষ্টির মধ্যে একটি জিনের বিভিন্ন অ্যালিলের, যথা—অনুপাতকে (Proportion of the different alleles of a gene) এক কথায় বলা হয় অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি (Allele frequency) বা জিন ফ্রিকোয়েন্সি।

পপুলেশনে একটি জিনের বিভিন্ন অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ঃ

প্রথমে পপুলেশনের মোট জীব সংখ্যা গননা করতে হয়। তারপর একটি নির্দিষ্ট জিনের বিভিন্ন অ্যালিলের আপেক্ষিক অনুপাত নির্ধারণ করা হয়।

উদাহরণ ঃ কিছু মানুষ ফিনাইল থায়ো কার্বামাইড (Phenyl thiocarbamide) আস্বাদন করতে পারেন, কিছু মানুষ পারেন না। ফিনাইল থায়ো কার্বামাইড (PTC) আস্বাদন সম্পর্কিত জিনটির দুইটি অ্যালিল হলো T (প্রকট) এবং t (প্রচ্ছন্ন)। 'TT' এবং 'Tt' জিনোটাইপ যুক্ত মানুষ PTC আস্বাদন করতে পারেন কিন্তু 'tt' জিনোটাইপযুক্ত মানুষ PTC আস্বাদন করতে পারেন না। ধরা যাক, 200 জনের একটি পপুলেশনে 90 জন TT জিনোটাইপ যুক্ত, 60 জন Tt জিনোটাইপ যুক্ত এবং 50 জন tt জিনোটাইপ যুক্ত। এই পপুলেশনে নির্দিষ্ট জিনটির অ্যালিলের মোট সংখ্যা 400 (ডিপ্লয়েড জীন হওয়ায় মোট অ্যালিল 200 × 2 = 400)। অর্থাৎ,

● T অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি = {90 টি TT জিনোটাইপের (90×2)=180 টি অ্যালিল + 60 টি Tt জিনোটাইপের $\frac{(60\times2)}{2}$ = 60টি অ্যালিল} $= \frac{240}{400} = 0.60$

● t অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি = {50টি tt জিনোটাইপের (50×2) = 100 টি অ্যালিল + 60 টি Tt জিনোটাইপের $\frac{(60\times2)}{2}$ = 60 টি অ্যালিল } $= \frac{160}{400} = 0.40$

দুইটি অ্যালিলের মোট ফ্রিকোয়েন্সি = 0.60 + 0.40 = 1.00

এই পপুলেশনের জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি আমরা নিম্নলিখিতভাবে গননা করতে পারি ঃ

$$Tt = \frac{90}{200} = \cdot45, Tt = \frac{60}{200} = \cdot30, tt = \frac{50}{200} = \cdot25$$

জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি থেকেও জিন ফ্রিকোয়েন্সি বা অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি নিম্নলিখিতভাবে গননা করা যায় ঃ

T = ·45 (TT) + ½×0·30 (Tt) = ·45 + ·15 = ·60
t = ·25 (tt) + ½×0·30 (Tt) = ·25 + ·15 = ·40
মোট = 1.00

● **জিন পুল (Gene pool)** ঃ একটি পপুলেশন বা সমষ্টিতে পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী জনন কোষ সমূহের মোট জিন সখ্যাকে একত্রে জিন পুল বলা হয়।

অনুশীলনী—1

a. টীকা লিখুন ঃ

(i) জিন পুল, (ii) জিন ফ্রিকোয়েন্সি, (iii) মেন্ডেলিয়ান পপুলেশন।

b. বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণ তত্ত্ব কাকে বলে?

c. জিন-ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন দ্বারা কী সূচিত হয়?

9.3 প্রকরণ এবং প্রকরণের উৎপত্তি

কোন পপুলেশন বা সমষ্টির বিভিন্ন সভ্যের মধ্যে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে যে গুণগত (Qualitative) বা মাত্রাগত (Quantitative) পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাকে সাধারণভাবে প্রকরণ (variation) বলা হয়। এই ধরনের প্রকরণ আনবিক, কোষীয় বা জীবিয় স্তরে হতেপারে। প্রকরণগুলি জিন নিয়ন্ত্রিত বা পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত অথবা উভয় শর্তধারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। বিবর্তনের রসদ হিসাবে জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতিক্ষম (Heritable) প্রকরণগুলিই বিশেষভাবে বিবেচ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে একই পপুলেশনের একটি গাছ অন্যদের তুলনায় লম্বা হওয়ায় অন্যের ছায়ায় হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি অপত্য সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু গাছের এই বৈশিষ্ট্যটি (দীর্ঘত্ব) যদি জিন নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয় (অর্থাৎ, অন্যদের তুলনায় উপযুক্ত সার ও পরিচর্যা পাওয়ার ফলে গাছটি লম্বা হলেও পরবর্তী প্রজন্ম খর্ব আকৃতির হয়) তা'হলে এই প্রকরণটি বিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

এখানে আমরা জিন নিয়ন্ত্রিত প্রকরণ এবং তার উৎপত্তির বিষয়টি আলোচনা করবো।

কোন পপুলেশনে নতুন জিনি নিয়ন্ত্রিত প্রকরম সৃষ্টির মূলে প্রধানতঃ পরিব্যক্তি (Mutation) এবং পুনঃসংযুক্তি (Recombination) কেই দায়ি করা হয়।

জিন পরিব্যক্তি (Gene mutation) এবং ক্রোমোজোম পরিব্যক্তির (chromosome mutation) ফলে পপুলেশনের জিন পুলে (Gene pool) নতুন জিন এবং পরিবর্তিত জিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যাবলীর সমাবেশ ঘটে। পুনঃসংযুক্তি বা রিকম্বিনেশন দ্বারা পরিব্যক্তি ঘটিত বৈশিষ্ট্যগুলি পপুলেশনের জিন পুলে বিস্তার লাভ করে।

জিন কিভাবে বিভিন্ন প্রকরণ সৃষ্টির মূলে কাজ করে, তা নিম্নের উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন। দুটি জিন (a_1a_2) এবং (b_1b_2) এর অ্যালিলগুলির বিভিন্ন সমাবেশের ফলে এক ধরনের টিয়া পাখির নিম্নলিখিত নানা বর্ণের গাত্র-পালক (Plumage) সম্পর্কিত প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

জিনোটাইপ	গাত্র পালকের বর্ণ
● $a_1\ a_1\ b_2\ b_2$	নীল
● $a_2\ a_2\ b_1\ b_1$	হলুদ
● $a_1\ a_2\ b_1\ b_2$	সবুজ
● $a_2\ a_2\ b_2\ b_2$	সাদা

- $a_2\ a_2\ b_1\ b_2$ ..... হলুদ
- $a_1\ a_2\ b_2\ b_2$ ..... নীল

কোন কোন প্রকরণ একটি জিন গোষ্ঠী দ্বারা (Polygenes) নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, মানুষের ত্বকের বর্ণ। ত্বকের বর্ণের জন্য দায়ী জিনগুলি প্রায় 136 ধরনের জিনোটাইপ সংগঠন করে।

মানুষের রক্তের শ্রেণী (Blood group) একাধিক অ্যালিল দ্বারা (Multiple alleles) নিয়ন্ত্রিত হয়। রক্তের বর্ণের জন্য দায়ী জিনগুলি প্রায় 136 ধরনের জিনোটাইপ সংগঠন করে।

মানুষের রক্তের শ্রেণী (Blood group) একাধিক অ্যালীল দ্বারা (Multiple alleles) নিয়ন্ত্রিত হয়। রক্তের বিভিন্ন শ্রেণী ও তাদের জিনোটাইপ নিম্নে প্রদর্শিত হল।

জিনোটাইপ	গাত্র পালকের বর্ণ
AB	$a_1\ a_2$
B	$a_2\ a_2$ / $a_2\ a_2$
A	$a_1\ a_1$ / $a_1\ a_3$
O	$a_3\ a_3$

আবার কিছু জিন একত্রে একাধিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই ধরনের জিন নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় প্লিওট্রপিজম (Pleiotropism)। ড্রসোফিলার লুপ্তপ্রায় ডানার জন্য দায়ী অ্যালীল এই মাছির অন্যান্য কতগুলি বৈশিষ্ট্য, যেমন—ভারসাম্যাবস্থা, দেহের বিভিন্ন রোমের বৈশিষ্ট্য এবং ডিম্বানু ও শুক্রানু উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদিকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্রোমোজোম পরিব্যক্তির (Chromosomal mutation) ফলে নতুন কোন জিনের আবির্ভাব হয় না কিন্তু পরিবর্তিত জিন সমাবেশের ফলে বিভিন্ন প্রকরণগুলি প্রভাবিত হয়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে জিন নিয়ন্ত্রিত প্রকরণগুলি নানা পরিবেশে হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা পরিবর্তনকারী বিভিন্ন শর্তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জিন-ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তন সূচিত করে।

অনুশীলনী—2

a. প্রকরণ কী?
b. কী ধরনের প্রকরণ মূলতঃ বিবর্তনের রসদ হিসাবে বিবেচিত হয়?
c. প্লিওট্রপিজম্ কী?
d. কী কী ধরনের পরিব্যক্তির ফলে প্রকরণ সৃষ্টি হয়?

9.4 হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা

আমরা আগেই আলোচনা করেছি পপুলেশনের জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের দ্বারাই বিবর্তনের সূচনা পর্ব ঘোষিত হয়। হার্ডি (G.H. Hardy, 1908) এবং ওয়েনবার্গ (W. Weinberg, 1908) জিন ফ্রিকোয়েন্সির এবং জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সির সাম্যবস্থা এবং পরস্পরের সম্বন্ধ সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বটিকে হার্ডি-ওয়েনবার্গের নীতি (Hardy-Weinberg principle or law) বা সাম্যাবস্থা বলা হয়।

এই তত্ত্বের মূল বিষয়টি হল কোন পপুলেশনের জিন ফ্রিকোয়েন্সির এবং জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি বংশ পরম্পরায় একই থাকে, যদি—

- পপুলেশনটি অত্যন্ত বড় মাপের হয়।
- পপুলেশনের বিপরীত লিঙ্গের (স্ত্রী ও পুরুষ) সব সভ্যদের মধ্যে সঙ্গম ব্যবস্থা সমসম্ভবনাময় (Panmixia or Random mating) হয়।
- পরিব্যক্তি (Mutation) প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection), জিন বিনিময় ব্যবস্থা (Gene flow), অসম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থা (Non Random Mating), জেনেটিক ড্রিফট্ (Genetic drift) ইত্যাদি বিষয়গুলি পপুলেশনে কার্যকরী না থাকে।

এই তত্ত্বের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—

কোন পপুলেশনের একটি প্রজন্মের জিন ফ্রিকোয়েন্সি তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের জিন-ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করে কিন্তু কোনও ভাবে জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করে না।

সম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট কোন পপুলেশনের জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে সেই পপুলেশনের জিন ফ্রিকোয়েন্সির উপর।

পূর্বের ফিলাইল থায়োকার্বামাইড আস্বাদন সংক্রান্ত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরুন একটি দ্বীপে 45 (TT) : 30(Tt) : 25(tt) অনুপাতে উভয় লিঙ্গের একটি বিরাট পপুলেশন রাখা হল, যেখানে T এবং t জিন ফ্রিকোয়েন্সি যথাক্রমে ·60(T) এবং ·40(t)। সম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে বিভিন্ন ফলাফলগুলি 1 নং সারণীতে দেখানো হলো। 1 নং সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা পরিবর্তনকারী শর্তের অনুপস্থিতিতে সম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থায় পরবর্তী প্রজন্মের জেনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু জিন ফ্রিকোয়েন্সির কোনরূপ পরিবর্তন হয় নি। পরের প্রজন্মে দেখা যাবে জিন ফ্রিকোয়েন্সি এক থাকায় জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সিও স্থিতাবস্থালাভ করবে।

হার্ডি-ওয়েনবার্গ নীতি অনুযায়ী জিন ফ্রিকোয়েন্সি এবং জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সির সম্পর্ককে বীজগাণিতিক শর্ত সাপেক্ষে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

যদি সম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থায় কোন পপুলেশনে 'P' কোন একটি নির্দিষ্ট জিনের ফ্রিকোয়েন্সি হয়, তা'হলে 'q' হলো ঐ জিনের অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সির এবং p+q=1 (অর্থাৎ ধরা যাক, এখানে আর কোন অ্যালিল নেই)। সম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থায় p এবং q জিন ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা সৃষ্ট জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সির অবস্থা নিচের 2 নং সারণীর চেকার বোর্ডে বিন্যাস করা হলো।

সারণী—1

ফিনাইল থায়োকার্বামাইড আস্বাদন সংক্রান্ত জিনের (সম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থায়) জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি এবং জিন ফ্রিকোয়েন্সির সম্পর্ক (জিন ফ্রিকোয়েন্সি; T=.60, t=.40 এবং জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি; TT=.45, Tt=.30, tt=.25)

	পুরুষ		
স্ত্রী	TT = ·45	Tt = ·30	tt = ·25
TT = ·45	·2025 **(1)**	·1350 **(2)**	·1125 **(3)**
Tt = ·30	·1350 **(4)**	·0900 **(5)**	·0750 **(6)**
tt = ·25	·1125 **(7)**	·0750 **(8)**	·0625 **(9)**

জনিতৃ (Parents) **অপত্য (offspring)**
(জিনোটাইপের ফ্রিকোয়েন্সি)

বিভিন্ন জিনোটাইপের সঙ্গম ব্যবস্থা	উপরের ছকের বক্স নং	সঙ্গমের ফ্রিকোয়েন্সি	TT	Tt	tt
TT × TT	(1)	= ·2025	·2025		
TT × Tt	(2)+(4)	= ·2700	·1350	·1350	
TT × tt	(3)+(7)	= ·2250		·2250	
Tt × Tt	(5)	= ·0900	·0225	·0450	·0225
Tt × tt	(6)+(8)	= ·1500		·0750	·0750
tt × tt	(9)	= ·0625			·0625
	মোট	1·0000	·3600	·4800	·1600

অপত্যগুলির মধ্যে ফিনাইল থায়োকার্বামাইড আস্বাদন সংক্রান্ত জিনের ফ্রিকোয়েন্সি ঃ

T = ·36 (TT) + ½ × ·48 (Tt) = ·45 + ·15 = ·60

t = ·16 (tt) + ½ × ·48 (Tt) = ·25 + ·15 = ·40

মোট = 1.00

সারণী—2 ঃ p এবং q জিন ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা সমসম্ভবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থায় সৃষ্ট মোট জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি।

	p	q
p	p^2	pq
q	pq	q^2

অর্থাৎ, মোট জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি = $p^2 + 2pq + q^2$

2 নং সারণী থেকে প্রাপ্ত p এবং q জিন ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা সৃষ্ট মোট জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি হলো $p^2+2pq+q^2$।

একই ফল আমরা p এবং q এর বীজগাণিতিক দ্বি-রাশির প্রসারণ (Binomial expansion) $(p+q)^2=p^2+2pq+q^2$ দ্বারাও পাই। অর্থাৎ, জিন ফ্রিকোয়েন্সির স্থিবস্থা জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সির স্থিতাবস্থাকে সরাসরি প্রজন্মক্রমে নিয়ন্ত্রণ করে।

অনুশীলনী—3

a. হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা কী?

b. হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থাকে পরিবর্তনকারী শর্তগুলির নাম লিখুন।

c. জিন ফ্রিকোয়েন্সি এবং জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সির সম্পর্কটি বীজগাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করুন।

9.5(a) পরিব্যক্তি ও বিবর্তন

মিউটেশনের হার — অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ মিউটেশন ফ্রিকোয়েন্সির (পরিবর্তনের বা হারের) ওপর নির্ভর করে। এটি বাস্তবিক ঘটনা যে একটি মাত্র প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অ্যালিল যে ভাবে ক্রিয়া করে তার থেকে কো-ডমিনেন্স এবং লিঙ্কেজ অবস্থায় যে সব অ্যালিল বিচরণ করে তার প্রভাব প্রকৃতিতে আনুপাতিক ভাবে বেশী পরিলক্ষিত হয়।

বেশীরভাগ পরিব্যক্তি সরলভাবে একটি অ্যালিল থেকে অন্য অ্যালিলে পরিবর্তিত হয় না, সমষ্টিগতভাবে একত্রিত হয়ে নতুনভাবে নিওক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমে পরিলক্ষিত হয়।

স্থায়ী পপুলেশনে ভ্রূণের অনক্রমসজ্জা (heterozygosity) এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যে প্রকৃত ধারা ও নতুন অ্যালিলে তা প্রকাশ পায়। ধরা যাক্ যদি অ্যালিল 'A'-তে ক্রমাগত পরিব্যক্তি হয়ে অ্যালিল 'a' হয়, তাহলে প্রতিটি প্রজন্মে 'a' অ্যালিল ফ্রিকোন্সির বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘ সময়কালে একটি স্থায়ী পরিব্যক্তির হার একটি স্থায়ী পপুলেশনে 'A' অ্যালিলের স্থানকে 'a' অ্যালিল পরিবর্তিত রূপে অবস্থান করবে। যদিও পরিব্যক্তির গতি একই দিকে যায় না; বিশেষতঃ যখন অনেকগুলি অ্যালিলকে বিবেচনা করা হয়।

u কে যদি পরিব্যক্তি হার ধরা হয় 'A' অ্যালিল থেকে 'a' অ্যালিলের জন্য, 'a' অ্যালিল আবারও পরিব্যক্তি হতে পারে, 'A' অ্যালিল-এ যার ফ্রিয়োয়েন্সি হল v.। এই পরিবর্তিত অবস্থা কে যদি পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখি যে,

প্রারম্ভিক ফ্রিকোয়েন্সি A এবং a-এর যথাক্রমে $p_0 \propto q_0$.

একটি মাত্র জনুর পরিব্যক্তির ফলে যে ফ্রিকোয়েন্সি আমরা পাবো

$A = p_0 + vq_0$.

$a = q_0 + up_0$.

বিবেচনাটি একটি মাত্র অ্যালিলকে ধরলে দেখতে পাই 'a' বৃদ্ধি পেয়ে ফ্রাকশন up_0 (নতুন a অ্যালিল) হয় 'A' অ্যালিলটি ফ্র্যাকশন vq_0 হারে হারিয়ে যায়।

অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে—

পরিবর্তিত ফ্রিকোয়েন্সি 'a' অ্যালিলটির যাকে আমরা Δq বলি সেটা এইভাবে প্রকাশিত হতে পারে $\Delta q = up_0 - vq_0$. যদি P বৃহৎ এবং q ক্ষুদ্র হয়।

যখন Δq বৃহৎ হবে এবং q বৃদ্ধি পেতে পারে। যখন q বৃহৎ ভাবে দেখা দেয় এবং P ক্ষুদ্র ভাবে থাকে, Δq লুপ্ত হয়ে যাবে। যখন এমন অবস্থা আনবে যে $\Delta q = 0$ (শূন্য) তখন বোঝা যাবে যে আর কোন পরিবর্তন P a q-তে হবে না, ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে তাদের পরিব্যক্তির আপেক্ষে। সেই অবস্থাকে পরিব্যক্তির ভারসাম্য বা mutational equilibrium বলা হয় (ফ্রিকোয়েন্সি a = $\hat{q}$, or 'q^{hat}')

$\Delta q = 0 = up - vq$

or, $up = vq$ at $\hat{q}$

যেহেতু দুটি মাত্র অ্যালিল A এবং a ধরা হয়েছে

$p = 1 - q$ ($\because p + q = 1$)

এরূপ বলা যেতে পারে,

$up = vq$

$u(1-q) = vq$

$u = uq + vq = q(u + v)$

$\hat{q} = \frac{u}{u+v}$

একইরকম ভাবে A ফ্রিকোয়েন্সি — $p = \frac{v}{u+v}$

অতএব, $p/q = [v/(u+v)]/u/(u+v)] = v/u$

যখন পরিব্যক্তির হার দুটি অ্যালিলেরই সমান ($u = v$), জীন ফ্রিকোয়েন্সির ভারসাম্য p এবং $\hat{q}$ সমান হবে। এর পরিবর্তন হলে ভারসাম্য ফ্রিকোয়েন্সিরও পরিবর্তন হবে। পরিলক্ষিত পরিব্যক্তির হারের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে সাধারণত পরিব্যক্তির হার 5×10^{-5} অথবা তারও কম। ভারসাম্যের প্রতি সরে যাওয়ার প্রবণতা কম এবং এতটাই কম যে ভারসাম্যে কখনোই পৌঁছনো যাবে না কারণ পরিব্যক্তি কখনোই একই হারে থাকে না।

একই পপুলেশনে কোন পরিব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট হারে এবং প্রজন্মক্রমে ক্রমান্বয়ে হতে থাকে তা'হলে এই পপুলেশনের জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে অবশ্যই পরিব্যক্তিগুলি ক্ষতিকারক না হয়ে সাহায্যকারী প্রকৃতির হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জিয়া (zea) জাতীয় ভুট্টার অনেকগুলি পরিব্যক্তি হার জানা গেছে। এর মধ্যে বীজের রঙের পরিব্যক্তির হার প্রতি এক মিলিয়ন জননকোষে 492। বীজের রঙের জন্য দায়ী জিনের সমসংস্থ (Homozygous) জিনোটাইপ যুক্ত কল্পিত পপুলেশনে প্রাথমিকভাবে পরিব্যক্তির হারের প্রভাব নিম্নলিখিত উপায়ে গণনা করা যেতে পারে।

$\Delta p = \mu p$

Δp = জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের হার, এবং μ = পরিব্যক্তির হার। প্রথম প্রজন্মে পরিব্যক্তির ফলে জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন $q = \Delta p = -(0.492\times10\text{-}4)\times1$

$=0.0000492$

সমসংস্থ (Homozygous) পপুলেশন হওয়ায় বীজের রঙের জন্য সমস্ত জিনের (a) ফ্রিকোয়েন্সি p=1; কিন্তু পরিব্যক্তির ফলে (a—a1) সৃষ্ট a1 জিনের ফ্রিকোয়েন্সিব (q) = 0.0000492। অর্থাৎ a জিনের ফ্রিকোয়েন্সি P=(1-0.0000492 = 0.9999508। এইভাবে পরিব্যক্তি নিরবিচ্ছিন্নভাবে একই অভিমুখে চলতে থাকলে সমস্ত a1 পপুলেশনের সমসংস্থ অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত a র জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন চলতেই থাকবে। কিন্তু বাস্তবে পরিবর্ত পরিব্যক্তি (Reverse mutation) এবং অন্যান্য প্রতিরোধী শর্ত কার্যকরী থাকায় পরিব্যক্তি দ্বারা প্রকরণ সৃষ্টি ছাড়া বিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিব্যক্তির বাস্তব তেমন কোন প্রভাব থাকে না।

9.5(b) পরিস্ফুরণ ও বিবর্তন (Development and Evolution)

বহুরূপিতা সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক ভাবে পরিস্ফুরণের সময়েই। জিনের প্রকাশের তারতম্য বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বহিরাকৃতির নানা পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে পরিস্ফুরণের সময় নানারকম ভাবেই জিনের আণবিক স্তরে পরিবর্তন হয়। এর ফলে বিচ্ছিন্নভাবে বহিরাকৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। এই পরিবর্তনের জন্য যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল জিনের সজ্জা গঠন। জিনের আণবিক স্তরে সংখ্যায়, বিস্তার এবং পুনরাবৃত্তির ধারা এর জন্য দায়ী।

বিবর্তনে কিছু পরিবর্তন দেখা যায় যখন পূর্বপুরুষের ক্ষেত্রে যে ভাবে জিন নিয়ন্ত্রণ হতো, তার থেকে অন্যরকম অবস্থার জন্য।

যে জিনটি কোশ নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরী করে তাকে বলা হয় এফেক্টর জিন (effector gene), যেটিকে নিয়ন্ত্রণ করে অপর একটি জিন যাকে বলা হয় রেগুরেটরি জিন (regulatory gene), এই জিনের প্রকাশকে যদিও নিয়ন্ত্রিত করে পূর্বপুরুষদের কার্যক্রম অনুসারে। বিভিন্ন গবেষণার ফলে বিবর্তনে পরিস্ফুরণের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যকে উন্মোচিত করথে।

হকস জিনস্ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রকারী জিন (Hox genes & other Regulatory genes) ঃ

পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ একটি নিষিক্ত ডিম থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি হওয়ার অধ্যায়কে কোশকে বিভাজিত করা এবং সেই কোশগুলির মধ্যে বিভিন্ন গুণ সমন্বিত করা।

Drosophila melanogaster মাছিটিকে গবেষণাগারে বহুভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্বাভাবিক মাছির মধ্যে বাইথোরাক্স কমপ্লেক্স (Bithorax complex)-এ অনেকগুলো জিন থাকে, তাদের প্রকৃতি হল হোমেওটিক (homeotic) অর্থাৎ এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে খণ্ড খণ্ড ভাবে এবং সেগুলো স্বাভাবিক স্থান ছাড়াও অন্যস্থানে কাজ করতে পারে। যেটা স্বাভাবিক প্রাণীর থেকে অন্যরকম হয়।

পরিব্যক্ত জিনটি তৃতীয় বক্ষ উপাঙ্গটিকে পরিবর্তন করে দ্বিতীয় বক্ষ উপাঙ্গের মত আকার দিতে পারে। হল্টেয়ার (মেটাথোরাসিকে দেখা যায়) অঙ্গাণুটি অন্য সব পতঙ্গের নিচের জোড়া পাখনার পরিবর্তিত রূপ।

আদি বংশধারার কতগুলো জিনের নিয়ন্ত্রণ অন্য কতগুলো নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধরা যাক সম্মুখভাগ ও পশ্চাদভাগের (anterior to posterior) পার্থক্য নির্দ্ধারণ করার প্রক্রিয়া (A–P)। হোমেওটিক নির্বাচনকারী জিনগুলি (homeotic selector genes) প্রধান সুইচের কাজ করে, প্রতিটি খণ্ডে (segment) অনেকগুলি জিনকে কাজ করার নির্দেশ দেয়, এইভাবে পাখনা, পা এবং জেনিটালিয়ার মধ্যে কাজ হয়। বাইথোরাক্স

জিন (bx) পরিবর্তন করে তৃতীয় বক্ষ উপাঙ্গ (T_3)-কে যার মধ্যে হল্টোয়ার থাকে। পরিবর্তিত হয় দ্বিতীয় বক্ষ-উপাঙ্গ (T_2) যেটির মধ্যে ডানা থাকে। অন্য একটি জিনের পরিব্যক্তি হয় সেই একই জায়গায়, Ubx পরিবর্তন করে T_3 ও A1 (The first abdominal segment)-কে T_2-র মত খণ্ডকে। বিশেষ অংশের ঘাটতি একই ফলাফল দেয়। সুতরাং bx এবং ubx কার্যকারিতা অক্ষম করার পরিব্যক্তি। যেহেতু T_2 স্বাভাবিক থাকে bx এবং ubx মাছিগুলিতে, কিন্তু T_3 এবং A1-র পরিবর্তন হয়ে যায়। T_2-র বহিরাকৃতি 'default state'-এ থাকে যার স্বাভাবিক bx অথবা ubx এর স্বাভাবিক কার্যক্রমের প্রয়োজন থাকে না কারণ T_3 এবং A1 জিনটি সেই কাজ করে থাকে।

ড্রোসোফিলার এইরকম আটটি (8) হোমোয়েটিক জিন আছে যেগুলি দেহের সবরকম খণ্ডকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ubx জিন থেকে 85–170 টারগেট জিনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় (Carroll 1995)। হোমিওটিক জিনগুলি সম্মুখভাগ ও পশ্চাদভাগের গঠনের নকশাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয় হকস জিন (Hox genes)।

এই হকস জিনের বিভিন্ন কার্যক্রম নতুনভাবে প্রজাতির বাহ্যিক চরিত্রের প্রকরণ ঘটায় এবং বিবর্তনে সাহায্য করে। হকস জিন নিডারিয়া থেকে কর্ডাটা সব কয়টি পর্বেই থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ডিএনএ সজ্জাক্রমের ভিত্তিতে ১৩টি বিভিন্ন প্রকার হক্স জিনস্ দেখতে পাওয়া যায়।

9.6 প্রাকৃতিক নির্বাচন ও বিবর্তন

ডারউইনের বিবর্তনবাদের অন্যতম অবদান হল বিবর্তনের চালিকা শক্তি হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের অবতারণা। এই বিষয়টি ডারউইনের বিবর্তনবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে একক-8 অংশে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ডারউইন-এর প্রাকৃতিক নির্বাচন যোগ্যতম জীবটিকে নির্বাচিত করে (Survival of the fittest) অর্থাৎ ইহা সমগ্র পপুলেশন পর্যায়ে কাজ না করে একক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। কিন্তু আধুনিক ধারনা অনুযায়ী প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপাদানটিকে অবশ্যই সমগ্র পপুলেশন পর্যায়ে কার্যকরী হতে হবে এবং এক্ষেত্রে "যোগ্যতম (fittest)" বলতে কোন জিনোটাইপের প্রজননগত সাফল্যের যোগ্যতা বোঝায়।

নির্বাচন ও যোগ্যতা — ডারউইনের মতবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিব্যক্তির তুলনায় জিন ফ্রিকোয়েন্সির ধারাবাহিকতাই যোগ্যতা নিরূপণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে এটিকে কিভাবে বিবেচনা করা যাবে বাহ্যিক না মৌলিক গুণাবলীর আধারে।

বিবর্তনের প্রকাশ বাহ্যিক চরিত্রের মাধ্যমে হয় এবং গুণাবলীর পরিবর্তন জনুক্রমে সঞ্চারিত হয় এটি প্রত্যক্ষ ভাবে সঞ্চালিত হতে পারে, পরোক্ষভাবেও হতে পারে।

নির্বাচনে কে বলা যেতে পারে প্রজননগত সক্ষম বাহ্যিক চরিত্রে (গুণাবলী) পরিস্ফুট হয়ে প্রাণীজগতে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করার কার্যক্রম। জীবিত গোষ্ঠী এমনভাবে বেঁচে থাকবে যে সেই অর্জিত গুণাবলী পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চাতির হবে একই পরিবেশে তার অনুপাত অন্য প্রাণীর নিরিখে যে পরিমাণে

দৃশ্যমান হয় তাকেই বলা হয় আপেক্ষিক যোগ্যতা বা Relative fitness. সহজভাবে বলা যেতে পারে একটি গতিশীল যোগ্যতাকে নির্ণয় করা হবে আপেক্ষিক যোগ্যতার উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে যেখানে প্রজননের সীমাবদ্ধতা থাকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র পপুলেশনে। নির্বাচন ও যোগ্যতাকে তাই পরিমাপ করা যেতে পারে পরবর্তী জনুতে একটি জিনোটাইপ অন্য জিনোটাইপের তুলনায় কত পরিমাণে সফল ভাবে সঞ্চারিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ যদি 'A' জিনোটাইপ পরবর্তী প্রজন্মে 100টিতে দেখা যায় যেগুলির প্রজনন ক্ষমতা আছে, তেমনই 'B' জিনোটাইপ মাত্র 90টিতে সঞ্চারিত হয়েছে। তাহলে আপেক্ষিক যোগ্যতা B-র 'A'-র নিরিখে 10টি কম থকাছে। অর্থাৎ 10/100 = .1

যদি আমরা আপেক্ষিক যোগ্যতাকে W এবং যোগ্যতাকে প্রভাবিত করার শক্তিকে s ধরি (s - the selection co-efficient) তাহলে বলা যায় W = 1 এবং s = 0 – 'A'-র ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এবং W = .9 ও s = .1 B-ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য।

W এবং s এর সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট জিনোটাইপে এরূপভাবে প্রকাশ পেতে পারে—

W = 1 – s, অথবা s = 1 – W.

যখন নির্বাচনটি হ্যাপ্লয়েড হয় তখন প্রকট ও প্রচ্ছন্নর প্রশ্ন থাকে না কারণ এখানে যে কোন একটি গুণাবলীই প্রকাশ পায়। এটাই প্রত্যাশিত যে নির্বাচনের প্রভাব দ্রুত হারে বোঝা যাবে হ্যাপ্লয়েডের ক্ষেত্রে। বেশীর ভাগ উদ্ভিদ ও প্রাণী নির্বাচন পদ্ধতি কার্যকরী হয় ডিপ্লয়েড, ভ্রূণ বা ভ্রূণের পরবর্তী অধ্যায়ে।

ডিপ্লয়েড-এ তিনরকম ভাবে জিনোটাইপ প্রকাশিত হতে পারে যেমন AA, Aa, aa. এখানে কোন জিনোটাইপে প্রকট রূপে প্রভাবিত করার কার্যক্রমই নির্বাচনের কাজ করবে। অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন (Δq) – a অ্যালিল (allele) একটি জনুক্রমে কতটা সফল সেটা শুধুমাত্র aa ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য।

নির্বাচন ক্ষেত্রের পরিবর্তন হতে পারে যখন প্রকট অ্যালিল নির্বাচিত হয় বিপরীত ভাবে এবং প্রচ্ছন্ন অ্যালিল প্রার্দুভাব ঘটে। এইক্ষেত্রে নির্বাচন বেশী রকমের কার্যকরী হয় কারণ প্রকট অ্যালিলের যোগ্যতা কমে আসে অন্য সব জিনোটাইপের প্রেক্ষিতে। যখন ঐ অ্যালিলটি লেথাল (lethal) হয় তখন তার ফ্রিকোয়েন্সিটা শূন্যে পর্যবসিত হয় একটি জনুর ক্ষেত্রে যদিও প্রকট অ্যালিলের এরকম হ্রাসপ্রাপ্তি এবং তার স্থানে প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের বৃদ্ধি খুবই নিম্ন হারেই ঘটে। এইভাবে প্রকট অ্যালিল যার ফ্রিকোয়েন্সি p একটি পরিবর্তিত সমীকরণ ঘটায় —

$-sp(1-P)^2/[1-sp(2-P)]$

লক্ষণীয় যে, যখন s এর মান ক্ষুদ্র এটি 1 এর কাছাকাছি মানে থাকে, এবং Δp সমতা রক্ষা করে $-sP(1-P)^2$. কারণ 1–P হচ্ছে q এবং P হচ্ছে 1–q. অর্থাৎ

Δp এখন – $sq^2(1-q)$ অথবা

Δp ও Δq একই রকম পরিসংখ্যান দেখায় যখন প্রচ্ছন্ন অ্যালিলটি নির্বাচন গুণাঙ্ক (selection coefficient) যখন যোগ্যতর অ্যালিলের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অসম্পূর্ণ, ভিন্ন ভ্রূণ ক্ষমতাসম্পন্নর

যোগ্যতাহ্রাসের ফল প্রকাশ প্রায় পারণ ভিন্ন ভ্রূণ ক্ষমতা সম্পন্নর বাহ্যিক চরিত্র আংশিক ভাবে হলেও এটার কার্যকারিতা দেখা যায়।

যদি এমন উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে কোন অ্যালিলেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না তখন অনক্রমসজ্জাপ্রণে প্রশ্নে দুটি সমক্রমসজ্জাপ্রণের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা দেখা যায়। এদের নির্বাচন গুণাঙ্ক যোগ্যতা হ্রাস প্রাপ্ত সমক্রমসজ্জাভ্রূণের অর্দ্ধেক পরিমাণে হবে। সমীকরণটি এরূপ হবে—

$$\frac{[(1) + (1-2s)]}{2} = \frac{1}{2} + (-s) = 1-s$$

সারণী 3

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রচ্ছন্ন জিনের জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন গণনা (Δq). প্রাথমিক জিন ফ্রিকোয়েন্সি = P (প্রকট জিন A) এবং q (প্রচ্ছন্ন জিন a)

	জিনোটাইপ			Total	ফ্রিকোয়েন্সি (a)-র ক্ষেত্রে
	AA	Aa	aa		
প্রাথমিক জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি	P^2	2pq	q^2	1	q
আপেক্ষিক যোগ্যতা W	1	1	1–s		
নির্বাচনের পর জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি	P^2	2Pq	$q^2(1-s)$	$P^2+2Pq+q^2-sq^2$ $=1-sq^2$ [(P+q=1) $(P+q)^2=1^2=1$] a ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি=q	
নির্বাচনের পর আপেক্ষিক ফ্রিকোয়েন্সি	$\frac{P^2}{1-Sq^2}$	$\frac{2pq}{1-sq^2}$	$\frac{q^2(1-s)}{1-sq^2}$	$\frac{1}{2}\left[\frac{2pq}{1-sq^2}\right] + \frac{q^2(1-S)}{1-Sq^2}$ $= \frac{pq}{1-Sq^2} + \frac{q^2(1-S)}{1-Sq^2}$ $= \frac{Pq + q^2(1-S)}{1-Sq^2}$	

$$\therefore \frac{pq + q^2(1-S)}{1-sq^2} = \frac{pq + q^2 - q^2s}{1-sq^2} = \frac{q(p+q) - qs}{1-sq^2} = \frac{q(1-qs)}{1-sq^2} \quad \text{[কারণ, } p+q=1\text{]}$$

$$= \frac{q(1-Sq)}{1-sq^2}$$

Δq = নির্বাচনের পরে 'a'-র আপেক্ষিক ফ্রিকোয়েন্সি – 'a'-র প্রারম্ভিক ফ্রিকোয়েন্সি

উপরের ছকের প্রাপ্ত মান অনুসারে

$$\Delta q = \frac{q(1-sq)}{1-sq^2} - q$$

$$= \frac{q(1-sq) - q(1-Sq^2)}{1-sq^2}$$

$$= \frac{q - sq^2 - q + Sq^3}{1-sq^2}$$

$$= \frac{-Sq^2 + Sq^3}{1-sq^2} = \frac{-sq^2(1-q)}{1-sq^2}$$

ধরা যাক্ নির্বাচন গুণাঙ্ক s = 0.02. এটি প্রচ্ছন্ন জিনোটাইপ aa-র উপর কার্যকরী। AA ও aa জিনোটাইপের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপেক্ষিক যোগ্যতা W=1. অতএব aa জিনোটাইপের অভিযোজন যোগ্যতা হবে (1–0.02) = 0.98 (যেহেতু s=0.02).

তাহলে জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের হার Δq মান হবে এইরূপ—

$$\Delta q = \frac{-(02)(.1)^2(1-1)}{1-(.02)(.1)^2} = -0.00018 \; (\because S = 0.02, q = 0.1)$$

9.7 জীন পরিযান (Gene flow) বা বিনিময় ও বিবর্তন

পরিব্যক্তিই শুধুমাত্র জিন পরিবর্তন বা জিন বিনিময় ঘটায় না। একটি পপুলেশনে অন্য জিন যুক্ত হতে পারে যদি সেই পপুলেশনের কাছাকাছি চরিত্র বিশিষ্ট ভিন্ন অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি আছে সেই পপুলেশন থেকেও জিনের আগমন ঘটে। যখন এরূপ ঘটে তখন অন্তত তিনটি ফ্যাক্টর খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রহীতা পপুলেশনের কাছে।

1. দুটি পপুলেশনের মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সির প্রভেদ থাকবে।
2. যে পরিমাণ জিন মাইগ্রেশন করে যাবে সেগুলি প্রতিটি জনুতে অন্তর্ভূক্ত হবে।
3. জিন পরিযানের এই ধারা কখনো একবার বা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে।

মনে করি q_0 = পপুলেশনটির প্রারম্ভিক জিন ফ্রিকোয়েন্সি

Q = আগমনকারী পপুলেশনের সেই একই জিনের অ্যালিলটির ফ্রিকোয়েন্সি।

m = নতুনভাবে যে জিন অন্তর্ভূক্ত হলো প্রতি জনুতে তার ফ্রিকোয়েন্সি।

গ্রহীতা পপুলেশনে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পাবে $-q_0$ হারে যেটি mq_0-র সমান

$\therefore q_0 = mq_0$ তেমনি Q সমান হবে mQ

$\therefore Q = mq$

n জেনেরেশন বাদে জিন ফ্রিকোয়েন্সি গ্রহীতা পপুলেশনে হবে qn

∴ আমরা এইভাবে সূত্রটি প্রকাশ করতে পারি যে,

$qn - Q = (1-m)^n (q_0 - Q)$

$$\text{or } (1-m)_n = \frac{qn-Q}{qo-Q}$$

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

মানব সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে বিবাহ হয়। তার জন্য স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বহনকারী জিনের আদান প্রদান হয় যা বাহ্যিক ভাবে বা গুণগত ভাবে অর্থাৎ জিনের অ্যালিলে প্রকাশ পায়। আরও ভালো করে বোঝা যাচ্ছে কারণ DNA সজ্জারীতি জেনে এর ব্যাখ্যা আরও আণবিক স্তরেও দেওয়া যেতে পারে।

আফ্রিকান আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান আমেরিকান এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জিনের আদান প্রদানের হার একটা সমীক্ষায় Para et. al (1998) দেখিয়েছেন যে, আফ্রিকান ও ইউরোপীয়ার আমেরিকানদের মধ্যে জিনের আদানপ্রদানের হারকে ব্যাখ্যা করার জন্য 9টি আটোসোমাল DNA মার্কার নেওয়া হয়েছে ইউরোপীয়ানদের ক্ষেত্রে, এবং 10টি পপুলেশন দেখা হয়েছে যারা অঅফ্রিকান বংশোদ্ভূত। দেখা গেছে এই জনগোষ্ঠীতে শতকরা 77 থেকে 93 জন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত এই চরিত্র প্রকাশ করছে এবং মাত্র 7 থেকে 23 জনের মধ্যে ইউরোপীয়ান বংশোদ্ভূত এই চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। রক্ত গ্রুপের বিচারেও এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে।

মাইটোকনড্রিয়াল ডিএনএ mtDNA এবং Y অ্যালু (Alu) বহুরূপিতা প্রকাশ করার মার্কার-এর সাহায্যে এটাও পরিলক্ষিত হয়েছে যে ইউরোপীয়ান পুরুষদের থেকেই বেশী জিন প্রবাহিত হয়েছে তুলনামূলকভাবে মহিলাদের থেকে।

কাজেই জিন প্রবাহ নতুন চরিত্রের সংযোজন ঘটাচ্ছে কোন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং যা বিবর্তনে সাহায্য করছে।

মিউটেশন (পরিব্যক্তি) ও সিলেকশানের (নির্বাচনের) ভারসাম্য—প্রাকৃতিক নির্বাচনে পরিব্যক্তি ও নির্বাচনের ভারসাম্য রক্ষা করার জগৎ অনেকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে যেমন পপুলেশনের আকার, অবস্থান, জেনেটিক ড্রিফট ইত্যাদি।

প্রচ্ছন্ন a অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সির (q) পরিবর্তন প্রতি জনুতে পরিলক্ষিত হতে পারে এইভাবে— $\frac{sq^2(1-q)}{1-sq^2}$ যদি s ক্ষুদ্র হয়, আমরা (denomination) 1 ধরি, ফ্রিকোয়েন্সির হার কমে যাবে তখন $sq^2(1-q)$. নতুন পরিব্যক্ত 'a' অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি 'A' থেকে 'a' হবার ফ্রিকোয়েন্সির (u) সমান হবে। 'A' থেকে 'a' ফ্রিকোয়েন্সর হারকে A-র ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে গুণ করতে হবে যেটার মান 1–q.

নির্বাচনের ক্ষেত্রে নতুন পরিব্যক্তির সংযোজন বা আগমনের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষার প্রেক্ষিতে 'a' অ্যালিলটির লুপ্ত হবার হার এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

$Sq^2(1-q) = u(1-q)$

$Sq^2 = u$

$$q^2 = \frac{U}{S}$$

$$q = \sqrt{\frac{u}{s}}$$

কাজেই এটা বলা যেতে পারে যে পরিব্যক্তির ফ্রিকোয়েন্সি ও নির্বাচন গুণাঙ্কের কাজ হল একটি পপুলেশনে পরিব্যক্ত অ্যালিলের ভারসাম্য ফ্রিকোয়েন্সি নির্দ্ধারণ করা।

9.8 অসম সম্ভবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থা (Non random mating) ও বিবর্তন

প্রকৃতিস্থ পপুলেশনগুলিতে সঙ্গম ব্যবস্থা সম সম্ভবনাময় (Random) নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই অসম সম্ভবনাময় ও নির্বাচিত। ফলে অসম যৌন নির্বাচনের দ্বারা কিছু জীবের জিনগুলি পরবর্তী প্রজন্মে অন্যদের তুলনায় বর্দ্ধিত হারে সঞ্চারিত হয়। সম সংখ্যক সাদা এবং লাল চোখের ড্রসোফিলা মাছি একত্রে পালন করলে দেখা যাবে প্রায় 25 প্রজন্ম পরে সব সাদা চোখের মাছি অবলুপ্ত হয়েছে। অবলুপ্তির কারণ হিসাবে দেখা গেছে সাদা-লাল চোখ নির্বিশেষে সব স্ত্রী মাছিই লাল চোখের পুরুষ মাছিকে সঙ্গম সঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করে।

9.9 জেনেটিক ড্রিফ্‌ট (Genetic drift); ফাউন্ডার ইফেক্ট (Founder effect) এবং শিশি-গ্রীবাবস্থা (Bottle neck effect) ও বিবর্তন

একটি বড় পপুলেশন কোন কারণে কতগুলি ছোট ছোট উপ-পপুলেশনে (sub populations) বিভক্ত হলে প্রতিটি উপ-পপুলেশনকে মূল পপুলেশনের নমুনা (sample) হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ছোট ছোট বিভক্ত পপুলেশনের জিনপুলগুলি হলো মূল পপুলেশনের জিনপুলের নমুনা। যে কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহের সময় এক ধরনের নমুনা বিপত্তির (Sampling Error) সম্মুখীন হতে হয়। এই ধরনের নমুনা বিপত্তি যথানুপাতিক সমক বিচ্যুতি দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব (Proportionate Standard Deviation)। নমুনার আকার যতই ছোট হতে থাকে যথানুপাতিক সমক বিচ্যুতির সংখ্যাগতমান ততই বাড়তে থাকে। প্রকৃতিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে জিন ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের জন্য দায়ী অন্যান্য শর্তগুলি, যেমন—পরিব্যক্তির হার, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জিন-বিনিময় ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাতিরেকে বিভক্ত ক্ষুদ্র পপুলেশনগুলির জিন ফ্রিকোয়েন্সি মূল পপুলেশনের জিন ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আলাদা হয় এবং বিবর্তন সূচিত হয়। বিবর্তন সূচনাকারী এই প্রক্রিয়াটিকে জেনেটিক ড্রিফ্‌ট (Genetic drift) বা সিওয়াল-রাইট ইফেক্ট (Sewall-wright effect) বলা হয়। জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন বাড়তে অথবা কমতে পারে, তাই এক্ষেত্রে বিবর্তন কোন বিশেষ দিক অভিমুখী (Non directional force) নয়। জিন ফ্রিকোয়েন্সির এই পরিবর্তনকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গননা করা সম্ভব।

Proportionate SD = $\sqrt{\frac{pq}{N}}$

Proportionate SD = যথানুপাতিক স্টান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা যথানুপাতিক সমক বিচ্যুতি।

P = প্রকট জিনের ফ্রিকোয়েন্সি এবং q = প্রচ্ছন্ন জিনের ফ্রিকোয়েন্সি।

N = মোট জনিতৃ (Parents)।

ধরুন একটি বড় পপুলেশনের দুটি অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি $P = q = 0{\cdot}5$। 5,000 জনিতৃর নমুনা পপুলেশনে জিন ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের সম্ভবনা $= \sqrt{(0{\cdot}5)/10{,}000}$ ($\because$ ডিপ্লয়েড পপুলেশনে N সংখ্যক জনিতৃতে 2N সংখ্যক অ্যালিল থাকে। $\therefore$ অ্যালিলের সংখ্যা $5{,}000 \times 2 = 10{,}000$) $= \sqrt{\cdot 000025} = \pm 0{\cdot}005$। অর্থাৎ, নমুনা পপুলেশনে নির্দিষ্ট অ্যালিলের বা জিনের ফ্রিকোয়েন্সি 0·5 এর পরিবর্তে 0·495 অথবা 0·505 হওয়ার সম্ভবনা থাকে। আবার দু'টি মাত্র জনিতৃর একটি নমুনা পপুলেশনে পরিবর্তন খুবই উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ $\sqrt{(0{\cdot}5)(0{\cdot}5)/4} = \sqrt{0{\cdot}625} = \pm 0{\cdot}25$। এক্ষেত্রে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি 0·5 এর পরিবর্তে 0·25 অথবা 0·75 হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

উপরের উদাহরণ থেকে একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট—নমুনার আকার যতই ছোট হবে জিন বা অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির সংখ্যাগত পরিবর্তন ততই উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকবে এবং কয়েক প্রজন্ম এই ঘটনা ঘটতে থাকলে যে কোন একটি অ্যালিল সাম্যাবস্থায় পৌঁছাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হবে।

মূল বড় মাপের পপুলেশন থেকে **অল্প** কয়েকটি জনিতৃ অন্যত্র বসবাস ও প্রজননের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন জিন ফ্রিকোয়েন্সির প্রজন্ম প্রতিষ্ঠা করলে জেনেটিক ড্রিফ্টের এই অবস্থাকে **ফাউন্ডার ইফেক্ট** (Founder effect) বলা হয়।

একটি বড় মাপের পপুলেশন হঠাৎ কোন কারণে কয়েকটি উত্তরাধিকার রেখে অবলুপ্ত হতে পারে। এই স্বল্প উত্তরাধিকার থেকে আবার বড় মাপের সম্পূর্ণ ভিন্ন জিন ফ্রিকোয়েন্সি যুক্ত পপুলেশন সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের ঘটনাকে **শিশি-গ্রীবাবস্থা (Bottle neck effect)** বলা হয় (চিত্র-1)। এক্ষেত্রে জিন-ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের মূলে জেনেটিক ড্রিফটের নীতিই কার্যকরী হয়।

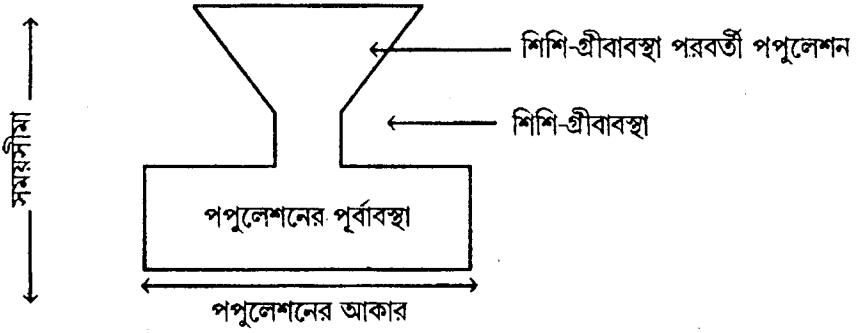

চিত্র-1 ঃ শিশি-গ্রীবাবস্থা

অনুশীলনী—4

a. Δq কী?

b. নির্বাচন গুণাঙ্ক বা সিলেকশন কাফিসিয়েন্ট কাকে বলে?

c. ফাউন্ডার ইফেক্ট কী?

d. শিশি-গ্রীবাবস্থা কাকে বলে?

e. জিন-বিনিময় ব্যবস্থা দ্বারা কিভাবে জিন ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন হয়?

f. Hox gene কি?

9.10 সারাংশ

আধুনিক বিবর্তনবাদের মূল বিষয়টি জেনেটিক্স এবং পপুলেশন জেনেটিক্স নির্ভর। বিবর্তনের একক হিসাবে প্রজাতির বিভিন্ন পপুলেশনকে ধরা হয়। কোন এককজীবের প্রভাব বিবর্তনের বিষয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, পপুলেশনের জিন-ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন দ্বারা বির্বতনের প্রক্রিয়া সূচিত হয়। পরিব্যক্তি ও পুনঃসংযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতিক্ষম প্রকরণগুলিই বিবর্তনের মূল রসদ। পরিব্যক্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জিন-বিনিময় ব্যবস্থা, অসম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থা, জেনেটিক ড্রিফট ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা পপুলেশনের জিন-ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। জিন-ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনকারী শর্ত সমূহ ক্রিয়াশীল না থাকলে প্রজন্মক্রমে জিন ফ্রিকোয়েন্সি এবং জেনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি একই থাকে—পপুলেশনের এই অবস্থাকে বলা হয় হার্ডি-ওয়েনবার্গ সাম্যাবস্থা।

9.11 প্রশ্নাবলী

a. বিবর্তনের আধুনিক ব্যাখ্যার মূল বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করুন।

b. বিবর্তনে প্রকরণের ভূমিকা আলোচনা করুন।

c. প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিষয়টি বিবর্তনের ক্ষেত্রে কিভাবে কার্যকরী হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

d. জেনেটিক ড্রিফট্ কিভাবে বিবর্তনে ভূমিকা পালন করে তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

e. পরিব্যক্তির ভারসাম্য সমীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।

f. *Drosophila* মাছির ক্ষেত্রে Hox gene এর কার্যাবলীর বিবরণ দিন।

9.12 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

a. (i), (ii), (iii) টীকার জন্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন কবুন।

b. 9.2 উপ একক অংশটি দেখুন।

c. বিবর্তন সূচিত হয়।

অনুশীলনী—2

a. নিজে চেষ্টা করুন।

b. নিজে চেষ্টা করুন।

c. নিজে লিখুন।

d. জিন এবং ক্রোমোজোম পরিব্যপ্তির ফলে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী—3

a. নিজে চেষ্টা করুন।

b. পরিব্যক্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচন, অসম সম্ভাবনাময় সঙ্গম ব্যবস্থা, জেনেটিক ড্রিফট ইত্যাদি।

c. $(p+q)^2 = p^2+2pq+q^2=1$

জিন ফ্রিকোয়েন্সি।

জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি।

অনুশীলনী—4

a. 9.6 উপএককটি দেখুন।

b. 9.6 উপএককটি দেখুন।

c. 9.9 উপএককটি দেখুন।

d. 9.9 উপএককটি দেখুন।

e. 9.7 উপএককটি দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

a. 9.2 উপএককটি দেখুন।

b. 9.3 উপএককটি দেখুন।

c. 9.6 উপএককটি দেখুন।

d. 9.9 উপএককটি দেখুন।

একক 10 ❑ প্রজাতি উদ্ভব (Speciation)

গঠন

10.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

10.2 প্রজাতি উদ্ভবের সংজ্ঞা

10.3 প্রজাতি উদ্ভবের বিভিন্ন প্রকার

10.4 প্রজাতি উদ্ভবের হার

10.5 প্রজাতি উদ্ভবের বিভিন্ন নীতি

10.5.1 অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব

10.5.2 প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব

10.5.3 সিম্‌প্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব

10.6 চিত্রাবলী

10.7 সারাংশ

10.8 অনুশীলনী

10.9 উত্তরমালা ও অনুশীলনী

10.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

10.11 উত্তরমালা

10.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

প্রজাতি মাত্রই প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন বিবর্তনগত শর্ত, যেমন—মিউটেশান, রিকম্বিনেশান, জেনেটিক ড্রিফট্, প্রাকৃতিক নির্বাচন ইত্যাদির অধিনস্থ থাকে। এর ফলে পপুলেশনে স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তন আসে এবং আপাত দৃষ্টিতে বিবর্তন ঘটার সম্ভাবনাসব সময়ে থেকে যায়, যদি না অত্যন্ত তীব্র স্থিতিশীল নির্বাচন পপুলেশনের উপর কাজ করে ও জীন ফ্রিকোয়েন্সিকে অপরিবর্তিত রাখে। পার্থিব জীবজগতের বিভিন্নতার কারণই হল প্রজাতি উদ্ভব। প্রজাতি উদ্ভব ঘটনার দ্বারাই পপুলেশনের বিবর্তন এবং ট্যাক্সোনমিক বিভিন্নতার উৎপত্তির যোগসূত্র গড়ে ওঠে। বিবর্তন ইতিহাসের বহু ঘটনার কারণ হিসাবে প্রজাতি উদ্ভব ঘটনাকে চিহ্নিত করা যায়।

প্রজাতি উদ্ভব সম্পর্কে মেয়ার (Mayr, 1954; '63); বুশ (Bush, 1775); এন্ডলার (Endler, 1977); হোয়াইট (White, 1978); রাইট (Wright, 1978); ল্যান্ড (Lande, 1980, '81), টেম্পল্টন (Templeton, 1980, '81, '82), ওয়াইলি (Wiley, 1981); ওয়াইলি এবং মেডেন (Wiley and Mayden, 1985) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

উদ্দেশ্য

আপনি এই এককটি পাঠ করে জানতে পারবেন—

- প্রজাতির উদ্ভব কাকে বলে?
- প্রজাতির উদ্ভবের মুখ্য প্রকার।
- প্রজাতির উদ্ভব কি হারে সম্পন্ন হয়।
- প্রজাতির উদ্ভব কিভাবে ঘটে।
- অ্যালোপ্যাট্রিক, প্যারাপ্যাট্রিক ও সিমপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভবের বিভিন্ন মডেল ও তার বর্ণনা।

10.2 প্রজাতি উদ্ভবের সংজ্ঞা (Definition of speciation)

পূর্ব পুরুষ প্রজাতির জীব গোষ্ঠীর মধ্যেপ্রজননগত বিচ্ছিন্নতার আবির্ভাবের ফলে যদি দুই বা ততোধিক বংশধর প্রজাতির সৃষ্টি হয় তবে ঘটনাটিকে প্রাজতি উদ্ভব বলা হয়। "Evolution of reproductive isolation within an ancestral species, resulting in two or more descendant species is known as speciation."—D. J. Futuyma. 1998.

জৈবিক প্রজাতির ধারণা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ—

জৈবিক প্রজাতির ধারণা — কতকগুলি প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রজননগত সক্ষমতা থাকে এবং সেই ধরণের প্রাণী ছাড়া অন্য প্রাণীদের সঙ্গে যৌন জীবন সাধিত হয় না। অন্য প্রাণীর থেকে প্রজননগত পৃথকীকরণ হয় তখন সেই গোষ্ঠির প্রাণীদের প্রজাতি আখ্যা দেওয়া হয় (Dobzh ansky 1935)।

গুণগত ভাবে বা আচরণগত ভাবে যখন কোন প্রাকৃতিক জীব গোষ্ঠী প্রজননক্ষম হয়ে তাদের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি করে এবং প্রজননগত ভাবে অন্য প্রাণীদের সাথে তাদের বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায়, তখন সেই গোষ্ঠীকে প্রজাতি বা স্পিসিস আখ্যা দেওয়া হয় (Mayer 1942)।

বিবর্তনে প্রজাতির উদ্ভব — একই গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত কোন গোষ্ঠী বা প্রাণীদের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের প্রজন্ম যাদের নিজস্বতা থাকে, অন্য প্রাণী থেকে পৃথকীকরণ হয় এবং উদ্ভূতপ্রাণী স্বাধীনভাবে বিবর্তনে অংশ গ্রহণ করে ঐতিহাসিক স্থান গ্রহণ করে। (Wiley 1778)

ফাইলোজেনেটিক প্রজাতির ধারণা — যখন কোন প্রাণীর বা গোষ্ঠীর পরিমাণকে হ্রাস করা যায় না অর্থাৎ অপরিবর্তিত থাকে এবং সহজেই অন্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায় এবং সেই গোষ্ঠীর মধ্যে বংশগত পরম্পরার ধারাবাহিকতা থাকে তাকে ফাইলোজেনেটিক প্রজাতি বলে। (Cracraft 1989)

de Queiroz এবং Donoghue (1990) মতে যখন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে কেবল একটিমাত্র জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তখন তাহাকে মনোফাইলেটিক গ্রুপ বলে।

সিবলিং প্রজাতির ধারণা — একই প্রকার সাদৃশ্য থাকে এমন জীব গোষ্ঠী যখন জননগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হয় তখন তাদের সিবলিং প্রজাতি বলে। যেমন *Drosophila psudoobscura* এবং *D. persimilis* এই দুইপ্রকার মাছি একপ্রকার দেখতে কিন্তু প্রজননক্ষম হয় না।

প্রজাতি রিকগনাইজেশন এর ধারণা — Paterson (1985)-এর মতে প্রজাতি হলো যাহা দুটি প্রাণী থেকে উদ্ভূত এবং নিষেক পদ্ধতিতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে।

ইকোলজিকাল প্রজাতির ধারণা — প্রজাতি হল কতকগুলি প্রাণী যারা একই বংশোদ্ভূত কিন্তু নিজস্ব

অভিযোজনের ভিত্তিতে সেই গোষ্ঠীর অন্য পপুলেশন থেকে সামান্য পৃথক থাকে এবং পৃথকীকরণ মাধ্যমে নিকটতম গোষ্ঠীর থেকে তার দূরত্ব রক্ষা করে। (Van Valeh 1976)

ইন্টারনোডাল প্রজাতির ধারণা — দুটি স্থায়ী বিভক্তিকরণের মাধ্যমে অথবা বিভাজনের মাধ্যমে অথবা বিলুপ্তি হবার ঘটনা যখন কোন জীবগোষ্ঠীতে হয় এবং সেই প্রাণী বিশেষ যখন তাদের জীনগত উপাদানের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকটতম হয় তখন তাকে ইন্টারনোডাল প্রজাতি বলে। (Kornet 1993)

10.3 প্রজাতি উদ্ভবের মুখ্য প্রকার (Three Principles classes of speciation)

বিজ্ঞানী মেয়ার (1963) প্রজাতি উদ্ভবের তিনটি মুখ্য প্রকারের বর্ণনা করেছেন।

(A) **রিডাক্টিভ প্রজাতি উদ্ভব (Reductive Speciation)**— এক্ষেত্রে দুটি বর্তমান প্রজাতি মিলিত হয়ে তৃতীয় একটি নতুন প্রজাতিতে পরিণত হয়। প্রধানতঃ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রজাতি উদ্ভব হয়ে থাকে।

(B) **ফাইলেটিক প্রজাতি উদ্ভব (Phyletic Speciation)**— ধীর ও ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে পূর্বতন প্রজাতি যদি পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রজাতিতে পরিবর্তিত হয় তখন তাকে ফাইলেটিক প্রজাতি উদ্ভব বলে। একটি বংশধারার এই ক্রমবিবর্তনকে অ্যানাজেসিস (Anagenesis) বলা হয়।

(C) **অ্যাডিটিভ প্রজাতি উদ্ভব (Additive Speciation)**— এক্ষেত্রে পূর্বতন প্রজাতি দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুই বা ততোধিক প্রজাতি উৎপন্ন করে। একে বংশধারার বিভক্তিকরণ (lineage splitting) বা ক্ল্যাডোজেনেসিস (Clado-genesis) বা জালকাকৃতি বিবর্তন (reticulate evoluation) বলা হয়।

মায়ারের জৈবিক প্রজাতির ধারণাসর্বজনগ্রাহ্য হলেও কিছু বিষয় আলোচিত হতে পারে—

প্রথমতঃ মায়ারের সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা আছে। অযৌন জনন যে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তাদের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা অর্থবহ হয় না। এক্ষাও লক্ষ করার বিষয় যে এই সংজ্ঞার বিবরণে এ বিষয়ে উল্লেখ নেই যে কেন আধুনিক বা সমসাময়িক প্রজাতি ও হাজার হাজার বছরের প্রাচীন প্রাণীদের একই নামে চিহ্নিত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই সংজ্ঞাটিতে পপুলেশন বা প্রাণীগোষ্ঠীর বিবেচনা আছে কিন্তু কোন প্রাণীবিশেষ সম্পর্কে আলোচিত হয় নি। দুটি প্রাণী (individual) অন্তপ্রজননে সক্ষম নাও হতে পারে যেমন দুটি পুরুষ, কিংবা কুকুর প্রজাতির গ্রেট ডেন ও চিহুয়াহুয়া, যদিও উল্লেখিত প্রাণী একই প্রজননগোষ্ঠীর, অর্থাৎ যাহাদের জিন পুল এক।

তৃতীয়ত, আন্তপ্রজনন বা সঠিক অর্থে জিন বিনিময় হয় প্রাকৃতিক ভাবে কোন গোষ্ঠীর মধ্যে, কিন্তু এক্ষেত্রে জননক্ষমতা (ferfility) বা জনন অক্ষমতা (sterility) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় নি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে স্বাভাবিক নিয়মে যেখানে প্রজনন হয় না কিন্তু কৃত্রিমভাবে জনন কোষের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ঘোড়া এবং গাধার জীবের মিলনে একটি বিশেষ প্রাণীর সৃষ্টি হয়, এই সংকরায়ন পদ্ধতিতে যে (hybrid) প্রাণীটি জন্ম নেয় তাকে আমরা Mule বলি যার প্রজননক্ষমতা থাকে না। বিভিন্ন ভাবে এ প্রক্রিয়া ঘটানো যায় চিড়িয়াখানা বা গবেষণাগারেও। প্রকৃতিতে এটা কখনোই ঘটে না যেহেতু প্রাণী-গোষ্ঠী অন্য প্রজাতির সাথে যৌনমিলন থেকে নিবৃত্ত থাকে। যদিও বহিরাকৃতিতে অনেক অমিল আছে স্ত্রী ও পুরুষ মালার্ড *Anus platyrhynchos* (A) এবং নর্দান পিনটেল *Anus acuta* (B) পাখী দুটিতে কিন্তু এদের মধ্যে হাইব্রিডাইজেসন (সংকরায়ন) হয়। প্রকৃতিতেও এধরনের ঘটনার প্রকাশ ঘটে।

Figure 15.5 : Despite the conspcuous differences between the mallard (A. *Anas platyrhynchos*) and the northern pintail (B, *Anas acuta*), these species can hubridze. However, they very seldom do so in nature. (After the National Geographic Society 1987.

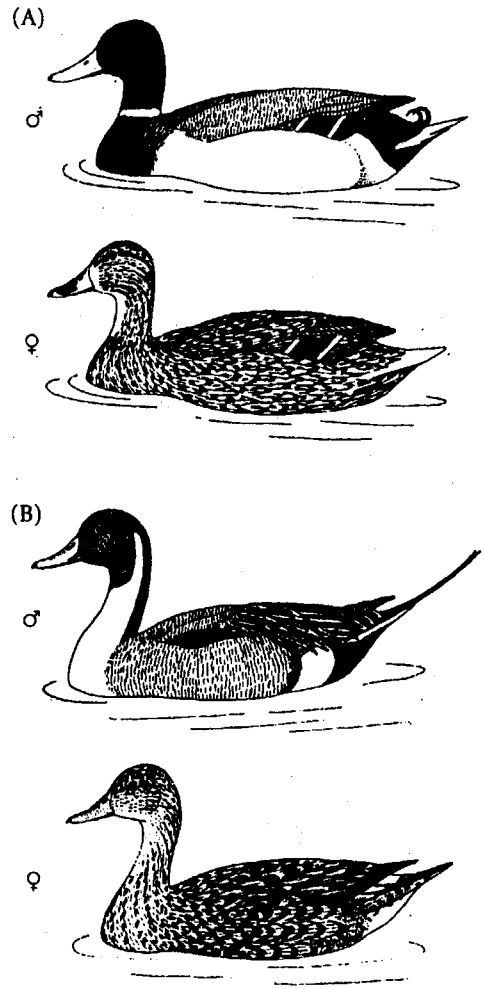

(Source Evolutionary Biology — D. J. Futuyma, 3rd Edition)

প্রজাতির বিকল্প সংজ্ঞা — জৈবিক প্রজাতির ধারনার সাথে সাথে অনেক রকম জাতিজনি নির্দেশক প্রজাতি ধারণাও প্রচলিত হয়েছে। জৈবিক প্রজাতির ধারণাকে বলা হয় সংক্ষেপে বিএসসি (BSC) এবং জ্ঞাতিজনি নির্দেশক প্রজাতিকে বলা হয় সংক্ষেপে পিএসসি (PSC).

জোয়েল ক্র্যাক্রাফট [Joel Cracraft (1989)]-এর মতে অপরিবর্তীনীয় গোষ্ঠী অথবা প্রাণী অন্য গোষ্ঠী বা প্রাণী থেকে পৃথক করা যায় এবং এদের মধ্যে পূর্বতন এবং পরবর্তী প্রজাতিকে চিহ্নিত করার গুণাবলী আছে।

10.4 প্রজাতি উদ্ভবের হার (Rates of speciation)

প্রজাতি উদ্ভবের হার বলতে বোঝায় যে কত দ্রুততার সঙ্গে কোনও প্রজাতির অন্তর্গত পপুলেশন গোষ্ঠীতে প্রজননগত স্বাতন্ত্রতার আবির্ভাব ঘটে এবং পূর্বতন প্রজাতি থেকে প্রতি একক সময়ে কয়টি বংশধর প্রজাতির বিবর্তন ঘটে। শেষোক্ত ঘটনাকে প্রকৃতপক্ষে কোনও একটি clade বা ক্লেড (নির্দ্দিষ্ট একটি পূর্ব্বপুরুষজাত প্রজাতি গোষ্ঠী) এর বৈচিত্র্যের উদ্ভবকে বোঝায়।

জীবজগতে বিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রমাণ করে যে, প্রজাতি উদ্ভবের সময় অত্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়। পলিপ্লয়েডি দ্বারা যেখানে দ্রুততার সঙ্গে প্রজাতি উদ্ভব সম্ভব তেমনি বহুক্ষেত্রে বেশ কয়েক লক্ষ বছরের ব্যবধানে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। হাওয়াই এর সবচেয়ে বড় দ্বীপটি আট লক্ষ বছরের ও কম প্রাচীন কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এখানে প্রায় 24টি *Drosphila* প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে। একইভাবে দুইলক্ষ বছরের ব্যবধানে Lake Victoria তে একটি পূর্বপুরুষ থেকে প্রায় 300টি প্রজাতির তেলাপিয়া জাতের (গোত্র Schedule) মাছ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব আমেরিকা থেকে ইউরোপ প্রায় 2 কোটি বছর আগে উঃ আটলান্টিক মহাসাগর দ্বারা আলাদা হলেও উভয় দেশের বেশ কয়েক প্রকার পাখি, যেমন ট্রি-ক্রিপার *(Certhia familiaris)* এবং র‍্যাভেন জাতীয় কাক *(Corvus corax)* প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গেছে। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এরা নতুন প্রজাতিতে বিবর্তিত হতে পারেনি। দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই অপরিবর্তনীয়তা বহু জীবাশ্মেতেও দেখা গেছে।

ক্রোমোজোমের ভিন্ন বিন্যাসগত সৃষ্ট প্রজাতি—

আণবিক ব্যতিক্রম (Molecular differences) —

ডিএনএ সজ্জাক্রম এবং অ্যালিলের প্রভেদের কারণে দুটি নিকটবর্তী প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। আণবিক বিভিন্নতা এবং গঠনগত পার্থক্যের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবধান থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আফ্রিকার মালাউই হ্রদে 500-র বেশী সংখ্যক সিকলিড মাছের প্রজাতি আছে বহু বছর ধরে। কমপক্ষে ২ লক্ষ বছর সময়ে এদের মধ্যে বাস্তুতন্ত্রের বা বাহ্যিক গঠনের পরিবর্তন হয়েছে। যদিও দেখা গেছে কোষের মধ্যে অবস্থিত মাইটোকনড্রিয়াল জিনের শতকরা দু ভাগ ব্যতিক্রমের কারণে এত প্রকার মাছ দেখা যায় (Meyer et. al. 1990). অন্যদিকে এর বিপরীত চিত্রও আছে।

সিকলিড মাছেরই অন্য এক প্রজাতি *Tropheus* টানজানিকা হ্রদে দেখতে পাওয়া যায় যাদের সকলকেই প্রায় এক রকম দেখতে শুধুমাত্র রঙের প্রভেদ আছে। আণবিক বিচারে এদের ডিএনএ সজ্জাক্রমের শতকরা 14 ভাগ ব্যতিক্রম আছে (Sturmbaner and Meyer 1992).

ড্রোসোফিলা মাছি (*Drosophila melanogaster*) এবং নিকটবর্তী প্রজাতির ক্ষেত্রে এ বিষয়ে একটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। আমরা জানি যে আফ্রিকা মহাদেশ থেকেই মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে এই ড্রোসোফিলা মাছিটি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। *D. mauritiana*-কে দেখতে পাওয়া যায় শুধুমাত্র ভারত মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপে। *D. Sechellia* শুধুমাত্র ভারত মহাসাগরের সেচেল দ্বীপপুঞ্জেই দেখা যায়। এই প্রজাতিটি এমন ভাবেই অভিযোজিত হয়েছে যে এই দ্বীপের কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফলের রসই এরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। যেহেতু *D. melanogaster*-কে কোষ বিদ্যায় বহুল পরিমাণে গবেষণা করা গেছে মাছিটির ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের মধ্যে সংকরায়ণও করা যায়, তাই এদের মধ্য থেকে

চারটি প্রজাতির (*D. melanogaster, D. simulan, D. mauritiana, D. Sechellia*) প্রতিটির 6টি মাছির x-ক্রোমোজোমের তিনটি জিনের বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করেছেন Jody Hey এবং Richard Kliman (1993). তারা লক্ষ করেন যে একই হারে সমার্থক অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিবর্তনকারী নিউকিলওটাইড বস্তুটি সকল প্রজাতির ক্ষেত্রেই আছে। তাদের পর্যবেক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই বিভিন্নতা পছন্দযুক্ত ভাবে নিরপেক্ষ থাকে এবং এই নিউকিলওটাইডের সজ্জার বিবর্তন ঘটেছে শুধুমাত্র জেনেটিক ড্রিফট এর জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচন এই ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় নি। এটাই লক্ষ করা গেছে যে ডি এন এ সজ্জাক্রমের অপসারিতা সাধারণত একই ধ্রুবকে আছে।

10.5 প্রজাতি উদ্ভবের বিভিন্ন রীতি (Different pattern of speciation)

বিজ্ঞানী D.R. Brooks এবং D.A. McLenan (1991) রচিত Phylogeny, Ecology and Behaviour গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রজাতি উদ্ভব রীতির বর্ণনা রয়েছে।

10.5.1. অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব (Allopatric Speciation)

পূর্বতন বা পূর্বপুরুষ প্রজাতি দুই বা ততোধিক পপুলেশন যদি ভৌগোলিক ভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটায় তবে তাকে অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব বলে। ওয়াইলি (1981) ; ওয়াইলি ও মেডেন (1985) এবং ফাঙ্ক ও ব্রুক্স্ (1990) নিম্নলিখিত তিন প্রকার অ্যালোপ্যাট্রিক মডেলের প্রস্তাবনা করেছেন।

মডেল-1—1. এটি Vicariance অথবা Geographic প্রজাতি উদ্ভব নামেও পরিচিত।

2. এক্ষেত্রে প্রজাতি A একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

3. কোনও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার আবির্ভাবের ফলে প্রজাতি A দুটি পপুলেশনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং প্রতিবন্ধকতার ফলে উভয়ের মধ্যে জিনের আদান প্রদান (gene flow) বন্ধ হল।

4. দুটি পপুলেশন আলাদাভাবে বিবর্তিত হয়ে প্রজাতি B এবং C তে পরিণত হল।

5. আবার একটি ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে প্রজাতি দুটি পপুলেশনে বিচ্ছিন্ন হল এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাতি D এবং E তে পরিণত হল।

6. এক্ষেত্রে পূর্বপুরুষ প্রজাতি A এবং C অবলুপ্ত হয়ে বংশধর প্রজাতি B, D এবং E তে পরিণত হল।

[চিত্রাবলীতে মডেল-১ দ্রষ্টব্য]

উদাহরণ—প্লিওসিন ইপকে পানামা যোজক সৃষ্টি হওয়ার পর সামুদ্রিকপ্রাণীরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ক্যারিবিয়ান সাগরীয় পপুলেশনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই প্রাণীদের মধ্যে কিছু পৃথক হয়ে নতুন প্রজাতি উৎপন্ন করেছে। যোজকের দুই পাশে বিচ্ছিন্ন দুই সাগরীয় পরিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা জেনেটিক ড্রিফট্ এর কারণে পপুলেশনের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে।

মডেল-2—1 এটি পেরিফেরাল আইসোলেট অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব বা পেরিপ্যাট্রিক (Peripatric) প্রজাতি উদ্ভব নামে পরিচিত।

2. বৃহৎ পূর্বতন পপুলেশনের সাধারণতঃ পরিধি (periphery) বা বহির্ভাগের ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন পপুলেশন থেকে এই প্রকার প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।

3. ক্রমশঃ কোন প্রতিবন্ধকতা ঐ ক্ষুদ্র পপুলেশনেক মূল পপুলেশন থেকে বিচ্ছিন করে। এর ফলে পূর্বতন প্রজাতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন পপুলেশনের জিনের আদান প্রদান (gene flow) বন্ধ হয়।

4. ক্রমে পরিধীয় বিচ্ছিন্ন পপুলেশন নতুন প্রজাতিতে পরিবর্তিত হয়।

[চিত্রাবলীতে মডেল-২ দ্রষ্টব্য]

উদাহরণ— বিজ্ঞানী কারসন এবং কানেশিরোর (Carson and Kaneshiro, 1976) মতে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের একটি মূল জিনের *Drosphila* পূর্বপুরুষ থেকে এই প্রকার প্রজাতি উদ্ভব দ্বারা দ্বীপপুঞ্জেও তার একশোটি প্রজাতির ঐ মাছি উৎপন্ন হয়েছে।

মডেল-3—1. কিছু প্রজাতি বেশ কয়েকটি আলাদা (disjunct) পপুলেশন গোষ্ঠীরূপে অবস্থান করে এবং যাদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে জিনের আদান প্রদানের সুযোগ থাকে।

2. এই মডেলটি স্ট্যাসিপ্যাট্রিক (Stasipatric) প্রজাতি উদ্ভব রূপে White, 1978 ; Thompson and Sites, 1986 প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ বর্ণনা করেছেন।

3. আলাদা পপুলেশন গোষ্ঠীগুলিতে প্রভেদকরণ মূলতঃ বিভিন্ন জেনেটিক কারণে, যেমন—ক্রোমোজোমীয় মিউটেশন বা জেনেটিক ড্রিফট্ বা মিয়োটিক ড্রাইভ দ্বারা মিউটেশনের স্থিতি ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াজাত কারণেই পপুলেশন গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যে প্রজননঘটিত স্বাতন্ত্র্য দেখায়।

[চিত্রাবলীতে মডেল-৩ দ্রষ্টব্য]

উদাহরণ—অস্ট্রেলিয়ার ঘাস ফড়িং *Vandiemenella* গণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী Key (1968) এর মতে স্ট্যাসিপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব ঘটনা দেখা যায়। পূর্বপুরুষ প্রজাতি *V. protoviatica* থেকে সরাসরি *V. viation* এবং অন্যান্য প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। অযৌন জননকারী জীবগুলির ক্ষেত্রে এই প্রকার প্রজাতি উদ্ভব বেশি ঘটে। কিন্তু মডেল-3 সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত গবেষণা হয়নি।

10.5.2 প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব (Parapetric speciation)

1. এই প্রকার প্রাজতি উদ্ভব সম্পর্কে Endler, 1977; Lande, 1982 এবং Barton ও Charles worth, 1984 এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

2. এক্ষেত্রে পূর্বতন প্রজাতির দুটি পপুলেশন তাদের মধ্যে কিছুটা জিন আদানপ্রদান এবং ভৌগোলিক সংস্পর্শে থাকা অবস্থায় নতুন বংশধর প্রজাতিতে পরিণত হয়।

3. স্থানিক নির্বাচন চাপ (local selection pressure) দ্বারা প্রথনে প্রভেদকরণ শুরু হয় এবং এরপর পপুলেশনের সভ্যদের কম গমনশীলতা (low vagility) ধর্মের জন্য পার্শ্ববর্তী পপুলেশনের সঙ্গে জিনের আদান প্রাদন হ্রাস পায়। এর ফলে প্রজাতি উদ্ভব ত্বরান্বিত হয়।

উদাহরণ—বিজ্ঞানী এন্ডলার (Endler, 1977) এই প্রকার প্রজাতি উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ব্যাঙের দুটি প্রজাতিকে (*Hyla ewingi* এবং *Hyla Verreauix)* প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভবের আদর্শ উদাহরণরূপে উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত প্রজাতি দুটির অন্তবর্তী zone of sympatry অঞ্চলের সব প্রাণীগুলির বেঁচে থাকার যোগ্যতা দূরবর্তী অ্যালোপ্যাট্রিক প্রাণীদের থেকে অনেক কম (deprened fitness) হয়।

10.5.3 সিমপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব (Sympatric speciation)

ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যদি পূর্বতন পপুলেশন এক বা ততোধিক প্রজাতিতে পরিণত হয় তবে তাকে সিম্‌প্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব বলে। যেখানে অ্যালোপ্যাট্রিক মডেলগুলিতে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রাথমিকভাবে জিনের আদানপ্রদান বন্ধ হয়, সেখানে সিম্‌প্যাট্রিক মডেলে পপুলেশনের অন্তঃস্থ জৈবিক ক্রিয়ায়, যেমন, সংকরায়ন, বাস্তুতান্ত্রিক বিভক্তিকরণ, অযৌন বা পার্থেনোজেনেটিক জননের উৎপত্তি ইত্যাদির দ্বারা প্রজাতি উদ্ভব ঘটে।

1. বিজ্ঞানী Diehl and Bush (1989) ও Giant and Grant (1989) উদাহরণ সহযোগে বাস্তুতান্ত্রিক পৃথকীকরণ (ecological segreagation) দ্বারা এই প্রকার প্রজাতি উদ্ভবের বর্ণনা দিয়েছেন।

2. পূর্বতন পপুলেশনটিতে কোনও নতুন পোষকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জেনেটিক প্রভেদ আগেই ছিল।

3. পোষক পরিবর্তনের জন্য (niche shift) মিউটেশন ঘটে।

4. পপুলেশনের সভ্যগুলির মধ্যে প্রজননের ফলে ঐ মিউটেশন ছড়িয়ে পড়ে।

5. মিউটেশন বহনকারী সভেয্যা নতুনি পোষককে সংক্রামিত করে। একই সঙ্গে আরও অন্যান্য মিউটেশনের দরুন সভ্যেরা নতুন পোষকে ভালোভাবে থাকার যোগ্যতা লাভ করে।

উদাহরণ—বিজ্ঞানী Tauber and Tauber (1977) লেশউইঙ্গ পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রকার প্রজাতি উদ্ভব সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। পতঙ্গ প্রজাতি *Chrysopa downeri* কনিফার উদ্ভিদে থাকে এবং বিশেষ ধরণের খাদ্যগ্রহণে পারদর্শী। সাধারণ ভোজী (generalist feeder) অন্য প্রজাতি *Cearnea* তৃণভূমিতে থাকে। সম্ভবতঃ একটি পূবর্তন প্রজাতি থেকে বাস্তুতান্ত্রিক ভাবে এরা দুটি পরিবেশে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে নতুন প্রজাতি উৎপন্ন করেছে।

বিজ্ঞানী Harrison and Rand (1989), Hewin (1989) সংকরায়ন দ্বারা সিম্‌প্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভবের বর্ণনা দিয়েছেন। কিছু স্বাদুজলের মাছ এবং গিরগিটি প্রাণীতে এই পদ্ধতিতে প্রজাতি উদ্ভব ঘটেছে। উত্তর মেক্সিকোতে প্রাপ্ত *Poecilia formosa* মাছ সম্ভবতঃ *P. latipinna* ও *P. sphenops* অথবা *P. mexicana* প্রজাতির সংকরায়ণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

10.6 চিত্রাবলী

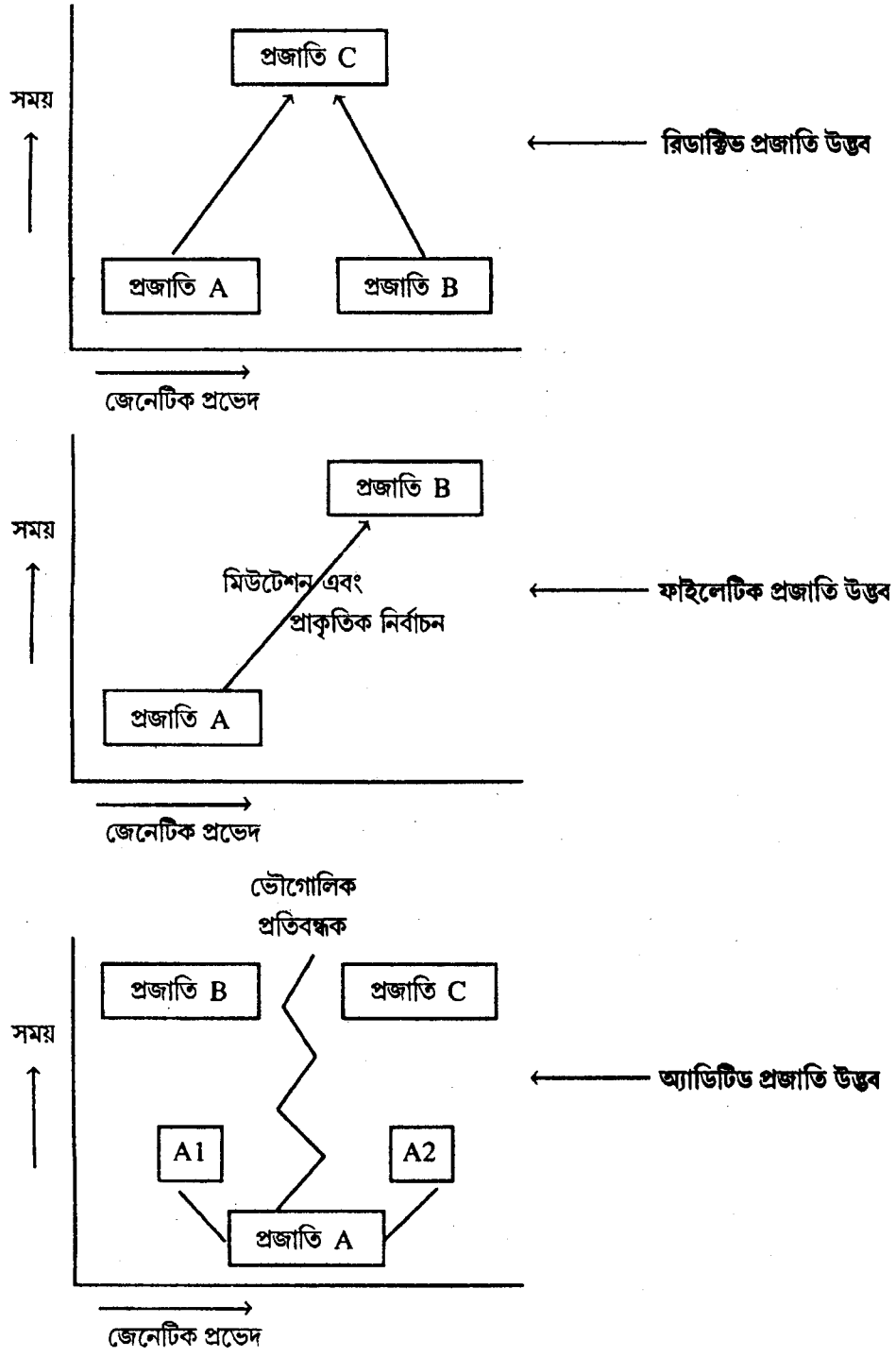
প্রজাতি C
সময়
রিডাক্টিভ প্রজাতি উদ্ভব
প্রজাতি A
প্রজাতি B
জেনেটিক প্রভেদ
প্রজাতি B
সময়
মিউটেশন এবং
প্রাকৃতিক নির্বাচন
ফাইলেটিক প্রজাতি উদ্ভব
প্রজাতি A
জেনেটিক প্রভেদ
ভৌগোলিক
প্রতিবন্ধক
প্রজাতি B
প্রজাতি C
সময়
অ্যাডিটিড প্রজাতি উদ্ভব
A1
A2
প্রজাতি A
জেনেটিক প্রভেদ

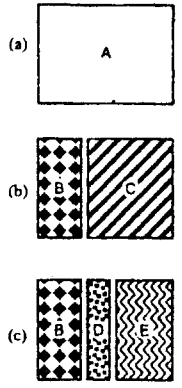

অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব

মডেল-I

পূর্বতন প্রজাতি—A

নতুন প্রজাতি—B এবং C

ভৌগোলিক কারণে C থেকে আবার নতুন প্রজাতি D এবং E এর উদ্ভব।

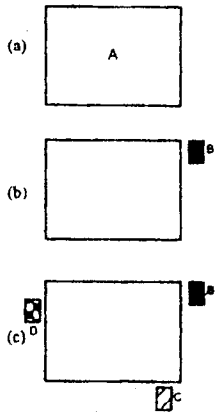

অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব

মডেল-II

পরিধীয় বিচ্ছিন্ন পপুলেশন B, C ও D দ্বারা প্রজাতি উদ্ভব।

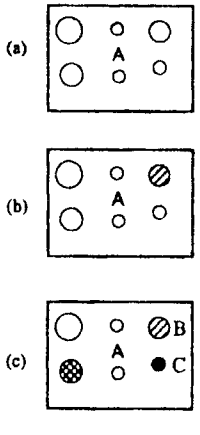

অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব

মডেল-III

প্রজাতি A একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে অনেকগুলি পপুলেশন দ্বারা গঠিত। পপুলেশনগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ বা অনুলেখ্য জিনের আদানপ্রদান বা আদানপ্রদান বন্ধ। জেনেটিক ড্রিফ্‌ট্ বা প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা পপুলেশনগুলির মধ্যে পরিবর্তন ও পরিশেষে প্রজনন স্বাতন্ত্র্যতার উৎপত্তি। ফলে B, C এবং D প্রজাতির উদ্ভব।

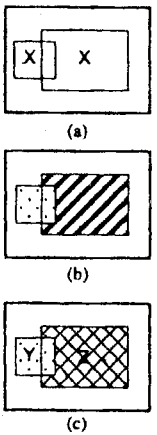

প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব

(a) পূর্বতন প্রজাতির দুটি পপুলেশনের পারস্পরিক সহাবস্থান (আংশিক)

(b) সহাবস্থানরত অবস্থায় পপুলেশন দুটির প্রভেদকরণ।

(c) Y এবং Z প্রজাতি উদ্ভব সম্পূর্ণ।

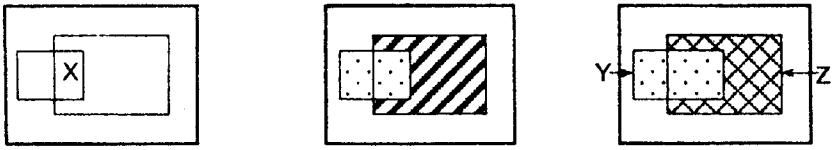

(a) (b) (c)

সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব

(a) পূর্বতন প্রজাতি x এর দুটি পপুলেশনের সম্পূর্ণ সহাবস্থান

(b) সহবস্থানরত অবস্থায় পপুলেশনের প্রভেদকরণ।

(c) Y এবং Z প্রজাতি উদ্ভব সম্পূর্ণ (দুটি প্রজাতি সহাবস্থানরত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও প্রজনন স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে)।

10.7 সারাংশ

এই এককটিতে আপনারা শিখতে পেরেছেন যে,

● প্রজাতি উদ্ভব কিভাবে ঘটে। প্রজাতি উদ্ভবের মুখ্য প্রকাশগুলি কি কি হতে পারে।

● প্রজাতি উদ্ভব কাকে বলে। প্রজাতি উদ্ভবের হারে অত্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়।

● প্রজাতি উদ্ভবের বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী অ্যালোপ্যাট্রিক, প্যারাপ্যাট্রিক ও সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভবের বর্ণনা ও বিভিন্ন প্রস্তাবিত মডেল। প্রজাতি উদ্ভব কিভাবে ঘটতে পারে এবং তাদের উদাহরণ।

● প্রজাতি উদ্ভবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের আধুনিক মতবাদ।

10.8 অনুশীলনী

নিচের তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

a. প্রজাতি উদ্ভব জিন ফ্রিকোয়েন্সির _____ হয়।

b. প্রজাতি উদ্ভব ঘটনার দ্বারাই পপুলেশনে _____ ঘটে।

c. অ্যাডিটিভ প্রজাতি উদ্ভবে প্রজাতির সংখ্যা _____ পায়।

d. রিডাক্টিভ প্রজাতি উদ্ভব মূলতঃ _____ জগতে দেখা যায়।

e. প্রজাতি উদ্ভবের সময়ে অত্যন্ত _____ দেখা যায়।

f. ভৌগোলিকভাবে সম্পূর্ণ _____ থেকে অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব ঘটে।

g. অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভবের মডেল-3 কে _____ প্রজাতি উদ্ভবও বলা হয়।

h. পেরিফেরাল আইসোলেট অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভবকে _____ প্রজাতি উদ্ভবও বলা যেতে পারে।

i. প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব সম্পর্কে বিজ্ঞানী _____ বিস্তারিত গবেষণা করেছেন।

j. ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যদি পূর্বতন পপুলেশন থেকে নতুন প্রজাতি উদ্ভব ঘটে তবে তাকে _____ প্রজাতি উদ্ভব বলা হয়।

10.9 উত্তরমালা

a. সিম্‌প্যাট্রিক, b. এন্ডলার, c. পেরিপ্যাট্রিক, d. পরিবর্তন, e. স্ট্যাসিপ্যাট্রিক, f. পার্থক্য, g. উদ্ভিদ, h. বিবর্তন, i. বিচ্ছিন্ন, j. বৃদ্ধি।

10.10 প্রশ্নাবলী

a. প্রজাতি উদ্ভবের সংজ্ঞা দিন। প্রজাতি উদ্ভবের অ্যালোপ্যাট্রিক মডেলগুলির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

b. প্যারাপ্যাট্রিক ও সিম্‌প্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব কি ভাবে ঘটে। উদাহরণ ও সাম্মানিক মডেল দ্বারা উপরোক্ত প্রজাতি উদ্ভবের বর্ণনা দিন।

c. প্রজাতি উদ্ভব কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার প্রজাতি উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

d. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

1. প্রজাতি উদ্ভবের মুখ্য প্রকারগুলি কি কি? এগুলির সংজ্ঞা লিখুন।
2. প্রজাতি সম্পর্কে Mayr-এর মতবাদের আলোচনা করুন।
3. জৈবিক প্রজাতির ধারণা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
4. ভিকারয়িন্সে প্রজাতি উদ্ভব কি? বর্ণনা লিখুন।
5. পেরিপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা দিন।
6. স্ট্যাসিপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
7. প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
8. সিম্‌প্যাট্রিক ও অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি উদ্ভব পদ্ধতিটির তুলনামূলক আলোচনা করুন।
9. প্রজাতি উদ্ভবের সময়ের হারে যে পরিবর্তনীয়তা লক্ষ্য করা যায় তা উল্লেখ করুন।

10.11 উত্তরমালা

ইউনিট 10-এর উপঅধ্যায়গুলির দ্রষ্টব্য।

একক 11 ❑ বিচ্ছিন্নকরণ (Isolation)

গঠন

11.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

11.2 বিচ্ছিন্নকরণের সংজ্ঞা

11.3 বিচ্ছিন্নকারক কৌশলগুলির প্রকার

11.3.1 প্রি-জাইগোটিক কৌশল

11.3.1.1 ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নকরণ

11.3.1.2 পরিবেশগত বিচ্ছিন্নকরণ

11.3.1.3 ঋতুকালীন বিচ্ছিন্নকরণ

11.3.1.4 যান্ত্রিক বিচ্ছিন্নকরণ

11.3.1.5 আচরণগত বিচ্ছিন্নকরণ

11.3.1.6 শারীরবৃত্তীয় বিচ্ছিন্নকরণ

11.3.2 পোষ্ট-জাইগোটিক কৌশল

11.3.2.1 সংকর প্রাণীর মৃত্যু

11.3.2.2 সংকর প্রাণীর বন্ধ্যাত্য

11.3.2.3 F_2 সংকর প্রাণীর উৎপাদনে ব্যর্থতা

11.4 বিচ্ছিন্নকরণ ও প্রজাতির উদ্ভব

11.5 সারাংশ

11.6 অনুশীলনী

11.7 উত্তরমালা ও অনুশীলনী

11.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

11.9 উত্তরমালা

11.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

প্রজাতির উদ্ভবের একটি অন্যতম শর্ত হল পপুলেশনের বিচ্ছিন্নকরণ। বিচ্ছিন্নকৃত পপুলেশনে বিবর্তনের বিভিন্ন শর্তগুলি যেমন, জেনেটিক ড্রিফট্, প্রাকৃতিক নির্বাচন, মিউটেশন, পুনঃসংযোজন ইত্যাদি ভিন্নভাবে কার্যকর হয়। দীর্ঘদিন মূল পপুলেশন থেকে এই বিচ্ছিন্নকৃত পপুলেশন আলাদাভাবে প্রকৃতিতে অবস্থান করলে শেষোক্ত পপুলেশনে অ্যালিল এবং জেনোটিপিক ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন ধরা পড়ে এবং

বিবর্তন সূচিত হয়। জেনেটিকভাবে পার্থক্যকৃত এই বিচ্ছিন্ন পপুলেশন পরবর্তীকালে নতুন প্রজাতির মর্যাদা লাভ করে। তখন পূর্বতন মূল পপুলেশনের সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নকৃত পপুলেশন পুনর্বার প্রজননে লিপ্ত হয় না।

বিচ্ছিন্নকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে বহু আগেই ধারণা ছিল। লামার্ক এবং ডারউইনও এ সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন। ডারউইনের উত্তরসূরী ওয়াগ্নার (Wagner) ও রোমানেস (Romanes) বিবর্তন সম্পর্কে বিচ্ছিন্নকরণের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। বিচ্ছিন্নকারক কৌশল বা isolating mechanism নামটি ডবঝান্স্কি Dobzhansky, 1937) প্রথম চয়ন করেন।

উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- বিচ্ছিন্নকরণ কি?
- বিচ্ছিন্নকরণের কিভাবে সম্পন্ন হয়?
- কোন কোন প্রাণীতে বিচ্ছিন্নকরণ পরিলক্ষিত হয়?
- বিচ্ছিন্নকরণের ফলে কিভাবে প্রজাতির উদ্ভব হয়?
- বিচ্ছিন্নকরণের ফলাফল কি তা জানতে পারবেন?

11.2 বিচ্ছিন্নকরণের সংজ্ঞা (Definition of isolation)

যে সব ভৌগোলিক পরিবেশগত বা জৈবিক শর্ত দ্বারা কোনও পূর্বতন মূল পপুলেশন বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যাতে পপুলেশনের সভ্যদের মধ্যে অন্তঃপ্রজনন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন এই ঘনটাকে বিচ্ছিন্নকরণ বা isolation বলে।

বিচ্ছিন্নকারক কৌশল (isolating mechanism) বলতে বোঝায় কোনও পপুলেশনের প্রজননগত বিচ্ছিন্নতা (reproductive isolation) উৎপাদন এবং তা বজায় রাখার যাবতীয় উপায় সমূহকে। এই কৌশলগুলি নিষেকের পূর্বে অথবা পরে কার্যকর হতে পারে। বিজ্ঞানী Dobzhansky (1937) প্রজাতি উদ্ভব প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্নকারক কৌশলগুলি গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।

বিচ্ছিন্নকারক কৌশলগুলির প্রকার ও উদাহরণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মেয়ার (Mayr, 1942, 1948), মূলার (Muller, 1942), প্যাটারসন (Patterson; 1942) হাক্সলে (Huxley, 1942), অ্যালী ও সহকর্মীগণ (Alee,et. al., 1949), স্টেবিন্স (Stebbins; 1950) এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন।

11.3 বিচ্ছিনকারক কৌশলগুলির প্রকার (Types of Isolating mechanisms)

বিজ্ঞানী ডবঝানস্ফির (Dobzhansky) মতানুযায়ী বিচ্ছিন্নকারক কৌশলগুলি নিম্নোক্ত প্রকারের—

11.3.1. প্রি-জাইগেটিক কৌশল (Prezygotic mechanisms)

এইরূপ ক্ষেত্রে জাইগোট গঠনের আগেই এই কৌশলগুলি কার্যকর হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার প্রি-জাইগোটিক কৌশল উল্লিখিত হল।

11.3.1.1 ভৌগোলিক বা স্থানিক বিচ্ছিন্নকরণ (Geographic or spatial isolation)

এটি অত্যন্ত পরিচিত ও স্বাভাবিক প্রকৃতির বিচ্ছিন্নকরণ, যেখানে একটি পপুলেশনের দুটি বা ততোধিক অংশ যে কোনও প্রকারের ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা দ্বারা পার্থক্যকৃত হয় যাতে পপুলেশনের অংশগুলির মধ্যে প্রজনন সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, স্থলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে সুবৃহৎ জলরাশি, জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে স্থলভাগ প্রজনন বাধাদানকারী প্রতিবন্ধক বা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নকরণ শর্তরূপে কাজ করে। ভৌগোলিক প্রতিবন্ধক দ্বারা বিচ্ছিন্ন পপুলেশনগুলিতে নতুন মিউটেশন, জেনেটিক ড্রিফ্‌ট্ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন স্বতন্ত্রভাবে কার্যকর হওয়ায় নতুন প্রজাতি উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে।

সম্ভবতঃ এই কারণে দক্ষিণ গোলার্দ্ধের ঠান্ডা জলে বসবাসকারী সাউদান এলিফ্যান্ট শীল (*Mirounga leonina*) এবং উত্তর গোলার্দ্ধের নর্দাণ এলিফ্যান্ট শীল (*Mirounga augustirostris*) মধ্যবর্তী প্রায় 6000 মাইল ব্যাপি উষ্ণ বিষুবমন্ডলীয় সমুদ্র জলের প্রতিবন্ধক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য নতুন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এদের মধ্যে জেনেটিক আদান প্রদানের বিন্দুমাত্র কোন সুযোগ ছিল না।

11.3.1.2 পরিবেশগত বিচ্ছিন্নকরণ (Ecological isolation)

কোনও পপুলেশনের অংশবিশেষ যখন ভিন্ন পরিবেশে অবস্থান করার জন্য অভিযোজিত হয় এবং মূল পপুলেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তঃ প্রজননে প্রবৃত্ত হয় তখন ঘটনাটিকে পরিবেশগত বিচ্ছিন্নকরণ বলে।

বিজ্ঞানী হিউটস্ (M. J. Heuts) বেলজিয়ামে স্টিম্‌ল্‌ব্যাক মাছের (*Gasterosteus* sp) ক্ষেত্রে এই প্রকার বিচ্ছিন্নকরণ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এই মাছের একটি পপুলেশন সারা বছর স্বাদুজলে মূলতঃ ছোট ছোট খাঁড়িতে অবস্থান করে। কিন্তু অন্য পপুলেশনটি শীতকালে সমুদ্রে থাকে এবং গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে পরিযান করে প্রজননের জন্য নদীর মোহনায় আসে। দুটি পপুলেশনের বর্হিবৈশিষ্ট্যে কিছু পার্থক্য দেখায়। পরীক্ষামূলকভাবে এদের প্রজনন করা সম্ভব হলেও প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে এরা প্রজনন করে না।

11.3.1.3 ঋতুকালীন বিচ্ছিন্নকরণ (Seasonal isolation)

ঋতুকালীন পছন্দ/অপছন্দের জন্য কিছু ক্ষেত্রে একই পপুলেশনের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তঃপ্রজননের সুযোগ কমে আসে। দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলতে থাকলে ঐ পপুলেশন দুটি পরীক্ষামূলকভাবে আর আগ্রহ দেখায় না, অর্থাৎ প্রজননগত বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়।

উত্তর পূর্ব আমেরিকাতে এই রকম তিনটি প্রজাতির ব্যাঙের (*Rana* sp.) সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা একই জলাশয়ে থাকে। কিন্তু এরা জলের তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রজননে লিপ্ত হয়। *Rana sylvatica* জলের তাপমাত্রা 44°F হলে প্রজনন করে। কিন্তু অন্য প্রজাতি *Rana pipiens* 55°F তাপমাত্রায় প্রজনন করলেও প্রথমোক্ত প্রজাতিটি এই তাপমাত্রায় প্রজনন করে না। আবার 60°F তাপমাত্রায় উপরোক্ত প্রজাতি দুটি প্রজনন বন্ধ করলেও তৃতীয় প্রজাতিটি অর্থাৎ *Rana clamitans* ঐ তাপমাত্রায় প্রজনন শুরু করে। কাজেই প্রজনন ঋতুর পার্থক্যের জন্য সহজেই এরা প্রজননগত স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষা করে।

11.3.1.4 যান্ত্রিক বিচ্ছিন্নকরণ (Mechanical isolation)

বহু প্রাণী বিশেষতঃ পতঙ্গের জননাঙ্গের (genitalia) গঠন এমন জটিল প্রকারের হয়ে থাকে। একই প্রজাতির পুং ও স্ত্রী সভ্যের জননাঙ্গ এমন গঠনযুক্ত হয় যাতে উভয়ে প্রজননে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এই কারণে বহু আগে বিজ্ঞানী লিয়ঁ ডুফো (Leon Dwofor) 'তালা-চাবি' বা 'Lock and key' ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। পরবর্তিকালে বিজ্ঞানী জর্ডান (K. Jordan, 1905) এটির বিশদ্ আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুং প্রজনন অঙ্গগুলি এমন যথোপযুক্ত হয় যে এর সামান্য প্রভেদ হলেই প্রজনন ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বিজ্ঞানী ফেডারলি (Federley, 1932) পর্যবেক্ষণ করেন যে, মথ প্রজাতি *Chaerocampa elpenor*-এর পুং প্রাণী অন্য মথ প্রজাতি *Metopsilus porcellus* এর সঙ্গে প্রজনন করতে সমর্থ হলেও পুং মথটির পুং জননাঙ্গ বা শিশ্নটি (Penis) তুলে নিতে ব্যর্থ হয় এবং যার ফলে স্ত্রী প্রাণী ডিম্বমোচন (egg deposition) করতে পারে না।

11.3.1.5 আচরণগত বিচ্ছিন্নকরণ (Ethological isolation)

বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে আচরণগত বৈশিষ্ট্য দুটি পপুলেশন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য গড়ে তোলে ফলে এদের মধ্যে প্রজননের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। সাধারণতঃ পুরুষ প্রাণী একই প্রজাতির স্ত্রী প্রাণীকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পূর্বরাগ আচরণ দেখায়। যদি স্ত্রী প্রাণী প্রজননে সমর্থ হয় তবে পুং প্রাণীর ঐ আচরণে সাড়া প্রদান করে। একমাত্র একই প্রজাতির স্ত্রী প্রাণীই পুং প্রাণীর বিভিন্ন উদ্দীপনায় (যেমন—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ অথবা রাসায়নিক ইত্যাদি) উদ্দীপিত হয়। কিন্তু ভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী প্রাণীর পক্ষে ঐ উদ্দীপনা অর্থহীন হওয়াতে প্রজননগত স্বাতন্ত্রতা অক্ষুন্ন থাকে।

বিজ্ঞানী লেইনার (M. Leiner, 1934) এ প্রসঙ্গে দুটি প্রজাতির স্টিক্‌ল্‌ব্যাক মাছের (যথা—*Gasterosteus aculeatus* এবং *G. pungitius*) বাসা তৈরি ও স্ত্রী প্রাণীর উদ্দেশ্যে পুং প্রাণীর আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। নিকট প্রজাতি হলেও উপরোক্ত দুটি প্রজাতির আচরণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। ফলে একটি প্রজাতির স্ত্রী প্রাণী অন্য প্রজাতির পুং প্রাণীর আচরণ দ্বারা উদ্দীপিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না।

11.3.1.6 শারীরবৃত্তীয় বিচ্ছিন্নকরণ (Physiological isolation)

কোনও ক্ষেত্রে যদিও বা ভিন্ন প্রজাতির পুং ও স্ত্রী প্রাণীর মধ্যে প্রজনন ঘটে সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উভয়ের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যের জন্য নিষেকের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় বিচ্ছিন্নকরণ ঘটেছে।

ড্রোসোফিলা মাছির ক্ষেত্রে আন্তঃ প্রজাতি সংকরায়নের চেষ্টা করলে দেখা যায় যে স্ত্রী প্রাণীর জননাধারে পুং প্রাণী প্রদত্ত শুক্রাণু বেঁচে থাকে না। কোনও জৈবরাসায়নিক বিরূপতার জন্য শুক্রাণুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

11.3.2 পোস্ট জাইগোটিক কৌশল (Post zygotic mechanism)

প্রজনন হওয়ার পর জাইগোট সংকর প্রকৃতির হওয়ার জন্য বাঁচে না বা দুর্বল সংকর প্রাণী উৎপন্ন করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার পোস্ট জাইগোটিক কৌশল উল্লিখিত হল।

11.3.2.1 সংকর প্রাণীর মৃত্যু তথা দুর্বলতা (Hybrid inviability or weakness)

একে জিনঘটিত বৈষম্যতাও (genic disharmony) বলা চলে। এর কারণ সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব না হলেও দেখা গেছে যে নিষেক বা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর যে কোনও অন্তবর্তী দশায় ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে।

ভেড়া ও ছাগল সংকর প্রাণীর প্রাথমিক ভ্রূণ দশাগুলি স্বাভাবিক হলেও শাবকটি জন্মের বহু আগেই মারা যায় (Warick এবং Berry, 1949)। জিনের অবস্থানের অসাম্যতার জন্য *Drosophila miranda* স্ত্রী ও *D. pseudoobscura* পুরুষের সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন স্ত্রী অপত্য বেঁচে থাকলেও পুরুষ মাছি অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ মাছিগুলি বেশি দিন বাঁচে না।

11.3.2.2 সংকর প্রাণীর বন্ধ্যাত্য (Hybrid sterility)

কিছু আন্তঃপ্রজাতি সংকরায়ণের ফলে স্বাভাবিক জীবনীশক্তি সম্পন্ন সংকর অপত্য প্রাণী উৎপন্ন হলেও দেখা গেছে যে এরা বন্ধ্যা প্রকৃতির হয়। এই বন্ধ্যাত্য দুই প্রকারের হতে পারে—পরিস্ফুরণগত সংকর বন্ধ্যাত্য এবং পৃথকীকরণগত সংকর বন্ধ্যাত্য। প্রথম ক্ষেত্রে সংকর প্রাণীর জননাঙ্গ অস্বাভাবিক হয় অথবা মিয়োসিস ত্রুটিপূর্ণ হয় অথবা গ্যামেট উৎপাদন স্বাভাবিক হয় না। *Drosophila* মাছির ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রজাতি সংকরায়ণ, গরু ও মহিষের সংকরায়ণে প্রথমোক্ত প্রকারের সংকর বন্ধ্যাত্য লক্ষ্য করা যায়। পৃথকীকরণগত সংকর বন্ধ্যাত্যের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময়ে জোট বাঁধতে অক্ষম হয়। যেমন—মুলো (raddish) এবং বাঁধাকপির (cabbage) সংকরায়ণের ফলে উভয়ের নয়টি ক্রোমোজোম সংকর উদ্ভিদে সঞ্চালিত হলেও ঐগুলি জোঁড় বাঁধে না। ফলে এই উদ্ভিদগুলি যৌনজননের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।

11.3.2.3 F_2 সংকর প্রাণী উৎপাদনে ব্যর্থতা (F_2 Breakdown)

কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পূর্ণ জীবনীশক্তি সম্পন্ন এবং উর্বর F_1 সংকর প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এদের থেকে উৎপন্ন F_2 অপত্য প্রাণী অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল, অস্বাভাবিক, বন্ধ্যা এবং কম জীবনীশক্তি সম্পন্ন হয়। একেই F_2 সংকর প্রাণী উৎপাদনে ব্যর্থতা বা 'F_2 ব্রেক ডাউন' বলা হয়।

ড্রোসোফিলা মাছির নিকটাত্মীয় দুটি প্রজাতি *Drosophila pseudoobscura* এবং *D. persimilis* স্বাভাবিক ভাবে প্রজনন করে না। কিন্তু পরীক্ষাগারে এদের সংকরায়ণ সম্ভব এবং এদের F_1 সংকর মাছি পূর্ণ জীবনীশক্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু F_2 সংকর মাছি বন্ধ্যা হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তুলোর প্রজাতি *Gossypium arboreum* এবং *G. herbaceum* এর সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন F_1 উদ্ভিদ স্বাভাবিক হলেও F_2 অপত্য জনু দুর্বল বা উৎপাদনে ব্যর্থতা লক্ষ্য করা গেছে।

11.4 বিচ্ছিন্নকরণ ও প্রজাতি উদ্ভব (Isolation and species formation)

প্রজাতি উৎপাদনে বিচ্ছিন্নকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তরূপে স্বীকৃত হয়েছে। বিজ্ঞানী রেনশ্ (Rensch, 1923), মেয়ার (Mayr, 1942), সিম্পসন (Simpson, 1945) এবং অন্যান্য আরও বিজ্ঞানী বিচ্ছিন্নকরণের বিশদ্ গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। বিচ্ছিন্নকরণকে দুটি বিভাগে, যথা—ভৌগোলিক (geographic) এবং প্রজননিক (reproductive) ভাগ করা যায়। যখন কোনও একটি পপুলেশন ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার উদ্ভবের ফলে দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন প্রতিটি গোষ্ঠীতে নতুন মিউটশন, রিকম্বিনেশন ইত্যাদি শর্তগুলি কার্যকর হয়। এছাড়া বিবর্তনের অন্যান্য শর্তগুলি, যেমন—জেনেটিক ড্রিফ্ট্, প্রাকৃতিক নির্বাচন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। পপুলেশনের এই বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলি যদি দীর্ঘদিন এইভাবে অবস্থান করে তবে অ্যালোপ্যাট্রিক অর্থাৎ ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলি নতুন প্রজাতিতে পরিণত হতে থাকে। ক্রমশঃ ঐ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রজনন স্বাত্যন্ত্রতা গড়ে ওঠে। তখন তাদের কাছাকাছি আনলেও সভ্যগুলির মধ্যে প্রজনন ঘটে না।

অনুরূপ ঋতুকালীন, আচরণগত, শারীরবৃত্তীয় বিচ্ছিন্নকরণের দ্বারা কিস্‌প্যাট্রিক বা আঞ্চলিকভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে হঠাৎ কোনও মিউটেশন বারা পরিবর্তনের ফলে জেনোটাইপের পরিবর্তন তথা উপরোক্ত বিচ্ছিন্নকরণ ঘটে। এরপর প্রজননগত স্বাত্যন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিটি গোষ্ঠী নতুন প্রজাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রজাতিগুলি তাদের বিবর্তনগত ধারা অনুসরণ করতে থাকে।

11.5 সারাংশ

এই এককটিতে আপনারা শিখতে পেরেছেন যে,

● বিবর্তনে বিচ্ছিন্নকরণের গুরুত্ব কি হতে পারে। কারণ বিচ্ছিন্নকৃত পপুলেশনে বিভিন্ন বিবর্তনগত শর্তগুলি প্রবলভাবে কার্যকর হয়।

● বিচ্ছিন্নকরণ কাকে বলে এবং বিচ্ছিন্নকারক কৌশলগুলির প্রসার কত রকমের হতে পারে। জাইগোট গঠনের আগেই বিচ্ছিন্নকরণ কি ভাবে কার্যকর হয়।

● জাইগোট গঠন হলেও বিচ্ছিন্নকরণ কার্যকর হতে পারে। সংকর প্রাণীতে জিনঘটিত অসাম্যতার দরুন সংকর প্রাণীর অকালমৃত্যু, সংকর প্রাণীর বন্ধ্যাত্য, F_2 সংকর প্রাণীর উৎপাদনে ব্যর্থতা ইত্যাদি পোষ্ট জাইগোটিক বিচ্ছিন্নকারক কৌশলের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়।

● বিচ্ছিন্নকরণ ও প্রজাতি উদ্ভবের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা।

11.6 অনুশীলনী

a. প্রজাতি উদ্ভবের একটি অন্যতম শর্ত হল পপুলেশনের _____।

b. বিচ্ছিন্নকারক কৌশল নামটি প্রথম বিজ্ঞানী _____ চয়ন করেন।

c. জাইগোট গঠনের আগেই বিচ্ছিন্নকারক কৌশল কার্যকর হলে তাকে _____ কৌশল বলা হয়।

d. একটি পরিচিত প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নকরণ হল _____ প্রতিবন্ধকতা।

e. _____ পছন্দ-অপছন্দ পপুলেশনের দুটি গোষ্ঠীতে অন্তঃপ্রজনন হ্রাস করে।

f. সংকর প্রাণীর মৃত্যু তথা দুর্বলতা _____ ঘটিত বৈষম্যতাকে বোঝায়।

g. সংকর জাইগোট না বাঁচালে বা দুর্বল হলে _____কৌশল কার্যকর হয়।

h. স্ত্রী প্রাণীর জননাধারে পুং প্রাণীর শুক্রাণু বেঁচে থাকার অক্ষমতা একপ্রকার _____ বিচ্ছিন্নকরণ।

i. প্রাণীর পূর্বরাগ আচরণ একপ্রকার _____ বিচ্ছিন্নকরণ।

j. প্রাণীর জননাঙ্গের বিচ্ছিন্নতাকে _____ বিচ্ছিন্নকরণ বলা যেতে পারে।

11.7 উত্তরমালা

a. প্রিজাইগোটিক, b. বিচ্ছিন্নকরণ, c. ভৌগোলিক, d. যান্ত্রিক, e. আচরণগত, f. শারীর জাতীয়, g. ডবজান্স্কি, h. ঋতুকালীন, i. পোষ্ট-জাইগোটিক, j. জিন।

11.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

a. বিচ্ছিন্নকরণ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্নকরণ একটি তালিকা প্রস্তুত করে। বিচ্ছিন্নকরণ দ্বারা কিভাবে প্রজাতি উদ্ভব ঘটে তা বর্ণনা কর।

b. বিচ্ছিন্নকরণের বিভিন্ন প্রি-জাইগোটিক কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

c. বিচ্ছিন্নকরণের বিভিন্ন পোস্ট-জাইগোটিক কৌশল সম্পর্কে উদাহরণসহ বর্ণনা দিন।

d. বিচ্ছিন্নকরণের ঋতুকালীন ও আচরণগত দিকগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

e. পোস্ট জাইগোটিক বিচ্ছিন্নকরণে সংকর প্রাণীর মৃত্যু-দুর্বলতা ও বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

f. নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন—

1. ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নকরণ কি? উদাহরণ দিন।
2. পরিবেশগত বিচ্ছিন্নকরণ কি? উদাহরণ দিন।
3. যান্ত্রিক বিচ্ছিন্নকরণ কি? উদাহরণ দিন।
4. আচরণগত বিচ্ছিন্নকরণ কাকে বলে? উদাহরণ সহ লিখুন।
5. জিন ঘটিত বৈষম্যতা বলতে কি বোঝেন? এটি কি প্রকারের বিচ্ছিন্নকরণ তা লিখুন।
6. সংকর প্রাণীর বন্ধ্যাত্ব বলতে কি বোঝেন? এটি কি প্রকারের বিচ্ছিন্নকরণ।
7. F2 সংকর প্রাণী উৎপাদনে ব্যর্থতা বা 'F2 ব্রেকডাউন' বলতে কি বোঝেন? উদাহরণ দিন।
8. বিচ্ছিন্নকরণ ও প্রজাতি উদ্ভবে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

11.9 উত্তর মালা

ইউনিট 11 এর উপঅধ্যায়গুলির দ্রষ্টব্য।

একক 12 ❑ অভিযোজনমূলক বিকিরণ এবং অভিসরণ

গঠন

12.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

12.2 অভিযোজনমূলক বিকিরণ

12.3 অভিযোজনমূলক অভিসরণ

12.4 সারাংশ

12.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

12.6 উত্তরমালা

12.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

জীবিত প্রাণীরা নিজের পরিবেশে এবং জীবনযাত্রা প্রনালীর সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাইয়ে চলার জন্য নানারকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। নিত্য পরিবর্তনশীল পরিবেশ প্রাণীদের বেঁচে থাকার যে সমস্যা তৈরি করে, এই সকল বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে তারা তার সুন্দর সমাধান করে নেয়। প্রাণীরা নিজের পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাইয়ে চলতে এবং ঐ পরিবেশে সাফল্যের সঙ্গে প্রজনন কাজ সম্পাদন করতে সহায়তা করে, এই রকম বৈশিষ্ট্য অর্জন করাকেই অভিযোজন বলে। একই বংশ ধারার প্রাণী বিবর্তনের ক্রমধারায় নানা ধরনের সম্পূর্ণ বিভিন্ন মাত্রার অভিযোজনে অভিযোজিত হতে পারে, আবার বিভিন্ন বংশ ধারার প্রাণীসমূহ বিবর্তনের ক্রম ধারায় একই ধরনের অভিযোজনে অভিযোজিত হয়। অভিযোজন মূলক এই বিকিরণ ও অভিসরণই আমাদের বর্তমান পাঠের আলোচ্য বিষয়।

উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- অভিযোজন কী?
- অভিযোজন মূলক বিকিরণ কী?
- অভিযোজন মূলক বিকিরণের তাৎপর্য কী?
- অভিযোজন মূলক অভিসরণ কী?
- অভিযোজন মূলক অভিসরণের তাৎপর্য কী?

12.2 অভিযোজনমূলক বিকিরণ

প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসের মূলে রয়েছে অভিযোজনমূলক বিকিরণ, খাদ্য, বাসস্থান, বাসস্থানের মাধ্যম ও বাহ্যিক জৈব এবং অজৈব পরিবেশ এরাই। অভিযোজন মূলক বিকিরণের মূল চালিকা শক্তি।

বাসস্থানের মাধ্যম অনুসারে প্রাণীদের জলবাসী ও স্থলকর্মী হিসাবে বিকিরিত হতে দেখা যায়। আবার স্তলবাসী প্রাণীর গর্তবাসী, বৃক্ষবাসী, ভূমিবাসী হিসাবে বিকিরিত হয়। জলবাসী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক ও মিষ্টি জলের প্রাণী দেখা যায়। একই ভাবে খাদ্য গ্রহণের দিক দিয়ে প্রাণীরা শাকাশী, মাংসাশী, দানাভোজী ইত্যাদি নানা অভিযোজনে বিকিরিত হয়। এই ধরনের অভিযোজন মূলক বিকিরণ এক একটি বৃহৎ প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়। অভিযোজন মূলক বিকিরণ অন্যান্য ক্যাটিগরির ট্যাক্সনে (Taxonomic Category) দেখা গেলেও শ্রেণী এবং উপশ্রেণী পর্যায়ে বিশেষভাবে দেখা যায়। অভিযোজন মূলক বিকিরণ (Adaptive radiation) অপসারী বিবর্তনেরই (Divergent Evolution) একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট।

অসবর্ণ (H.F. Osborn ; 1910) প্রধানতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর নির্ভর করে অভিযোজন মূলক বিকিরণের একটি সূত্র রচনা করেন। তাঁর মূল বক্তব্যটি হল—একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল যদি আকারে যথেষ্ট বড় হয় এবং তার ভূসংস্থান, মৃত্তিকা গঠন, জলবায়ু ও উদ্ভিদ সমাবেশে উল্লেখাযোগ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহলে ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের অভিযোজনে অভিযোজিত প্রাণী গোষ্ঠীর উদ্ভব হবে। অঞ্চলটি যত বড় হবে, ততই বৈচিত্র্যময় হবে এবং প্রাণীদের বৈচিত্র্যও তত বৃদ্ধি পাবে। আদিম মূল প্রাণী গোষ্ঠী থেকে প্রাণী শাখাগুলি ক্রমেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। হাক্সলি (Huxley : 1974) অভিযোজন মূলক বিকিরণের সারমর্ম এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"বৃহৎ ধারায় পরিবেশগত অপসারণই অভিযোজন মূলক বিকিরণ (Adaptive radiation is ecological divergence in the grand manner)"। Strickberger (1996) তাঁর Evolution পুস্তকে অভিযোজন মূলক বিকিরণের নিম্নরূপ ধারণা দিয়েছেন—

একটি প্রজাতি বা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রজাতির গোষ্ঠী নতুন পরিবেশ বা ভৌগোলিক অঞ্চলে অপসারিত হয়ে ব্যাপক সংখ্যার প্রজাতি বিভাগ বা গোষ্ঠী বিভাগ ঘটালে তাকে অভিযোজন মূলক বিকিরণ বলে (The diversification of a single species or group of related species into new ecological or geographical zones to produce a large variety of species and groups)।

এই ধরনের অভিযোজনের ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ হতে পারে—

1. পূর্বের একটি বিরাট প্রাণীগোষ্ঠী ধীরে ধীরে বা হঠাৎ লুপ্ত হওয়ায় তাদের পরিত্যক্ত ক্ষেত্র, যেমন—ডাইনোসর প্রাণীগোষ্ঠী লুপ্ত হওয়ার পর স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ গোষ্ঠী থেকে বর্তমান স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর বিকিরণ (চিত্র-1)।

2. প্রতিযোগীশূন্য বিরাট বাসস্থান। যেমন—উন্নত স্তন্যপায়ী শূন্য অস্ট্রেলিয়ায় মেটাথেরিয়া স্তন্যপায়ীর বিকিরণ (চিত্র-2)।

3. পরস্পর নির্ভরশীল প্রজাতিগুলির মধ্যে একটি প্রজাতির অভিযোজনগত বিকিরণ হলে নির্ভরশীল প্রজাতিটিরও স্বাভাবিকভাবে অভিযোজনগত বিকিরণ হতে বাধ্য। যেমন—পরাগসংযোগী পতঙ্গস সুপ্তবীজী উদ্ভিদের বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে অভিযোজনগত ভাবে বিকিরিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

4. আগে থেকে আছে এমন একটি বৈশিষ্ট্য (preadaptive feature) সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে সহায়ক হয়ে দাড়ালে এইরকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীর অভিযোজনগত বিকিরণ হতে পারে। যেমন—শক্ত খোলসযুক্ত অ্যামিনিওটিক (Amniotic) ডিম থাকায় সরীসৃপ প্রাণীরা স্থলে নিজেদের অভিযোজিত করতে পেরেছে।

অনুশীলনী—1

a. অভিযোজন কী?

b. অভিযোজন মূলক বিকিরণ কাকে বলে?

c. অভিযোজন মূলক অভিসরণ কী?

d. অপসারী বিবর্তন কাকে বলে?

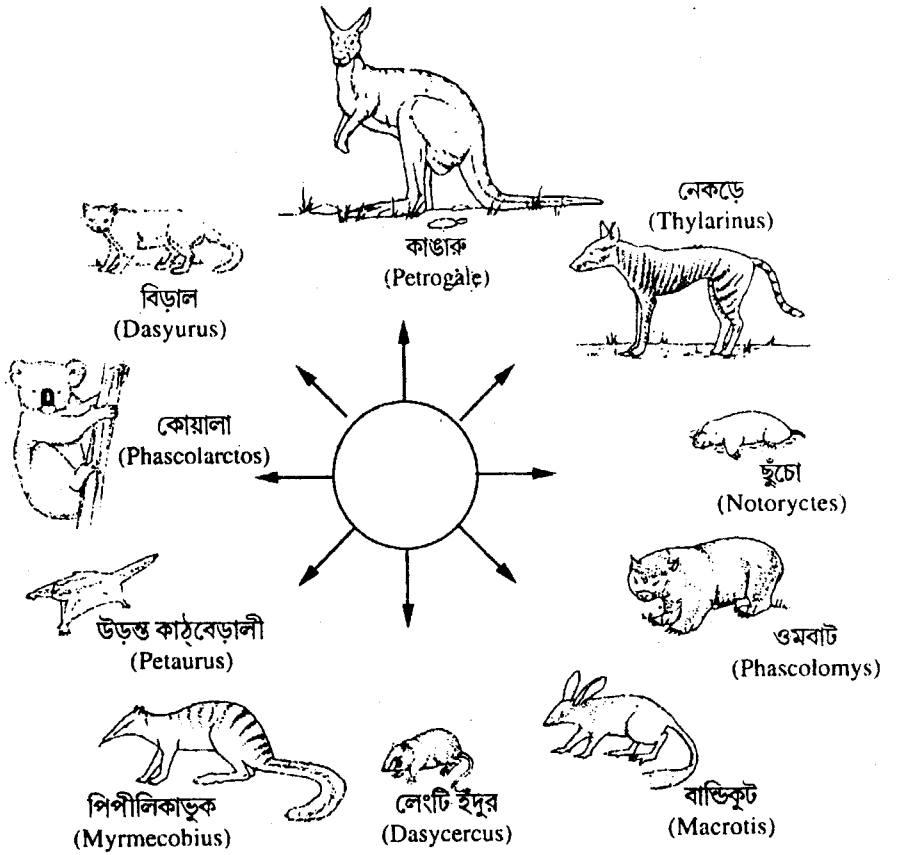

চিত্র 12.1 ঃ মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ীর অভিযোজনমূলক বিকিরণ।

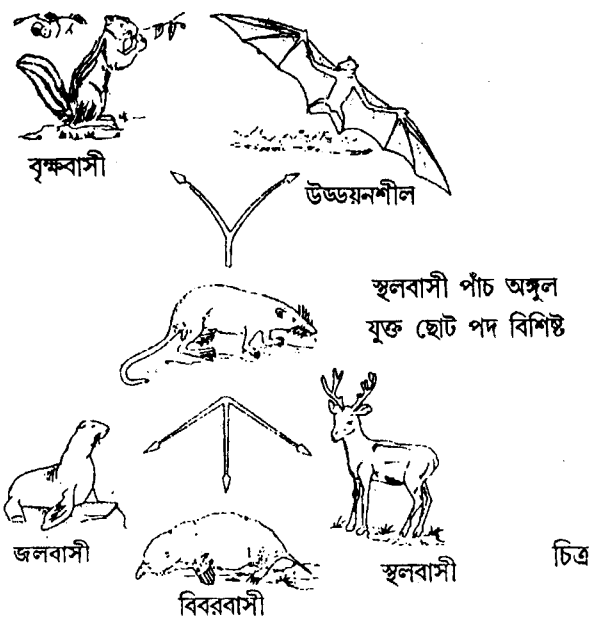

চিত্র 12.2 ঃ বাচ্চা প্রসবকারী স্তন্যপায়ীর অভিযোজন মূলক বিকিরণ

12.3 অভিযোজন মূলক অভিসরণ

অভিযোজনমূলক অভিসরণ (Adaptive Convergence) অভিসারী বিবর্তনেরই (Convergent Evolution) ভিন্ন প্রেক্ষাপট। এই প্রকার অভিসরণ মূলতঃ দু'ধরনের হতে পারে— প্রথমতঃ বসবাসের মাধ্যম নির্ভর এবং খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি নির্ভর। বিভিন্ন প্রাণী গোষ্ঠীর প্রাণীরা যখন একটি বিশেষ মাধ্যমে বসবাস করে বা একই ধরনের খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয় তখনই অভিযোজন মূলক অভিসরণের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আপনাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

সামুদ্রিক পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীর সংখ্যা এবং গোষ্ঠী বৈচিত্র্য বিপুল। মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে মুখ্য জলজ অভিযোজনে অভিযোজিত প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম হলো মাছ। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণের জন্য ফুলকা যন্ত্র ছাড়াও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় এবং অঙ্গসংস্থানিক গঠন মাছ জাতীয় প্রাণীগোষ্ঠীকে জলের মুখ্য প্রাণীগোষ্ঠী হিসাবে অভিযোজিত করেছে। জলে মুখ্য মেরুদন্ডী প্রাণী মাছ ছাড়াও অন্যান্য গৌন জলবাসী মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীগোষ্ঠীর সিটোসিয়া (Cetacea), সাইরেনিয়া (Sirenia) বর্গের প্রাণী এবং সরীসৃপ গোষ্ঠীর লুপ্ত ইকথিওস্তরিয়া প্রাণীদের মধ্যে মাছের ন্যায় জলজ অভিযোজনের নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। মেটাথেরিয়ান স্তন্যপায়ী এবং ইউথেরিয়ান স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও এই ধরনের অভিযোজন মূলক অভিসরণের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে মারসুপিয়াল মোল এবং ইউথেরিয়ান মোলের গর্তবাসী অভিযোজন এবং মারসুপিয়াল উড়ন্ত কাঠবেড়ালী (Flying phalanger) এবং ইউথেরিয়ান উড়ন্ত কাঠবেড়ালীর উড্ডয়ন অভিযোজন। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি—ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীগোষ্ঠীর প্রাণীরা যখন একই ধরনের অভিযোজনে অভিযোজিত হয় তাকে অভিযোজন মূলক অভিসরণ বলে। এই প্রসঙ্গে গৌণ এবং মুখ্য অভিযোজনের বিষয়টিও বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত। কোন একটি বিশেষ পরিবেশে একটি প্রাণী গোষ্ঠীর সিংহভাগের বেঁচে থাকার ও প্রজননের জন্য অভিযোজনকে বলা যেতে পারে মুখ্য অভিযোজন। যেমন—জলে বসবাসের ও প্রজননের জন্য মাছ জাতীয় প্রাণীর অভিযোজন। আবার একই গোষ্ঠীর বেশিরভাগ প্রাণী একটি পরিবেশে মুখ্য অভিযোজনে অভিযোজিত হলেও বিশেষ কোন কারণে প্রাণীগোষ্ঠীর অংশ বিশেষ সম্পূর্ণ অন্যরকম পরিবেশে অভিযোজিত হলে তাকে গৌণ অভিযোজন বলে। যেমন—বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীগোষ্ঠী স্থলবাসী কিন্তু তিমি জাতীয় প্রাণী কোন এক বিশেষ কারণে জলবাসী যদিও এদের মূল স্তন্যপায়ী চরিত্রের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

অনুশীলনী—2

a. মুখ্য অভিযোজন কাকে বলে?

b. গৌণ অভিযোজন বলতে কি বোঝায়?

c. তিমি জলে গৌণ অভিযোজনে অভিযোজিত—কেন?

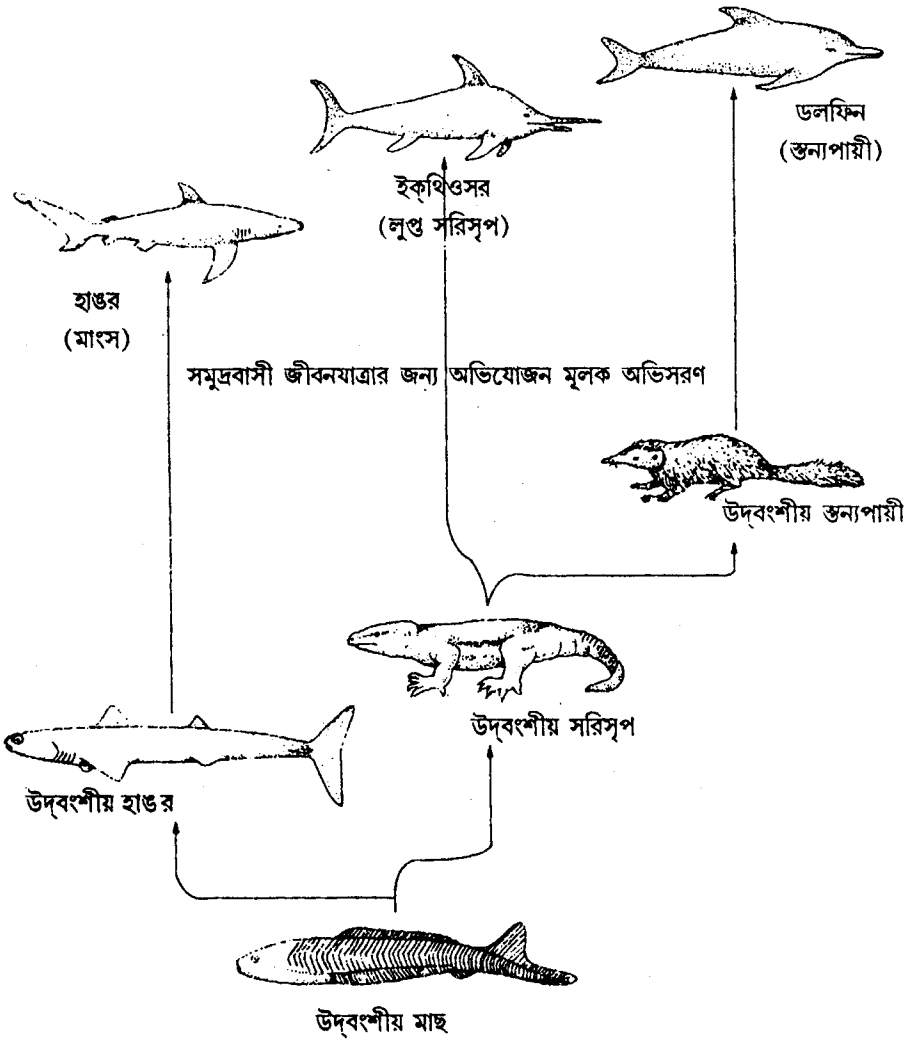

চিত্র 12.3 ঃ অভিযোজনমূলক অভিসরণ।

12.4 সারাংশ

এই এককটিতে আপনারা শিখতে পেরেছেন যে,

● বিবর্তনের একই ধারার প্রাণীগোষ্ঠীর নানাভাবে অভিযোজিত হওয়াকেই অভিযোজন মূলক বিকিরণ বলে।

● অভিযোজন মূলক বিকিরণের মূলে রয়েছে বাসস্থান ও খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত আচরণ তত্ত্ব।

● অভিযোজন মূলক বিকিরণ অন্যান্য ক্যাটিগোরির ট্যাক্সনে দেখা গেলেও শ্রেণী (class)-এবং উপশ্রেণী (subclass) পর্যায়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

● অভিযোজন মূলক বিকিরন অপসারী বিবর্তনেরই ভিন্ন প্রেক্ষাপট।

● বিবর্তনের বিভিন্ন ধারার প্রাণীগোষ্ঠী একই ধরনের অভিযোজনে অভিযোজিত হলে তাকে অভিযোজন মূলক অভিসরণ বলে।

● অভিসারী বিবর্তন অভিযোজন মূলক অভিসরণেরই ভিন্ন প্রেক্ষাপট।

● কোন একটি বিশেষ পরিবেশে একটি প্রাণীগোষ্ঠীর সিংহ ভাগের বেঁচে থাকার ও প্রজননের অভিযোজনকে বলা হয় মুখ্য অভিযোজন।

12.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

a. অভিযোজন মূলক বিকিরণ কাকে বলে—আলোচনা করুন।

b. অভিযোজন মূলক অভিসরণ কী?

12.6 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

a. কোন নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য জীবের গঠনগত ও শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তনকে অভিযোজন বলে।

b. 12.2 দেখুন, c. 12.2 দেখুন, d. 12.2 দেখুন।

অনুশীলনী—2

a. 12.2 দেখুন, b. 12.2 দেখুন।

c. মূল প্রাণীগোষ্ঠী অর্থাৎ স্তন্যপায়ীরা স্থল অভিযোজনে অভিযোজিত, কিন্তু তিমি স্তন্যপায়ী হওয়া সত্ত্বেও জলজ অভিযোজনে অভিযোজিত, তাই তিমির জলজ অভিযোজনকে গৌণ অভিযোজন বলে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

a. অভিযোজন মূলক বিকিরণ অংশটি দেখুন।

b. অভিযোজন মূলক অভিসরণ অংশটি দেখুন।

একক 13 ❑ কার্যকরী অভিযোজন

গঠন

13.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

13.2 উড্ডয়নশীল প্রাণীদের কার্যকরী বায়ু গতিবিদ্যার নীতি সহায়ক বৈশিষ্ট্য সমূহ।

13.3 মরুবাসী প্রাণীদের শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা রক্ষাকারী কার্যকরী অভিযোজন সমূহ।

13.4 বর্ণ পরিগ্রহণ এবং অনুকৃতি

13.5 বর্ণ পরিগ্রহণ এবং অনুকৃতির বিবর্তনগত তাৎপর্য।

13.6 সারাংশ

13.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

13.8 উত্তরমালা

13.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

প্রকৃতিতে প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত হলো নিজেকে পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ঠিক মতো খাপ খাইয়ে চলা বা অভিযোজিত হওয়া। নানা মাধ্যমে গমনা-গমনের অভিযোজনগুলির মধ্যে বায়ুতে ভর করে উড়ার অভিযোজন অন্যতম। নানা প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে পক্ষী শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই অভিযোজনের সম্পূর্ণতা লক্ষণীয়। আবার তপ্ত মরুভূমিতে প্রায় জলশূন্য অবস্থায় এবং খাদ্যহীন পরিবেশে অভিযোজনের বৈশিষ্ট্যগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। এই বিষয়ে 'মরু জাহাজ' উটের জীবনযাত্রা আপনাদের সকলেরই কম-বেশি জনা আছে। এছাড়াও নানারকম বৈচিত্র্যময় প্রাণী পাওয়া যায়, যাদের মরু অভিযোজন পঠন পাঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণ পরিগ্রহণ এবং অনুকৃতিও জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে অন্যতম অভিযোজন। শিকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং শিকার ধরার অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে এই ধরনের অভিযোজনের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- উড্ডয়নশীল প্রাণীদের কার্যকরী বায়ু গতিবিদ্যার নীতি সহায়ক বৈশিষ্ট্য সমূহ। বিশেষতঃ পক্ষিকূলের বায়ু গতিবিদ্যার নীতি সমূহ।
- মরুবাসী প্রাণীদের শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা বজায়কারী কার্যকরী অভিযোজন সমূহ।
- বর্ণ পরিগ্রহণ এবং অনুকৃতির বিভিন্ন উদাহরণ।
- বর্ণ পরিগ্রহণ এবং অনুকৃতির বিবর্তনগত তাৎপর্য।

13.2 উড্ডয়নশীল প্রাণীদের কার্যকরী বায়ু গতিবিদ্যার নীতি সহায়ক বৈশিষ্ট্য সমূহ

সক্রিয়ভাবে উড্ডয়নে সমর্থ প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লুপ্ত টেরোসর, বাদুড় ও পক্ষী গোষ্ঠীর প্রাণীরা। এদের মধ্যে উড্ডয়ন অভিযোজনের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে পক্ষীকূল। উড্ডয়নের জন্য প্রাণীকে বায়ু মাধ্যমে উড়ে যেতে হয় এবং বায়ু গতিবিদ্যার সমস্ত রকম জটিল কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়। উড্ডয়নশীল প্রীদের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—

1. অভিকর্ষজনিত বলকে প্রতিরোধ করার জন্য একটি বিপরীত উর্ধ্বমুখী বলের সৃষ্টি। এই উর্ধ্বমুখী বল দেহের পেশী এবং পরিবেশের মাধ্যম থেকে উৎপন্ন হয়।

2. উড়ার সময় ড্রাগ (Drag) বা মাধ্যমের বাধা হ্রাসকরণ।

3. উড্ডয়নের গতি ইচ্ছামত হ্রাস বা বৃদ্ধি করা।

4. স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে আরোও পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য কতগুলি গৌণ অভিযোজনের প্রয়োজন হয়। যেমন—

5. ওজন হাল্কা ও দেহকান্ড দৃঢ় করার অভিযোজন।

6. শক্তিশালী উড্ডয়ন পেশীর শক্তিকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা এবং শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য নানারকম অভিযোজন। নিচে প্রতিটি অভিযোজন বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

13.2.1 অভিকর্ষজ বল প্রতিহত করে বায়ুতে ভাসার অভিযোজন ঃ

উড্ডয়নশীল প্রাণীদের বায়ুতে ভেসে থাকার জন্য অভিকর্ষ বল প্রতিরোধকারী একটি উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োজন। একই উচ্চতায় চড়ার সময় দেহের ওজনের সমান অভিকর্ষ বল প্রতিরোধ করলে চলে কিন্তু উপরের দিকে উড়ার সময় বা নিম্নমুখী বায়ু প্রবাহে উড়ার সময় উর্ধ্বমুখী বল দেহের ওজনের চেয়ে বেশি হওয়া প্রয়োজন। এই উর্ধমুখী বল সৃষ্টির মূলে পাখির ডানারগঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উড্ডয়নশীল পাখির ডানার উপরিতল উত্তল এবং নিম্নতল অবতল। এই ধরনের ডানার গঠনকে বলা হয় ক্যাম্বার যুক্ত ডানা (Cambered wing)। ক্যাম্বার যুক্ত ডানার প্রস্থচ্ছেদের সম্মুখপ্রান্ত এবং পশ্চাদ্‌প্রান্তকে একটি রেখা দিয়ে যোগ করলে রেখাটিকে কর্ড (Chord) বলা হয় (চিত্র—13.1)। ডানায় অস্থি এবং পেশির বিন্যাসের তারতম্যের জন্য সম্মুখ প্রান্তটি স্থূল হয়। অনেক সময় ডানার প্রথম আঙুলটির চারপাশে কতগুলে পালক দ্বিতীয় একটি গৌণ ডানার সৃষ্টি করে। এটিকে আলুলা (Alula) বলা হয় (চিত্র—13.1)। এই ধরনের দুটি ডানার মধ্যে ডানাগর্ত (wing-slot) পাখির উর্ধ্বমুখী উড্ডয়ন বল অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। ডানা মেলে উড়ার সময় পালকগুলির মধ্যবর্তী স্থানেও এ'ধরনের ডানাগর্ত তৈরি হয়।

উড়ার সময় পাখি ডানার সম্মুখ প্রান্তটি ওপরের দিকে তুলে দেয়, ফলে ডানাটি বায়ু প্রবাহের গতিরেখার সঙ্গে একটি কোন তৈরি করে—এই কোনটিকে আক্রমণ কোন (Angle of attack) বা α বলে (চিত্র—13.2)। এই রকম অবস্থাতে ক্যাম্বার যুক্ত ডানার উপরিতলে বায়ুপ্রবাহদ্রুত হয় এবং নিচের তলে বায়ুপ্রবাহের গতি অপেক্ষাকৃত কম হয়। ফলে বারনৌল্লির (Bernoulli) উপপাদ্য অনুযায়ী ডানার উপরের বায়ুচাপ নিচের তুলনায় কম হয়। এই অবস্থায় ডানার উপরে উর্ধ্বমুখী যে বল কাজ করে তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, বায়ু প্রবাহের সমরেখার অভিমুখে বলটিকে ড্র্যাগ (Drag) বা প্রতিরোধ বল এবং ড্র্যাগের সঙ্গে সমকোণে স্থাপিত উর্ধ্বমুখী বলটিকে বলা হয় উত্তোলক বল বা Lift। এই দুটি বল চাপ কেন্দ্র (centre of pressure)-এ কার্যকরী হয়

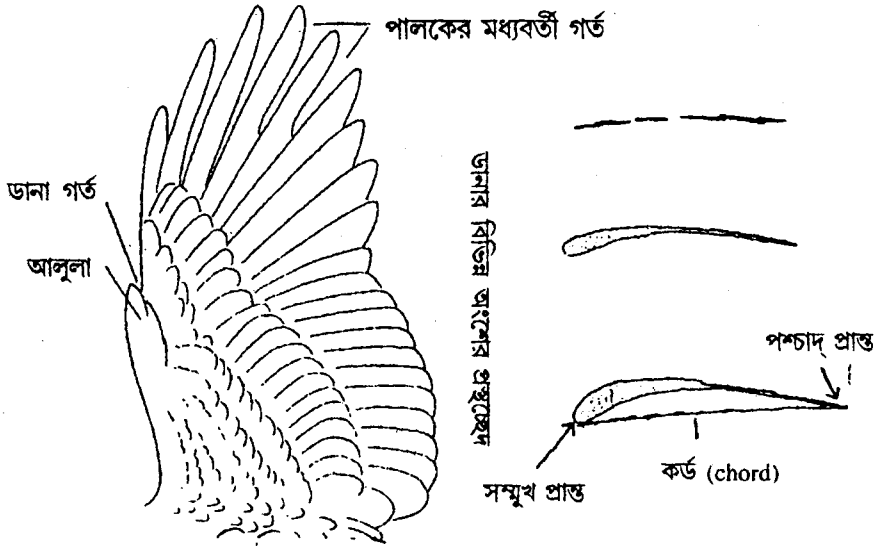

চিত্র 13.1 ঃ পাখির ডানার বিভিন্ন বায়ু গতিবিদ্যা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য।

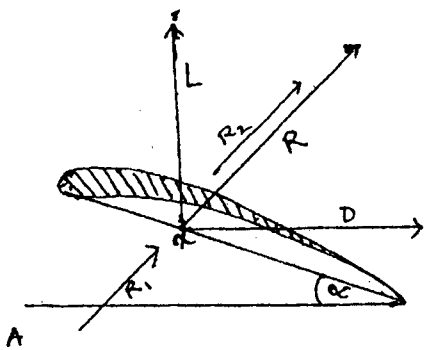

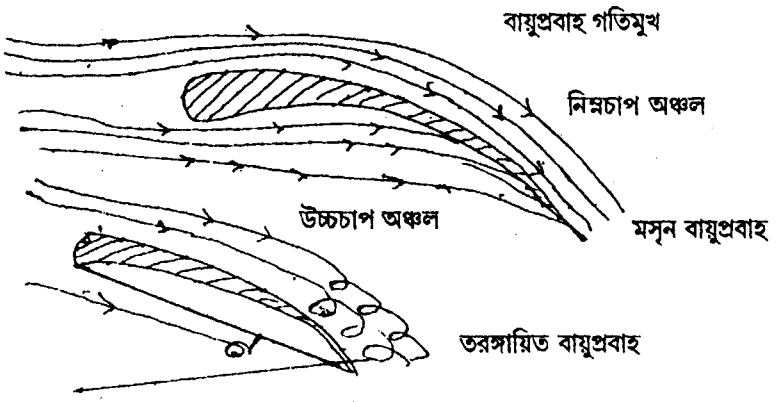

চিত্র 13.2 ঃ A : α = আক্রমণ কোণ। L = উত্তোলন বল। D = ড্রাগ বা প্রতিরোধী বল। x = চাপকেন্দ্র। মোট উত্তোলক বল = R (R_1+R_2)।

B : মসৃণ বায়ুপ্রবাহ ঃ ডানার উপরতলে বায়ুর গতিবেগ নিচের তুলনায় বেশি হওয়ায় উপরের বায়ুচাপ নিচের তুলনায় কম হয়।

C : আক্রমণ কোণ (α) 15° বেশি হওয়ায় ডানায় বায়ুপ্রবাহ অমসৃণ ও তরঙ্গায়িত হয়।

(চিত্র—13.3)। চাপকেন্দ্রটি ডানার সম্মুখ প্রান্ত (Leading edge) থেকে 1.4 থেকে 1.2 দূরত্বে ক্রিয়াশীল। এ'ক্ষেত্রে মোট কার্যকরী বল (Total reaction) হলো Lift এবং Drag এর মোট Reaction (R)। এই বলটিই পাখিটিকে বায়ুবাহিত হতে সাহায্য করে। আক্রমণ কোন $\alpha 0^{\circ}$ থেকে যতই বাড়তে থাকে উত্তোলক বলও ততই বাড়তে থাকে এবং 15° তে সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। a বা আক্রমণ কোন 15° বেশি হলে ডানার উপর বায়ু প্রবাহ মসৃণ (laminar) না হয়ে তরঙ্গায়িত হয় এবং বারনৌল্লির উপপাদ্য অনুযায়ী উত্তোলক বল আর কাজ করতে পারে না। এই অবস্থায় উড্ডয়নশীল প্রাণীকে মাটিতে নেমে আসতে হয়। এই বিষয়টিকে অবতরণ বা stalling বলে। উড়ার সময়পাখির ডানা উড্ডয়ন পেশির বিশেষ সঞ্চালন ব্যবস্থার জন্য প্রথমে সামনে ও উপরে উঠেযায় এবং অব্যবহিত পরেই পিছনে ও নিচের দিকে নেমে আসে। ডানা সঞ্চালনের প্রথম অবস্থাকে বলা হয় রিকোভারি স্ট্রোক (Recovery stroke) এবং দ্বিতীয় অবস্থাকে বলা হয় পাওয়ার স্ট্রোক (power stroke)। এই ধরনের ডানা সঞ্চালন এবং ডানা গর্তের (wing slot) বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট বল বা থ্রাস্ট (Thrust) ড্র্যাগ (Drag) কে প্রতিহত করে পাখিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ভার লাঘবকারী অভিযোজন ঃ হালকা, পাতলা, বায়ুগহ্বর যুক্ত কঙ্কালতন্ত্র পাখির দেহের মোট ওজনের মাত্র 7% স্তন্যপায়ীদের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এছাড়া পালক থাকার জন্যও মোট আয়তনের তুলনায় ওজন অনেক কম হয়।

শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অভিযোজন ঃ উড্ডয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। উড্ডয়নশীল প্রাণীর পাচনতন্ত্রের খাদ্য হজম ক্ষমতা অনেক বেশি। প্রতিটি কলা-কোষে প্রচুর অক্সিজেন সরবরাহের জন্য প্যারাব্রঙ্কাস (Parabronchus) ও বায়ুথলী **(Air sacs) যুক্ত ফুসফুস বিশেষ ভূমিকা পালন করে।** পাখীর শ্বসনতন্ত্র অত্যন্ত উন্নত ও পরিকল্পিত ভাবে সাজানো তাদের খেচর অভিযোজনের জন্য। দ্বিশ্বসন পদ্ধতিতে পাখীর শ্বসন কার্য সম্পন্ন হয়। বায়ু ধলি বা air sac-এর সাহায্যে এই কার্য সম্পন্ন হয়। বায়ু থলি বেশীরভাগ পৃষ্ঠীয় দিকে অবস্থান করে এবং হাড়ের মধ্যেও সঞ্চালিত হয়। বায়ুথলির অবস্থান অনুসারে তাদের ভাগ করা হয়। অ্যাবডোমিনাল বায়ুথলিটি পাচন নালীর কুণ্ডলির মধ্যেও প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে উৎপন্ন হয়ে ইনফ্রাঅরবিটাল সাইনাস, ক্ল্যাভিকুলারে বায়ুথলি, হিউমেরাস, স্টারনাম, সারভিকাল, অন্ত্র থোরাসিক, পশ্চাৎ থোরাসিক ও অ্যাবডোমিনাল বায়ুথলি বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। শ্বসন প্রক্রিয়ার ইনস্পিরেশন (inspiration) বা বায়ু গ্রহণ করার সময় ফুসফুস থেকে াবয়ু বিভিন্ন বায়ুথলিতে প্রবেশ করে। ফুসফুসের মধ্যে অসংখ্য রক্তজালিকা থাকায় বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। বায়ুথলিতে রক্তজালিকা প্রায় থাকেই না, সে কারণে বায়ুগ্রহণ কালে ঐস্থানে রক্তে জারণ হয় না। Expiration বা বায়ু নিষ্ক্রমণের সময় ফুসফুস থেকে কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2) নির্গত হয় তখন বায়ুথলির বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং একইভাবে রক্তজারণ হয়। এইভাবে দুইভাবেই অক্সিজেন গ্রহণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বায়ুথলির উপস্থিতিতে দেহের ওজন হালকা হয় এবং উড়বার সময় যান্ত্রিক ঘর্ষণকে প্রতিহত করে।

পাখীর ফুসফুস জোড়া বক্ষপাঁজরের খাঁজে অবস্থান করে এবং প্রসারণ বা সংকোচন (non-expansible) ক্ষমতা থাকে না। বায়ুথলির সাহায্যে বায়ুকে সংগ্রহ করতে পারে এবং দেহের তাপমাত্রাকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। পাখি অনেক সময়ই ভূপৃষ্ঠের অনেক উপরে যেমন ৬৫০০ মিটার উঁচুতে ওড়ে। এমনকি ৮২০০ মিটার উঁচু পথেও পরিযায়ী পাখীরা উড়তে সক্ষম হয়। শক্তি সঞ্চয়ের হার বেশী বলে এটা সম্ভব হয়।

স্বরক্ষেপন (vocalization) শ্বসনের আর একটি কাজ। পাখীদের শ্বাসনালী বা ট্র্যাকিয়া বিভক্ত হয়ে যখন ফুসফুসে প্রবেশ করে, মধ্যবর্তী স্থানে সিরিংক্স (syrinx) বা স্বরযন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি তরুণাস্থি দিয়ে এই যন্ত্রটির গঠন হয় এবং অনেকগুলি পেশী স্বরযন্ত্রটিতে স্বরক্ষেপনে সাহায্য করে।

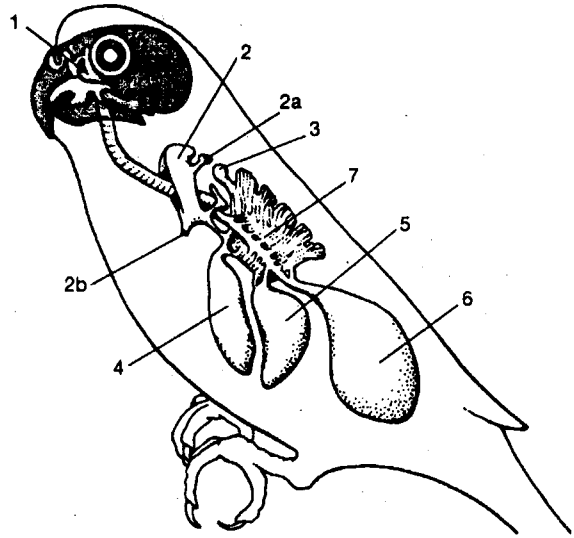

The lung and air-sac system of the budgerigar. (Only the left side is shown.) 1. Infraorbital sinus; 2. clavicular air sad; 2a. axillary diverticulum to the humerus; 2b. sternal diverticulum; 3. cervical air sac; 4. cranial thoracic air sac; 5. caudal thoracic air sad; 6. abdominal air sacs; 7. parabroncual lung.

ফুসফুল ও বায়ুথলির অবস্থান (কেবলমাত্র বাঁদিকের)

(Ref–Vertebrate life by Pough, Janis & Heiser, sixth Edition)

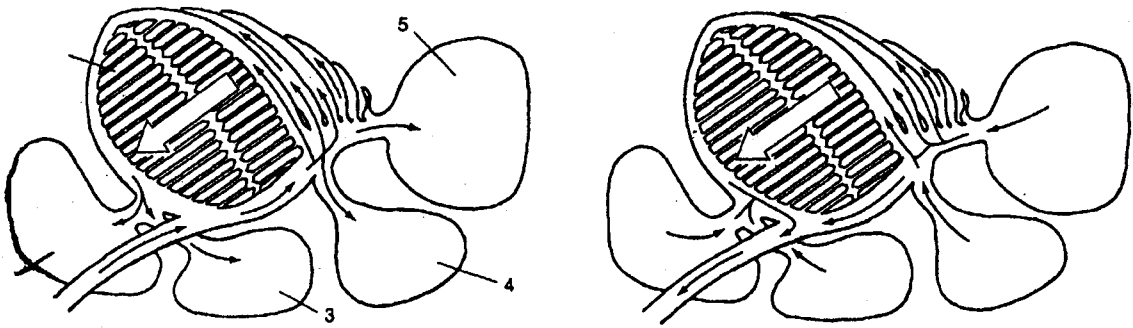

Pattern of airflow during inspiration and expiration. Note that air flows through the parabronchial both phases of the respiratory cycle. 1. Parabronchial lung; 2. clabicular air sac; 3. cranial thoracic air sac; thoracic air sad; 5. abdominal air sacs.

পাখীর শ্বাস ও নিশ্বাসের সময় বায়ুর গতিপথ।

(Ref. — Vertebrate life VI Edition).

পেশিতন্ত্র ঃ ডানা সঞ্চালনের জন্য বক্ষপেশি খুবই উন্নত ধরনের পেকটোরালিস মেজর (Pectoralis major) এবং পেকটোরালিস মাইনর (Pectoralis minor) নামের পেশিদ্বয় বক্ষ অস্থির (Sternum) উঁচু অংশ অর্থাৎ কিল (keel) এ যুক্ত থাকে (চিত্র 13.3)।

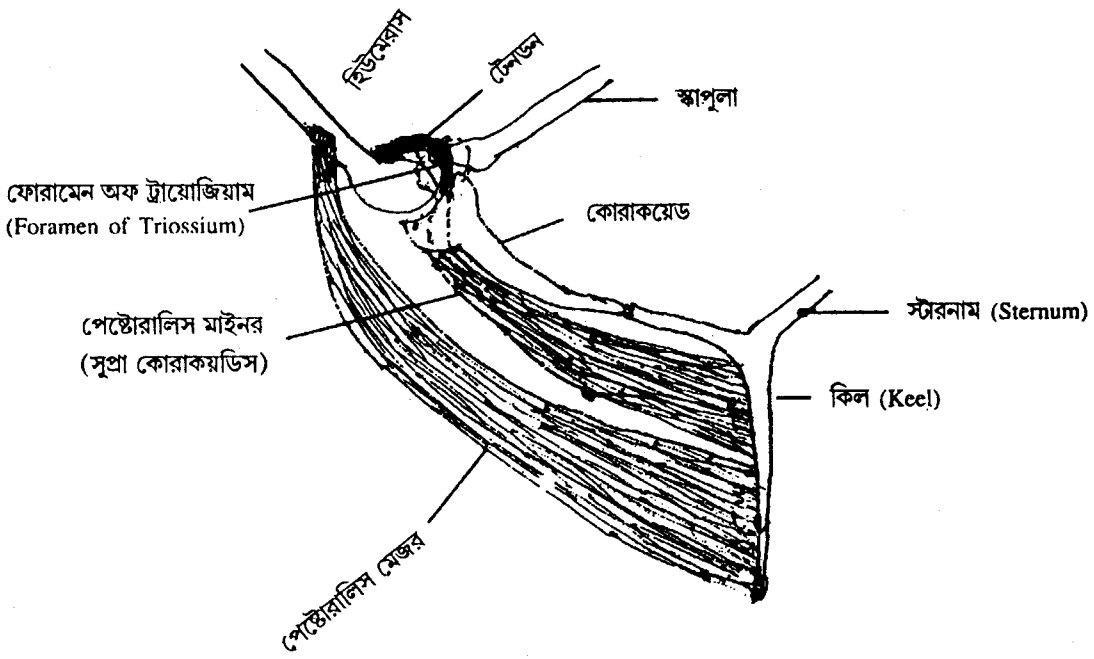

চিত্র-13.3 : পাখির উড্ডয়ন সংক্রান্ত পেশিসমূহ।

স্ট্রিমলাইন দেহ ঃ দেহ অবয়ব, উড়ার সময় মাকুর মতো আকৃতি প্রাপ্ত হলে বায়ুর মধ্যে গতি অব্যাহত রাখতে সুবিধা হয়।

স্নায়ুতন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ঃ পাখির মস্তিষ্কের বিশেষ অঞ্চল বা হাইপারস্ট্রিয়াটাম (Hyperstriatum) পেশি সমন্বয় সাধনের সংযোগ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত তাই উড়ার সময় ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা খুবই নিখুঁত প্রকৃতির। পাখির দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর এবং স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে দ্রুত সমন্বয় সাধনকারী। স্নায়ুতন্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমন্বয় খুবই উন্নত প্রকৃতির।

অনুশীলনী—1

a. দুটি উড্ডয়ন পেশির নাম লিখুন।
b. ক্যাম্বার কী?
c. আক্রমণ কোন কাকে বলে?
d. হাইপারস্ট্রিয়াটাম কোথায় দেখা যায়?
e. কিল (keel) কী?

13.3 মরুবাসী প্রাণীদের শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা বজায়কারী কার্যকরী অভিযোজন

যে কোন উষ্ণ মরুভূমির কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

চরমভাবাপন্ন তাপমাত্রা এবং প্রায় আদ্রতাহীন বাতাস ঃ শুষ্ক বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকায় মেঘ তৈরি হয় না, ফলে সূর্যকিরণ সরাসরি ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। একই কারণে রাতে দ্রুত তাপ বিকিরণের ফলে খুবই তাড়াতাড়ি শীতলতা নেমে আসে। গ্রীষ্মকালে মরুপৃষ্ঠের উষ্ণতা 60°C থেকে 70°C পর্যন্ত হতে পারে এবং বায়ুর তাপমাত্রা 40°C থেকে 50°C পর্যন্ত হতে পারে। আবার রাতে ভূ-ভাগ তীব্র শীতল হয়ে ওঠে।

স্বল্প বৃষ্টিপাত ঃ বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 15 ইঞ্চিরও কম। ফলে পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

খাদ্যাভাব ঃ বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় কিছু কাঁটা জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া প্রাথমিক উৎপাদক (Primary producer) প্রায় দেখা যায় না।

মরুঝড় ঃ দ্রুত গরম বায়ু চলাচল এবং ধূলিকণার সমাবেশে সর্বদা মরুঝড় বা ধূলিঝড় মরুভূমির নিত্য বৈশিষ্ট্য।

প্রায় জলহীন, উদ্ভিদহীন, শুষ্ক উত্তপ্তবালুকাময় মরুভূমিতে প্রাণধারণ করা খুবই কষ্টকর, তবুও মরুভূমিতে নানারকম প্রাণীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাণী হলো— **সরীসৃপ ঃ** ঝুমঝুমি সাপ *(Crotalus horridus),* মরু গিরগিটি *(Moloch horridus),* সিং ওয়ালা ব্যাঙ *(Phrynosoma* sp.)।

পক্ষী ঃ এমুপাখী *(Dromaius),* উটপাখী *(Struthio),* **স্তন্যপায়ী ঃ** উট *(Camelus dromedarius),* ক্যাঙারু র‍্যাট, গেজেল *(Gazella),* ভূমি কাঠবেড়ালী ইত্যাদি।

আমরা এখানে মূলতঃ স্তন্যপায়ী মরুচারী প্রাণীদের শারীর বৃত্তীয় সাম্যাবস্থা বজায়কারী অভিযোজনগুলি আলোচনা করবো। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষারকত্ব, অম্লত্ব, আয়ন সাম্যবস্থা, তাপমাত্রা, জলীয় পরিবেশ বজায় রাখতে হয়, অন্যথায় শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী বিপর্যস্ত হয়ে প্রাণীটির মৃত্যু ঘটতে পারে। স্তন্যপায়ীদের শরীরের তাপমাত্রা 37°C এর উপরে 40°-50° তে বা 20°C এর নিচে নেমে গেলে সমস্ত স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঠিকমতো মূত্র উৎপাদন না হলে ইউরিয়া জমে কলাস্থান (Tissue) বিষাক্ত হয়ে ওঠে। মরুভূমির উত্তপ্ত ও জলহীন পরিবেশে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বিশেষ কতগুলি অভিযোজন ব্যবস্থা অবলম্বন করে শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। এই প্রাণীদের অভিযোজন সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—

উষ্ণদেহের প্রাণীদের প্রধানত দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মরুভূমিতে। প্রথমত প্রাণী ও পরিবেশের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে তার ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি হয়। বেশীর ভাগ পরিবেশেই এন্ডোথার্ম প্রাণী (Endotherm) দের দেহ তাপমাত্রা (Body temperature) পরিবেশের বায়ুর তাপমাত্রা থেকে বেশী থাকে। ঐ রকম অবস্থায় তাপ প্রাণীর দেহ থেকে বিকিরণ হয়ে যায় পরিবেশে এবং তাপ নিয়ন্ত্রণকারী শারিরীক বিপাক (metabolism) প্রতিক্রিয়ায় দেহের ভিতরকার এবং বাইরের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে। যদিও খুব শীতল অবস্থায় মেরু শেয়ালের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম হয় কারণ পরিবেশের তাপমাত্রা তখন –40°C থাকে।

মরুভূমিতে পরিবেশের বায়ুর তাপমাত্রা 40-50^{0}C হয় এবং ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা থাকে তারও অনেক বেশী প্রায় 60-70^{0}C. এক্ষেত্রে মরু অভিযোজিত প্রাণীরা তাপ বিকিরণ করার বিপরীতে দেহকে অভিযোজিত করে প্রাণীর দেহের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে নেয়।

কিছু মরুপ্রাণী শক্তি (energy) এবং জলের অপ্রতুতার সময় বিশেষ ধরনের বিপাক ক্রিয়ায় দেহ তাপমাত্রাকে স্থিতিশীল রাখার অবস্থা রাখে অর্থাৎ তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই পদ্ধতিকে torpor বলে।

torpor অবস্থায় শারীরিক প্রতিক্রিয়া—

টরপর অবস্থায় দেহ তাপমাত্রা অনেক হ্রাস পেতে পারে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণও কিছুটা পরিমাণে থাকে। গভীর ভাবে (deep torpor) টরপরের সময় প্রাণীরা দেহতাপমাত্রাকে 1^{0}C-এও নামিয়ে আনতে পারে। শীতলমেরুর কাঠবেড়ালী দেহ তাপমাত্রাকে অতিশীতল করে –2.9^{0}C এ বাজয় রাখে। যদিও প্রাণীটি উষ্ণ দেহ তাপমাত্রার।

সাধারণ ভাবে মরুভূমির বসবাসকারী বাদুড় ও রোডেন্টস্ জাতীয় প্রাণীদের দেহতাপমাত্রা ঐ অবস্থায় 8^0–15^{0}C অবধি হ্রাস পেতে পারে।

টরপর অবস্থা বৃহৎ প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। দেহাকৃতি, ওজনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত থাকে।

Lawrence Wang (1978)-এর রিচার্ডসনস গ্রাউন্ড কাঠবিড়ালী (*Spermophilus richardsonii*)-র গবেষণা করে torpor অবস্থার বিস্তৃত বিবরণে জানা গেছে যে এদের কার্যকাল সময় খুবই কম, হাইবারনেশন (বা প্রচলিত শীত ঘুম) থেকে মার্চ মাসের মধ্যবর্তী সময়ে বাইরের এসে 4 মাস বাদে অর্থাৎ জুলাই-এর মধ্যবর্তী সময়ে আবার হাইবারনেশনে চলে যায়। যখন তারা সক্রিয় থাকে তখন তাদের দেহতাপমাত্রা 37^0-38^{0}C কিন্তু পরিবর্তন করে তারা দেহ তাপমাত্রাকে হ্রাস করে ফেলে 3–4^{0}C তাপমাত্রায়।

হাইপারথারমিয়া (Hyperthermia) বা অতি উষ্ণ সহিষ্ণুতা জনিত অভিযোজন ঃ উট যখন নিয়মিত জলপান করতে পারে না তখন দিনের উত্তপ্ত মরু পরিবেশে দেহের তাপমাত্রা প্রায় 41°C পর্যন্ত উঠে যায়, আবার রাতের শীতল পরিবেশে এই তাপমাত্রা প্রায় 34°C এ নেমে যায়। দিনে মরু পরিবেশের তাপমাত্রা 40°C থেকে 50°C হওয়ায় বিকিরণ (Radiation) পদ্ধতিতে দেহের তাপ নিরসন করা সম্ভব নয়। পরিবর্তে পরিবেশের উচ্চতাপ অঞ্চল থেকে শরীর তাপ গ্রহণ করতে থাকে এবং স্বাভাবিক শারীর বৃত্তীয় তাপমাত্রা 34°C থেকে বেড়ে পরিবেশের সমান অর্থাৎ প্রায় 41°C হয়। এই অবস্থায় তাপ নিরসনের একমাত্র পন্থা বাষ্পীভবন (evaporation)। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় তাপ নিরসন করতে প্রচুর জলের প্রয়োজন। 500 কেজি ওজনের একটি প্রাণীর 7°C (41°C থেকে 34°C এ নামাতে) তাপমাত্রা কমাবার জন্য 2900 K.cal তাপক্ষয় করতে হয়। বাষ্পীভবন দ্বারা ঐ তাপ নিরসন করতে 5 লিটার জলের প্রয়োজন। কিন্তু মরু পরিবেশে জল মহার্ঘ হওয়ায় হাইপারথারমিয়া (Hyperthermia) বা অতি উষ্ণ সহিষ্ণুতা জনিত অভিযোজন পরিলক্ষিত হয় এবং তাপসঞ্চয় দ্বারা জল অপচয় বন্ধ হয়।

নিরুদন (Dehydration) সহনশীলতা ঃ হাইপারথারমিয়া এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় জল সংরক্ষণ করার অভিযোজন থাকা সত্ত্বেও উটের দেহ থেকে 25% জল বেরিয়ে গেলেও 12–20 দিনের জন্য শরীরে কোন ক্ষতিকারক লক্ষণ দেখা যায় না। বোস্টাউরাস (*Bostaurus*), বেদুইন ছাগল ইত্যাদির মধ্যেও এই ধরণের নিরুদন সহনশীলতা দেখা যায়।

দ্রুত জলগ্রহণ (Rapid rehydration) ঃ পরীক্ষা করে দেখা গেছে নিরুদিত উটকে জল পান করতে দিলে দ্রুতগতিতে জলপান করে দু'দিনের মধ্যেই 60–70% হ্রাসপ্রাপ্ত ওজন পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

ইউরিকোটেলিজম (uricotelism) এবং জল সংরক্ষণ ঃ রেচন প্রক্রিয়া এবং প্রাণী দেহে জলের সংরক্ষণ — নাইট্রোজেন জনিত রেচন পদার্থে বিপাকীয় কাজে যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই রেচনবস্তুর সাথে জলের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা মরু অবিযোজিত প্রাণীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

রেচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় রেচন অঙ্গ বা বৃক্ক দ্বারা; এ ছাড়াও স্বেদগ্রন্থি ও রেচনে সাহায্য করে। স্তন্যপায়ীদের বৃক্ক এমন ভাবে সুগঠিত যে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে জলের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

একটি তালিকা দেওয়া হল বিভিন্ন প্রাণীতে কতটা পরিমাণে মূত্রে ঘনত্ব দেখা যায়। বৃক্কের গঠনে কলা কোশগুলি বিভিন্ন ধরনের হয়। কোন কোন কোশে মাইটোকনড্রিয়া বেশী থাকে। সম্ভবতঃ এই কোশগুলি অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন (ADH) নিষ্কাশন করার জন্য পিটুইটারি বডিকে উত্তেজিত করে। অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোন বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকাকে সক্রিয় করে, যার ফলে আয়ন বিনিময়, ইউরিয়া পাম্প এমনভাবে হয় যে নালিকা পথে ঘন তরল পরিবাহিত হয়। উটের মূত্র ঘন বাদামী থেকে হালকা হলুদ রঙের হয় দেহে জলের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে।

উটের জলত্যাগ করার হার (ওজন 250kg) L/day (লিটার/দিন)

অবস্থা	বর্জ্যপদার্থ	মূত্র	বাষ্পীভবন	মোট
জলপান প্রতিদিন (8 দিন)	1.0	0.9	10.4	12.3
জল পান না করে (17 দিন)	0.8	1.4	3.7	5.9

Maximum urine concentrations of some tetrapods

Species	*Maximum Observed Urine Concentration (mmole kg^{-1})*	*Approximate Unine : Plasma Concentration Ratio*
American alligator (*Alligator missisippiensis*)	312	0.95
Desert iguana (*Dipososaurus dorsalis*)	300	0.95
Desert tortoise (*Gopherus agassizii*)	622	1.8
Pelican (*Pelecanus erythrorhynchos*)	700	2
House sparrow (IPasser domesticusI)	826	2.4
House finch (*Carpodacus mexicanus*)	850	2.4
Human (*Homo sapiens*)	1430	4
Bottlenose porpoise (*Tursiops truncatus*)	2658	7.5
Hill kangaroo (*Macropus robustus*)	2730	7.5
Camel (*Camelus dromedarius*)	2800	8
White rat (*Rattus norvegicus*)	2900	8.9
Marsupial mouse (*Dasycercus eristicanuda*)	3231	10
Cat (*Felis domesticus*)	3250	9.9
Desert woodrat (*Neotoma lepida*)	4250	12
Vampire bat (*Desmodus rotundus*)	6250	20
Kangaroo rat (*Dipodomys merriami*)	6382	18
Australian hoppint mouse (*Notomys alexis*)	9370	22

অধিকাংশ মরুবাসী স্তন্যপায়ী জাকস্ট্রা মেডুলারী নেফ্রন (Jurtsmedullary nephron) সংখ্যায় বেশি এবং উন্নত মানের। এই ধরনের নেফ্রন নালিকায় হরমোনের (vassopresin, Aldosteron) সাহায্যে জলের পর্যাপ্ত পুনঃ বিশোষণ হয়। ফলে প্রচুর ইউরিয়া এবং স্বল্প জল যুক্ত গাঢ় মূত্র মা হাইপারটনিক মূত্র (Hypwertonic urine) তৈরি হয়। ক্যামারু র‍্যাট সারা দিনে মাত্র 14 c.c. মূত্র ত্যাগ করে। এই ক্ষেত্রে মূত্রের গাঢ়ীকরণের মাত্রা লিটার প্রতি 4000 থেকে 6000 mosm। এই মূত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ প্রায় মানুষের স্বভাবিক মূত্রের চারগুণ। একটি উট সারাদিনে অতিমাত্রায় ইউরিয়া যুক্ত প্রায় 1.13 লিটার মূত্র ত্যাগ করে। উট আবার সমস্ত ইউরিয়া পরিত্যাগ না করে কিছু অংশ নানারকম ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে প্রোটিন তৈরির কাজে লাগায়। মরুবাসী প্রাণীদের মধ্যে এই ধরণের ইউরিয়া সহনশীলতা এক বিশেষ ধরনের অভিযোজন।

সীমাবদ্ধ স্বেদন (Restricted Sweating) ঃ অধিকাংশ মরুবাসী প্রাণীদের দেহে ঘর্মগ্রন্থি প্রায়ই নেই। যেমন—কাঙারু ব্যাটা, ভূমি কাঠবেড়ালী ইত্যাদি। ফলে ঘর্মত্যাগে জল ব্যায়ের পরিমাণ খুবই সীমিত।

পায়ু অঞ্চলের জলবিশোষণ ক্ষমতা ঃ মরুবাসী প্রাণীদের বিষ্ঠার সঙ্গে জল পরিত্যাগের পরিমাণ পানীয় জলের অভাবে খুবই কম হয়। কারণ এই সময় পায়ু অঞ্চলের জল-বিশেষণ ক্ষমতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেড়ে যায়।

বিপাক ক্রিয়ার হার ঃ অনেক মরুবাসী প্রাণীর বিপাক ক্রিয়ার হার কম হওয়ায় দেহের মোট তাপের পরিমাণ হ্রাস পায়। উটের বিপাকীয় কার্যের হার প্রতিটি 50 K.cal/kg। কিন্তু সাধারণ স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় 70 k.cal/kg।

আচরণতত্ত্বগত অভিযোজন ঃ ছোটো আকারের স্তন্যপায়ী, যেমন—ভূমি কাঠবেড়ালী (ground squirrel) দিনের উচ্চ তাপমাত্রায়ও ক্রিয়াশীল থাকে। দেহের তাপমাত্রা 43oC এর কাছাকাছি হলে এরা কম তাপমাত্রা যুক্ত গর্তে প্রবেশ করে এবং 37oC এর কাছাকাছি তাপমাত্রা নেমে গেলে আবার মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে বেরিয়ে পড়ে।

বিপরীতমুখী স্রোত ও তাপ বিনিময় ঃ দেহের উষ্ণতা 43°C এর উপর হলে অতিরিক্ত তাপের ফলে মস্তিষ্ক কলার ক্ষতি হতে পারে। গেজেলের (Gazelle) ক্ষেত্রে এক বিশেষ ব্যবস্থা উচ্চ তাপমাত্রায়ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখে। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী বহিঃক্যারোটিড ধমনী মস্তিষ্কে প্রবেশ করার আগে নাসিকা নালীর প্রাচীর থেকে আসা একটি শিরার গহ্বরে (venous sinus) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ধমনী শাখায় ভাগ হয়ে আবার একত্রিত হয় এবং মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। শিরা রক্ত নাসিকা নালীর প্রচীরে বাষ্পীভবন দ্বারা শীতল হয়ে শিরা গহ্বরে প্রবেশ করে এবং এই রক্তের সংস্পর্শে ধমনী রক্তের তাপমাত্রা প্রায় 2oC থেকে 3oC কমে যায় (চিত্র-13.4)।

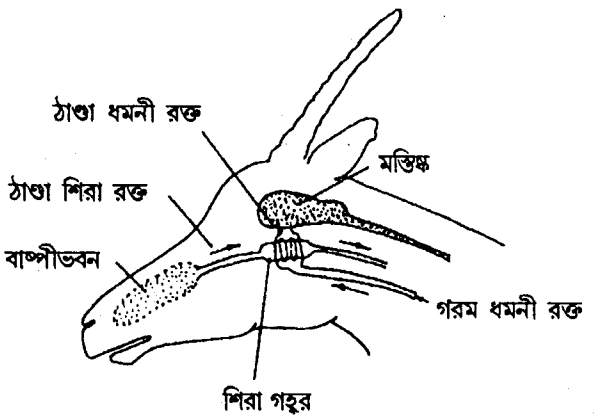

চিত্র-13.4 ঃ গেজেলের মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখার পদ্ধতি

অনুশীলনী—2

a. কয়েকটি মরুবাসী প্রাণীর নাম করুন।

b. মরু পরিবেশে কোন্ পদ্ধতিতে দিনে তাপ নিরসন করা সম্ভব।

c. উষ্ণ মরুভূমির বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কত?

13.4 বর্ণ পরিগ্রহণ এবং অনুমতি

বর্ণ পরিগ্রহণ ঃ ট্রাইক্রোমাটিক মতবাদ (Trichromatic theory) অনুযায়ী প্রাণীদের বর্ণ বিবেচনা নির্ভর করে লাল, সবুজ এবং বেগুনী বর্ণের প্রতি রেটিনার তিন ধরনের কোন কোষের (cone cell of retina) বিশেষ ক্রিয়াশীলতার উপর। মাছ এবং পাখিদের মধ্যে নানারকম রঙ চেনার ক্ষমতা খুবই স্পষ্ট কিন্তু স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাইমেট (Primate) এবং কাঠবেড়ালীর কিছু প্রজাতি ছাড়া রঙচেনার ক্ষমতা প্রায়ই নেই বললেই চলে।

পাখীদের বর্ণপরিগ্রহণের মূলে রয়েছে দেহ তলের গঠন বৈচিত্র্য বা রঙ্গক কনার উপস্থিতি। বর্ণ পরিগ্রহণের বিষয়টিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। গঠনগত বর্ণপরিগ্রহণ, চিত্রাভতাজনিত (iridescent colour) এবং ত্বকের রঞ্জকতা জনিত বর্ণপরিগ্রহণ।

● **গঠনগত বর্ণপরিগ্রহণ ঃ** কিছু পতঙ্গ এবং পাখিদের দেহগাত্রের বিশেষ গঠন বৈচিত্র্যের জন্য আপতিত আলো বিশেষ বিশেষ কোণে প্রতিফলিত হয়ে নানা রঙের প্রতিফলন ঘটায়। এই ধরনের বর্ণপরিগ্রহণের ঘটনাকে বলা হয় গঠনগত বর্ণপরিগ্রহণ। পায়রার দেহগাত্রের রঙ এই ধরনের একটি উদাহরণ।

● **চিত্রাভতাজনিত বর্ণ পরিগ্রহণ ঃ** প্রিজমে (Prism) যেভাবে বর্ণালীর ছটা দেখা যায়, একইভাবে স্বচ্ছ দেহগাত্রের বিভিন্ন স্তর থেকে আলোক ছটা জনিত নানা রঙ দেখা যেতে পারে। নানারকম পতঙ্গের দেহগাত্র এবং আঁশ যুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের বর্ণ দেখা যায়।

● **ত্বকের রঞ্জকতা জনিত বর্ণ পরিগ্রহণ ঃ** ত্বকের ক্রোমাটোফোর কোষে (Chromatophore cells) বিভিন্ন রঙ্গক কণার উপস্থিতির জন্য এই ধরনের বর্ণপরিগ্রহণ দেখা যায়। প্রাণীদের মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত রঙ্গক কণাগুলি হল—

মেলনিন (Melanin) ঃ কালো অথবা বাদামী রঙের রঙ্গক কণা।

ক্যারোটিনয়েড (Carotinoid) ঃ লাল অথবা হলুদ রঙের রঙ্গক। এই রঙ্গকটি মূলতঃ উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত হয়, কারণ প্রাণীরা ক্যারোটিনয়েড তৈরি করতে পারে না।

ইরিডোফোর (Iridophore) ঃ গুয়ানিন বা অন্য পিউরিনের ক্রিস্টাল। ঐগুলি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হলে নানা রকম ধাতব রঙের সৃষ্টি হয়।

এ'ছাড়াও ওমোক্রোম (Ommochrome), টেরিডিন (Pteridine) শামুক এবং সন্ধিপদ প্রাণীতে হলদে রঙের জন্য দায়ী। চুলের রঙের জন্য দায়ী মেলানিন। ত্বকের মেলানোফোর কোষ থেকে মেলানিন রঙ্গক চুলে জমে। ক্যামিলিয়ন (*Chameleon* sp.) এর রঙের জন্য দায়ী মূলতঃ আঁশের ক্রোমাটোফোর এবং গুয়ানিন ক্রিস্টাল। প্রয়োজন মতো ক্রোমাটোফোরের রঙ্গকগুলিকে এরা সঙ্কোচিত ও প্রসারিত করতে পারে এবং নানা পরিবেশে গা ঢাকা দেয়।

বর্ণপরিগ্রহণের মতোই অনুকৃতিও (Mimicry) প্রাণীদের এক বিশেষ অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য। এইরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রাণী শুকনো ডালপাতা অথবা কোন ভয়ঙ্কর বা বিষাক্ত প্রাণীর সমগঠনের হলে প্রাণীটি শত্রুর হাত থেকে

নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এ'ক্ষেত্রে যে প্রাণীটি অন্য প্রাণীকে অনুকরণ করে তাকে বলা হয় অনুকরণকারী (mimicker) এবং যে প্রাণীটিকে অনুকরণ করা হয় তাকে বলা হয় 'মোডেল (Model)'। 1963 খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে প্রাণীবিদ্যার এক সমাবেশে অনুকৃতির যে ধারনা দেওয়া হয় তা হলো—দু'টি প্রাণীর মধ্যে বা একটি প্রাণী এবং তার পরিবেশের প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে যে বাহ্যিক কিন্তু অতি নিকট সাদৃশ্য দেখা যায় তাকেই অনুকৃতি বলে। অনুকৃতির ফলে প্রাণীটি গা ঢাকা দিতে পারে, আত্মরক্ষা করতে পারে অথবা নিজের আপাত ক্ষতিকারক রূপ দেখিয়ে প্রাণ বাঁচায় ("The Superficial but close resemblance of one organism to another or to natural objects among which it lives, that secures concealment, protection and some other advantages by which it escapes itself from observation or advertises itself being harmful.")

অনুকৃতির বিষয়টিকে কতগুলি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

● **রক্ষাত্মক অনুকৃতি (Protective mimicry) ঃ** রক্ষাত্মক অনুকৃতির ক্ষেত্রে প্রাণীটি নিজেকে শিকারীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গা ঢাকা দেয় কিম্বা শিকারীর কাছে ক্ষতিকারক এমন প্রাণীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে।

রক্ষাত্মক অনুকৃতির নিচে কতগুলি চিত্রসহ উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

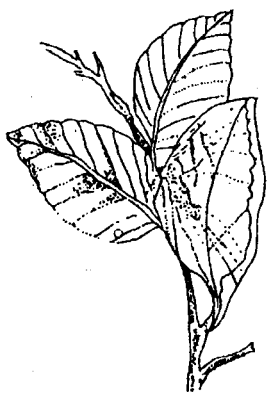

চিত্র-13.4 ঃ কালিমা প্রজাপতির (*Kallima paralecta*) রক্ষাত্মক অনুকৃতি (শুকনো পাতার আকৃতি)

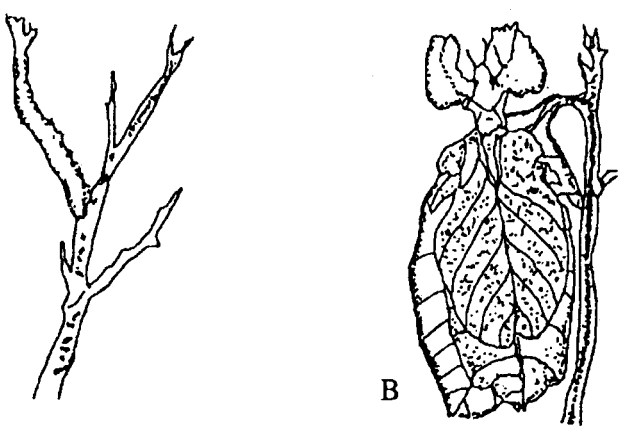

চিত্র-13.5 ঃ A : জিওমেট্রিক মথের রক্ষাত্মক অনুকৃতি (গাছের শুকনো ডালের আকৃতি), B : পাতা পোকার *Phyllium*) সবুজ পাতার ন্যায় আকৃতি

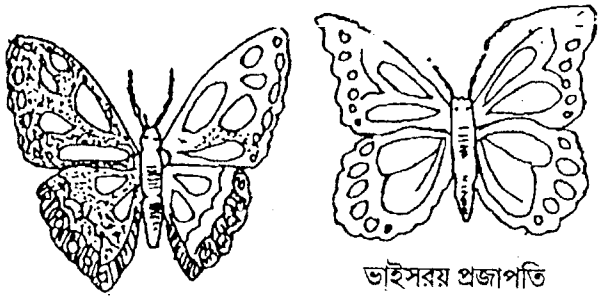

মোনার্ক প্রজাপতি ভাইসরয় প্রজাপতি

চিত্র-13.6 ঃ ভাইসরয় প্রজাপতি (*Ementis*) ও মনার্ক প্রজাপতির (*Danus*) সাদৃশ্য। ভাইসরয় প্রজাপতি পাখির খাদ্য কিন্তু মনার্ক প্রজাপতি বিষাক্ত হওয়ায় উভয়ের সাদৃশ্যের জন্য পাখিরা ভাইসরয় প্রজাপতিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না।

সচেতন অনুকৃতি (Conscious mimicry) ঃ অনেক সময় দেখা যায় নিজেকে শিকারীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অনেক প্রাণী সচেতন ভাবেই মৃতের মতো পড়ে থাকে। আমেরিকার ওপোসাম (*Opossum*) এবং কিছু গুবরে পোকা জাতীয় প্রাণী এই ধরণের আচরণ দেখায়।

আক্রমণাত্মক অনুকৃতি (Aggressive mimicry) ঃ এই ধরণের অণুকৃতি মূলতঃ শিকারী মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। লুকিয়ে বা লোভ দেখিয়ে শিকারের নাগাল পাওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। পরিবেশে গা-ঢাকা দিয়ে বা পরিবেশের অন্য কোন নিরীহ প্রাণীর অনুকৃতি গ্রহণ করে খাদ্য শিকারের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। অ্যামাইসেলা (*Amycela*) মাকড়সা লাল পিঁপড়ের অণুকৃতি গ্রহণ করে সহজে শিকার সংগ্রহ করতে পারে। লোভের ফাঁদে ফেলে শিকার সংগ্রহের ঘটনাও কম নেই। বড়শী মাছের (*Lophius*) পৃষ্ঠপাখনার প্রথম কাঁটাটি মুখের উপরে থাকে। কাঁটাটি অগ্রপ্রান্তে একটি মাংসাল খন্ড যুক্ত এবং চারদিকে ঘোরার ক্ষমতা সম্পন্ন। এটি একটি বড়শীর টোপের মতো অন্য মাছকে আকৃষ্ট করে। খাদ্যের লোভে শিকার মুখের কাছাকাছি এলে বড়শী মাছ সহজে গিলে ফেলতে পারে।

13.5 বর্ণপরিগ্রহণ এবং অনুকৃতির বিবর্তনগত তাৎপর্য

বর্ণপরিগ্রহণ এবং অনুকৃতির মূল বিবর্তন গত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের মধ্যে। খাদ্য-খাদক (Prey-Predator) সম্পর্কের এই প্রাণ ধারায় উভয়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে পরস্পরের বিবর্তনগত ধারাবাহিকতার উপর। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গেলে অবশ্যই কতগুলি অস্তিত্ব নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়। এই ভাবেই প্রাণীগোষ্ঠীগুলি নিজেকে রক্ষা করে প্রজননক্ষম হয় এবং অপত্যগুলিকে বাঁচায়। বর্ণ পরিগ্রহণ এবং অনুকৃতির ক্ষেত্রে প্রাণীর বসবাসের পরিবেশ এবং আন্তর প্রজাতিগত সম্পর্ক (Inter specific relationship) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, একটি প্রাণীর সঙ্গে অন্য প্রাণীর সাদৃশ্য বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য অথবা বর্ণ সমত্ব সব সময় কোন সচেতন প্রচেষ্টার ফল নয় বরং ধরা যেতে পারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের রায়।

অনুশীলনী—3

a. প্রাণীদের বর্ণপরিগ্রহণ কী?

b. অনুকৃতি কাকে বলে?

c. কয়েকটি ত্বক রঙ্গকের নাম লিখুন?

d. 'মোডেল' কী?

13.6 সারাংশ

এই এককটিতে আপনারা শিখতে পেরেছেন যে,

● উড্ডয়নশীল প্রাণীদের ডানা এবং শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া উড্ডয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্বার গঠনের ডানা এবং বিশেষ উড্ডয়ন পেশি ও কলা-কোষে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহকারী শ্বসনতন্ত্র উড্ডয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

● উষ্ণ মরুভূমিতে নানারকম শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার অভিযোজন দ্বারা মরুবাসী প্রাণীগোষ্ঠী নিজেদের শারীর বৃত্তীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। হাইপারথারমিয়া, নিরুদন সহনশীলতা, ইউরিকোটেলিজম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অভিযোজন। এছাড়া জল সংরক্ষণের নানারকম অভিযোজনও দেখা যায়, যেমন—বাষ্পীভবন দ্বারা তাপ বিমোচনে জল নষ্ট না করে রাতে বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ বিমোচন, নিম্ন হারের বিপাক ক্রিয়া, নিষ্ক্রিয় ঘর্মগ্রন্থি, পায়ু অঞ্চলে জল বিশোষণ, ইউরিয়া সমৃদ্ধ গাঢ় মূত্র উৎপাদন ইত্যাদি।

● বিবর্তনগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রাণীরা নানারকম অভিযোজনে অভিযোজিত হয়। বর্ণপরিগ্রহণ এবং অনুকৃতি এই ধরনের দু'টি বিশেষ অভিযোজন। বর্ণ পরিগ্রহণের জন্য দেহগাত্রের গঠন ও নানারকম রক্ষক কথা দায়ী। অনুকৃতিতে প্রাণী নিজেকে বাঁচাবার জন্য বা শিকার সংগ্রহের জন্য পরিবেশের নানা বস্তু বা প্রাণীর সম আকৃতি সম্পন্ন হয়। এইভাবে নানা অভিযোজনের মাধ্যমে প্রাণীরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে।

13.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

a. বায়ু গতিবিদ্যার বিভিন্ন নীতিগুলি কিভাবে পাখির উড়ার ক্ষেত্রে কাজ করে তা লিখুন।

b. মরু অভিযোজনে জল সংরক্ষণের বিভিন্ন অভিযোজনগুলি আলোচনা করুন।

c. প্রাণীদের বর্ণ পরিগ্রহণ বিষয়টি আলোচনা করুন।

d. বিভিন্ন ধরনের অনুকৃতি লিপিবদ্ধ করুন।

e. সংক্ষেপে বর্ণ পরিগ্রহণ ও অনুকৃতির বিবর্তনগত তাৎপর্য লিখুন।

13.8 উত্তর মালা

অনুশীলনী—1

a. পেক্টোরালিস মেজর এবং পেক্টোরালিস মাইনর।

b. নিজে লিখুন, c. নিজে লিখুন, d. পক্ষী গোষ্ঠীর প্রাণীতে, e. নিজে লিখুন।

অনুশীলনী—2

a. নিজে লিখুন, b. বাষ্পীভবন (evaporation)

অনুশীলনী—3

a. নিজে চেষ্টা করুন, b. নিজে চেষ্টা করুন, c. মেলানিন, ওমোক্রোম, টেরিডিন, d. নিজে লিখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

a. নিজে লিখুন, b. নিজে লিখুন, c. নিজে লিখুন, d. অনুকৃতি অংশটি দেখুন, e. নিজে লিখুন।

The geological time scale

ERA	PERIOD	EPOCH	MILLIONS OF YEARS FROM START TO PRESENT	MAJOR EVENTS
CENOZOIC	Quaternary	Recent (Holocene)	0.01	Continents in modern positions; repeated glaciations and lowering of sea level; shifts of geographic distributions; extinctions of large mammals and birds; evolution of *Homo erectus* to *Homo sapiens*; rise of agriculture and civilizations
		Pleistocene	1.8	
	Tertiary	Pliocene	5.2	Continents nearing modern positions; increasingly cool, dry climate; radiation of mammals, birds, snakes, angiosperms, pollinating insects, teleost fishes
		Miocene	23.8	
		Oligocene	33.5	
		Eocene	55.6	
		Paleocene	65.0	
MESOZOIC	Cretaceous		144	Most continents separated; continued radiation of dinosaurs; increasing diversity of angiosperms, mammals, birds; mass extinction at end of period, including last ammonites and dinosaurs
	Jurassic		206	Continents separating; diverse dinosaurs and other "reptiles"; first birds; archaic mammals; "gymnosperms" dominant; evolution of angiosperms; ammonite radiation; "Mesozoic marine revolution"
	Triassic		251	Continents begin to separate; marine diversity increases; "gymnosperms" become dominant; diversification of "reptiles," including first dinosaurs; first mammals
PALEOZOIC	Permian		290	Continents aggregated into Pangaea; glaciations; low sea level; increasing "advanced" fishes; diverse orders of insects; amphibians decline; "reptiles," including mammal-like forms, diversify; major mass extinctions, especially of marine life, at end of period
	Carboniferous		354	Gondwanaland and small northern continents form; extensive forests of early vascular plants, especially lycopsids, sphenopsids, ferns; early orders of winged insects; diverse amphibians; first reptiles
	Devonian		409	Diversification of bony fishes; trilobites diverse; origin of ammonoids, amphibians, insects, ferns, seed plants; mass extinction late in period
	Silurian		439	Diversification of agnathans; origin of jawed fishes (acanthodians, placoderms, Osteichthyes); earliest terrestrial vascular plants, arthropods, insects
	Ordovician		500	Diversification of echinoderms, other invertebrate phyla, agnathan vertebrates; mass extinction at end of period
	Cambrian		543	Marine animals diversify: first appearance of most animal phyla and many classes within relatively short interval; earliest agnathan vertebrates; diverse algae
PROTEROZOIC			2500	Earliest eukaryotes (ca. 1900–1700 Mya); origin of eukaryotic kingdoms; trace fossils of animals (ca. 1000 Mya); multicellular animals from ca. 640 Mya, including possible Cnidaria, Annelida, Arthropoda
ARCHAEAN			3600	Origin of life in remote past; first fossil evidence at ca. 3500 Mya; diversification of prokaryotes (bacteria); photosynthesis generates oxygen, replacing earlier oxygen-poor atmosphere; evolution of aerobic respiration

একক 14 ❑ পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি

গঠন

14.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

14.2 আদি পক্ষী আর্কিয়পটেরিক্স (Archaeopterys) এর উৎপত্তিকাল ও বৈশিষ্ট্য।

14.3 পক্ষী গোষ্ঠীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ।

14.4 স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ।

14.5 স্তন্যপায়ী সদৃশ্য সরীসৃপ

14.6 সারাংশ

14.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

14.8 উত্তরমালা

14.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

বর্তমান কোন প্রাণীগোষ্ঠীর উৎপত্তির মূলে পৌঁছতে হলে তার জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণের উপর নির্ভর করতেহয়। অতীতের জীবাশ্মগুলির সঙ্গে বর্তমান জীবিত প্রাণীগোষ্ঠীর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উদবংশীয় প্রাণীগোষ্ঠীর (Ancestral animals) সন্ধান সম্ভব। বৈচিত্র্যময় পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও আলোচনার বিষয়। নানা মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এই দুটি প্রাণী গোষ্ঠীর উৎপত্তির বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার। আমরা এই এককে নানা প্রমাণ সাপেক্ষে নানারকম মতবাদগুলি আলোচনা করে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর উদ্‌বংশীয় গোষ্ঠী নির্ধারণ করার চেষ্টা করবো।

উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে জানতে পারবেন—

- আদি পক্ষী আর্কিয়পটেরিক্সের (Archaeopteryx) উৎপত্তিকাল ও বৈশিষ্ট্য।
- পক্ষী শ্রেণীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ।
- স্তন্যপায়ী শ্রেণীর মূল বৈশিষ্ট্য।
- স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ।

14.2 আদি পক্ষী আর্কিয়প্‌টেরিক্সের উৎপত্তিকাল ও বৈশিষ্ট্য

পক্ষী শ্রেণীর উৎপত্তির ইতিহাস শুরু আজ থেকে প্রায় 15 কোটি বছর আগে জুরাসিক উপযুগের

শেষের দিকে (Late Jurassic Period)। সরীসৃপ ও বর্তমান পক্ষীগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত কতগুলি জীবাশ্মকে কেন্দ্র করেই এই ইতিহাসের সূত্রপাত। এই জীবাশ্মগুলিই হলো আর্কিয়পটেরিক্স (Archaeopteryx) (চিত্র 14.1) এবং এদেরই আদি পক্ষী হিসাবে গণ্য করা হয়। যদিও অনেকে প্রথম পাখি হিসাবে সাড়ে বাইশ কোটি বছর আগের প্রোটোঅ্যভিসকে *(Protoavis;* Chatterjee, 1991, 1995, 1997) চিহ্নিত করেন। কিন্তু নানা কারণে বিজ্ঞানীরা *Protoavis* কে প্রথম পাখি হিসাবে মানেন না। আমরা এখন আর্কিয়পটেরিক্সের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ করে সরীসৃপ ও পক্ষীর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করবো।

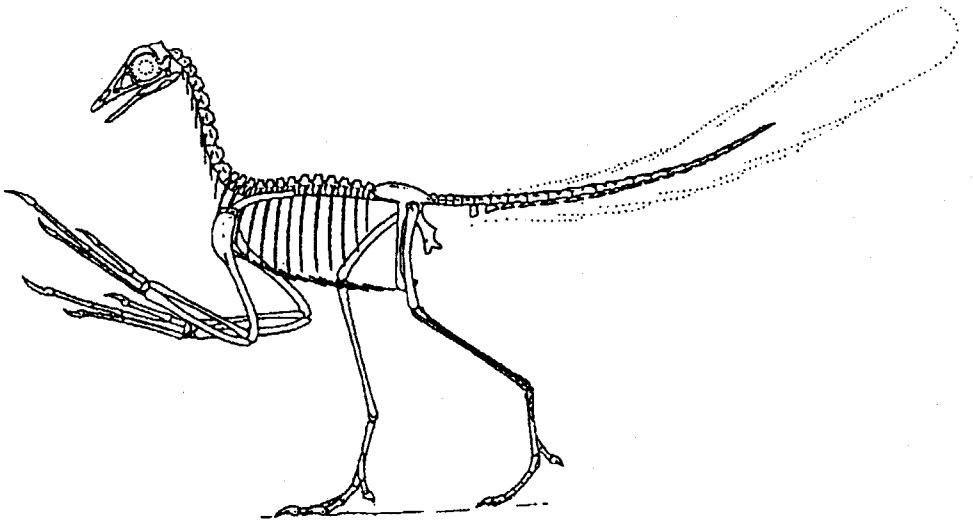

চিত্র-14.1 ঃ আদি পক্ষী আর্কিয়পটেরিক্স এর কঙ্কাল তন্ত্রের রেখা চিত্র।

14.2 আর্কিয়পটেরিক্সের সরীসৃপ বৈশিষ্ট্য ঃ

★ অক্সিপিটাল কন্ডাইল-এর সংখ্যা একটি এবং পিছনের দিকে প্রসারিত।

★ সুপ্রা-অ্যাংগুলার এবং ডেনটারির মাঝখানে সরীসৃপদের ন্যায় গর্ত বিদ্যমান।

★ গিরগিটির ন্যায় গর্ত যুক্ত (fenestra) খর্বাকৃতি কোরাকয়েড।

★ কিল (keel) ছাড়া চ্যাপ্টাকৃতির স্টারনাম (sternum) বর্তমান।

★ মেসোজয়িক সরীসৃপের ন্যায় সুপ্রা-কোরাকয়েড।

★ কারপাল (Carpals) অস্থিগুলি মুক্ত। অগ্রপদের তিনটি আঙুলে নখর থাকে। ফ্যালানজেসের সংখ্যা প্রথম আঙুলে দুটি, দ্বিতীয়টিতে তিনটি এবং তৃতীয়টিতে চারটি।

★ পিউবিস সিমফাইসিরের অবটুরাটর ফোরমেন (obturator foramen) সরীসৃপের ন্যায়।

★ সরীসৃপের মতো লম্বা লেজ কুড়ি-বাইশটি মুক্ত কশেরুকার দ্বারা গঠিত।

★ কশেরুকাগুলির সেনট্রাম (Centrum) এবং প্রোসিলাস (Procoelus) যুক্ত।

★ পর্শুকায় (Ribs) আনসিনেট প্রসেস (uncinate process) থাকে না।

★ উদর পর্শুকা উপস্থিত।

★ চোয়ালের গর্তে দাঁত থাকে।

★ ডাইনোসর সরীসৃপের মতো পশ্চাদপদ, গলা এবং করোটি থাকে।

14.2.2 বর্তমান পক্ষী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ঃ

★ দেহ পালকে ঢাকা।

★ অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত; ডানায় তিনটি নখর যুক্ত আঙুল উপস্থিত।

★ ফারকুলা (Furcula) উপস্থিত।

14.3 পক্ষী গোষ্ঠীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ

আর্কিয়প্টেরিক্স এবং বর্তমান জীবিত পক্ষীকুলের সঙ্গে সরীসৃপ গোষ্ঠীর নানা সাদৃশ্য পঠন পাঠন করে হাক্সলি (T. H. Huxley; 1868, 1870) প্রথম পক্ষীকুলকে উন্নততম সরীসৃপ হিসাবে চিহ্নিত করেন (Glorified reptiles) এবং তিনি এ বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিলেন যে, পক্ষী শ্রেণীকে সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত একটি বর্গ হিসাবে মেনে নেন।

পক্ষী গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ—

পক্ষী শ্রেণীর উপবর্তন ক্রিটেসিয়াম যুগ থেকে শুরু হয়, দ্রততার সাথে টারসিয়ারি যুগে চলে আসে। ক্রিটেসিয়াস যুগের পাখীর উন্নত মস্তিষ্ক, করোটির অস্থি ভালোভাবে সংযোজিত এবং টেমপোরাল ফেনেস্টার আকারে ছোট হয়েছিল। অতি উন্নত ও বড় স্টারনাম বিভিন্ন জীবাশ্মে দেখতে পাওয়া গেছে, তাই ধারণা করাহয়ে যে স্টারনামের সাথে শক্তিশালী উড্ডয়ন পেশীও ছিল। অস্থির আরও কিছু পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় যেমন পেলভিসের সাথে স্যাক্রামের জোড়া লেগে যাওয়া।

ইওনিন, অলিগোসিন এবং ক্রিটেশিয়াস যুগের অনেক জীবাশ্ম চিন দেশে আবিষ্কার করা গেছে।

উড্ডয়ন ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত পাখীরা—

অতিকায় ডাইনোসরের অবলুপ্তির কারণে ভূপৃষ্ঠের অনেকখানি জায়গায় খালি ছিল, তাই সেই সময় থেকে বেশ কিছু অতিকায় পাখী বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়ে, সিনোজোয়িক যুগের শেষের দিকে তারা অবলুপ্ত হয়। এখন যতগুলি দৌড়বাজ পাখী (Running bird) আছে, সেগুলি হল আফ্রিকার উটপাখী, অস্ট্রেলিয়ার এমু এবং দক্ষিণ আমেরিকার রিয়া—এগুলি আকার বড় প্রায় ১-২ মিটার উপর উচ্চতা থাকে বিভিন্ন এলাকায় এরা দৌড়াতে পারে। কতগুলি ছোট পাখীও আছে যেমন নিউজিল্যান্ডের কিউই পাখী—যারা উড়তে পারে না।

উড়তে অক্ষম পাখীরা বিবর্তনে সাফল্য লাভ করেছে আদি সময় থেকে যেগুলি দ্বীপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যেখানে শিকারী মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা কম। প্রাকৃতিক নির্বাচনে তারা যোগ্যতার সাথে ঐসব এলাকায় বসবাস করতে পারছে।

কিছু সামুদ্রিক পাখী আছে যেমন পেনগুইন এবং স্টীমার ডাক, এরা জলের তলায় সাঁতার কাটতে খুবই স্বচ্ছন্দ বোধ করে। খুব কম সময়ই তারা উড়তে চায়। এইভাবে উড্ডয়ন ক্ষমতা তাদের হ্রাস পায়, ডানা ও পালকের পরিবর্তন হয়। পা-এর পরিবর্তিত রূপে এরা জলে সাঁতার কাটার যোগ্যতা অর্জন করে।

14.3.1 থেকোডন্ট তত্ত্ব ("Thecodont" hypothesis) :

'থেকোডন্ট (Thecodont)' শব্দটি ডাইনোসর, টেরোসর এবং কুমীর জাতীয় প্রাণীগোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য আর্কোসত্তরিয়ান (Archosauria) সরীসৃপ গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। থেকোডন্ট গোষ্ঠীটিকে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, কারণ নানা বৈশিষ্ট্যের আর্কোসওরিয়ান সরীসৃপ একত্রিত হয়ে কৃত্রিম ভাবে এই গোষ্ঠীটি তৈরি হয়েছে। হেইলম্যান (Gerhard Heilmann, 1926) এই তত্ত্বটির অবতারনা করেন। 'থেকোডন্ট' তত্ত্বের আগে হাক্সলি (T. H. Huxley, 1868, 1870) 'থেরোপোড' তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। 1936 সালের আগে পর্যন্ত থেরোপোড ডাইনোসরদের জীবাশ্মে কোনরকম ক্ল্যাভিক্‌ল (clavicle) অস্থি না পাওয়ায় হেইলম্যানের ধারনা হয় থেরোপোডের ও আগের ক্ল্যাভিকল যুক্ত কোন আর্কোসত্তরিয়ান সরীসৃপ থেকে পক্ষী গোষ্ঠীর উদ্‌বর্তন সম্ভব। কারণ পক্ষী গোষ্ঠীর ফারকুলা (Furcula) অস্থিটি ক্ল্যাভিকল থেকে রূপান্তরিত হয়। ডোলোর সূত্র অনুযায়ী (Dollo's law of irreversibility) ক্ল্যাভিকল বিহীন কোন প্রাণীগোষ্ঠী থেকে পক্ষী গোষ্ঠীর উদ্‌বর্তন সম্ভব নয়। হেইলম্যানের 'থেকোডন্ট' তত্ত্ব অনুযায়ী পক্ষী শ্রেণীর উদ্‌বর্তনের ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

ক্ল্যাভিকলযুক্ত থেকোডন্ট → প্রো-অ্যাভিস (Proavis) → আর্কিয়পটেরিক্স → পক্ষী। পরবর্তীকালে হেইলম্যানের তত্ত্বটি প্রসঙ্গিকতা হারায়। কারণ, 1936 সালের পর থেরোপোড ডাইনোসরের একাধিক জীবাশ্মে ক্ল্যাভিকল অস্থির সন্ধান পাওয়া যায় এবং বেশ কয়েকটিতে ফারকুলার মতো অস্থিরও অস্তিত্ব দেখা যায়।

14.3.2 ক্রোকোডাইলোমর্ফ তত্ত্ব (Crocodylomorph hypothesis) ঃ

আর্কোসত্তর সরীসৃপ গোষ্ঠীর ক্রোকোডাইল এবং ট্রায়াসিক জুরাসিক যুগের ক্রোকোডাইল-এর নিকট সম্পর্কিত স্ফেনোসুচাস (Sphenosuchus) জাতীয় প্রাণীদের একত্রে "ক্রোকোডাইলোমর্ফ" বলা হয়। মার্টিন ও তাঁর সহকর্মীরা (Whetstone & Martin; 1979, 1981) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। দাঁত, করোটি, টারসাস (Tarsus) ইত্যাদির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। আর্কোসত্তরদের মধ্যে কোকোডাইলোমর্ফ-এর চেয়েও থেরোপোড ডাইনোসরের সঙ্গে পক্ষী গোষ্ঠীর সাদৃশ্য অনেক বেশি, তাই তত্ত্বটি বিজ্ঞানী মহলে বিশেষভাবে গ্রাহ্য নয়।

ডাইনোসর থেকে পাখীর বিবর্তন —

ড্রোসিওসর এর মত ডাইনোসরেদের মধ্যে পাখীর বাহ্যিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। 1860 থেকে 1870-র মধ্যে থমাস হেনরি হাক্সলে (Thomas Henry Husley) বিভিন্ন জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ করে এই মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে ডাইনোসরের গৌরবময় উত্তরণ পক্ষীকুল সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি এই দুই শ্রেণীর প্রাণীকে একই শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সরপসিডা শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

এই প্রাণী গোষ্ঠীর বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় একটি গোষ্ঠী থেকে বিবর্তনের ধারা স্পষ্ট। এবং কিছু পাখীর জীবাশ্ম লক্ষ্য করলে দেখা যায় থেরপড ডাইনোসর থেকে বিবর্তন হয়েছে।

থেরপড ও পাখীদের বাহ্যিক চরিত্রের নিম্নলিখিত সাদৃশ্য দেখা যায়,

- লম্বা, সঞ্চালনশীল S-আকৃতির গলা।
- তিনটি আঙ্গুল বিশিষ্ট পদ, ডিজিটিগ্রেড ভঙ্গী থাকে।
- অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট অভ্যন্তরীণ।
- ফাঁপা, বায়ুযুক্ত অস্থি থাকে।

1998 সালের শেষের দিকে কিয়ংস ও সঙ্গীরা (Qiang et al 1998) ড্রোমেওসরের দুটি গণের জীবাশ্মকে আবিষ্কার করে দেখেছেন যে ঐ দুটি গণের জীবাশ্মে পালকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চিনের উত্তরপূর্ব এলাকার লিয়াওনিং প্রদেশে পাওয়া গেছে। অনুমান করা যায় ঐ দুটি গণের উপস্থিতির সময় ছিল জুরাসিক পিরিয়ডের শেষের দিক এবং ক্রিটেসিয়াস যুগের প্রথম ভাগে।

কডিপটেরিক্স (*Caudipteryx*) প্রথম পালকসহ ডাইনোসরকে খুঁজে পাওয়া গেছে, এবং প্রোটোপআরকিওটেরিক্সের দুই রকমের পালক দেখতে পাওয়া যায়। এদের ছোট বাহু এবং উড়তে পারে না। লিয়াওনিং প্রদেশে পাওয়া জীবাশ্মটি খুবই উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করেছে যেমন লেজের দিকে পাখনার পালকের ফিলামেন্টবুলি একটি স্থান থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং বাহুর পাখনার পালক কেন্দ্রীয়ভাবে একটি স্থান থেকে উৎপন্ন হয় যেমন আধুনিক কালের পাখীদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। (Qiang et al. 2001).

আধুনিক পাখীর ভেইনড পালকগুলি উত্তোলন, ভাসমান অবস্থা, দিকনির্ণয় করতে সাহায্য করে। আরকেওপেরিক্সকেই আদিমপক্ষী বলে গণ্য করা হয়। যেক্ষেত্রে উড্ডয়ন পালক গুলি অসমান ভাবে সাজানো থাকে আধুনিক পাখীর মত যেটা বাতাসের বাধাকে অতিক্রম করে খেচর অভিযোজনে সাহায্য করে।

লেজের পালকগুলি আরকেওপটেরিক্সে পনেরো জোড়ায় সাজানো থাকে লেজের অংশের কুড়িটি মেরুদণ্ডের হাড়ের (Caudal vertebrae) ছয় নম্বর কশেরুকার পাশে।

আরকেওপটেরিক্স ও বর্তমান পাখীদের গঠনগত সাদৃশ্য এতটাই বেশী যে থেরপড ডাইনোসর থেকে পাখীদের উদ্‌বর্তন হয়েছে একথা গ্রহণযোগ্য হয় না। (Norell and Chiappe 1996, Padian and Chiappe, 1998). একথা অনস্বীকার্য যে ফসিল বা জীবাশ্মের নিদর্শন যেগুলি আবিষ্কার করা হচ্ছে তা সময়ের ক্রমানুসারে হবে। কিন্তু আরকেওপটেরিক্স জীবাশ্মের সময় কডিটেরিক্স এবং প্রোটোআরকেওপটোরিক্সের থেকে আরও প্রাচীন। এই প্রভেদের জন্যই কিছু প্যালিঅনটোলজিস্টদের মতে আর্কসর জাতীয় ডাইনোসর থেকেই পাখীর বিবর্তন হয়েছে এবং তাঁরা সরশ্চিয়ান লাইন তেকে থেরোপডকে আলাদা লাইনে রেখেছে। Feduccia and Wild 1993, Feducia 1996).

14.3.3 থেরোপোড তত্ত্ব (Theropod hypothesis) :

থেরোপোড ডাইনোসর থেকে পক্ষীগোষ্ঠীর উদ্‌বর্তনের তত্ত্বটির প্রথম প্রবক্তা হাক্সলি (T. H. Huxley, 1868, 1870)। পরবর্তীকালে নানা জীবাশ্ম পঠন পাঠনের মাধ্যমে J. H. Ostrom (1973, 1974, 1975, 1976), গথিয়ার (Gauthier, 1986) এই তত্ত্বটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যান্য আর্কোসত্তর সরীসৃপের তুলনায় থেরোপোড সিলিউরোসরের সমরূপতা (Synapomorphies) পক্ষী গোষ্ঠীর সঙ্গে অনেক নিবিড়। অস্ট্রমের মতে আদি পক্ষী আর্কিয়প্টেরিক্স এবং সিলিউরোসর থেরোপোড উভয়েই দ্রুত দৌড়বাজ, দ্বিপদ বিশিষ্ট এবং শিকারজীবী ছিল। এদের কঙ্কালতন্ত্রের সমরূপতা এত বেশি যে আর্কিয়পটোরিক্সকে পালক বিহীন থোরোপোড ডাইনোসর বলা যেতে পারে। অস্ট্রমের মতে পক্ষী উদ্‌বর্তনের স্তরগুলি হলো—

সিলিউরোসর থেরোপোড → প্রোটোঅর্কিয়প্টেরিক্স → আর্কিয়পটেরিক্স → বর্তমান পক্ষী।

হলজের (Holtz, 1996) মতে, উদ্‌বর্তনের স্তরগুলি নিম্নরূপ ঃ

সিলিউরোসর থেরোপোড → ম্যানির‍্যাপটোরা (Maniraptora) → অ্যাভিঅ্যালি (Avialae) → আর্কিয়প্টেরিক্স → বর্তমান পক্ষী।

শেষ 6.6 কোটি বছর পূর্বে ক্রিটাসিয়াস যুগের শেষ এবং ডাইনোসরের অন্তিম কালসীমা।

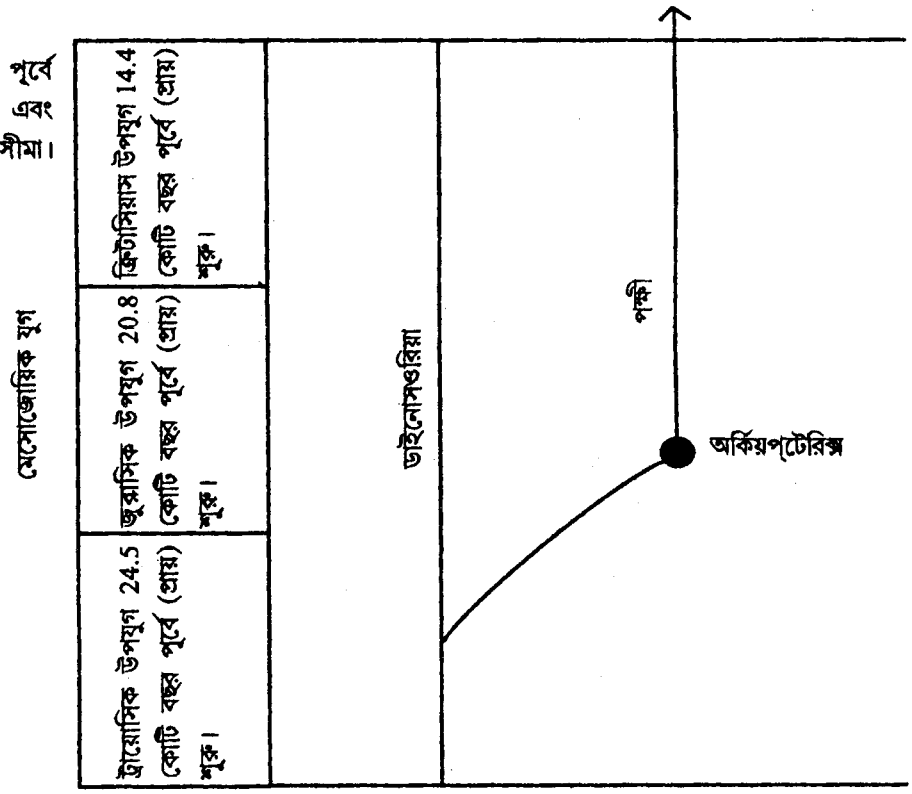

পক্ষীজাতিয় প্রাণী উদ্‌বর্তনের সময়সীমা

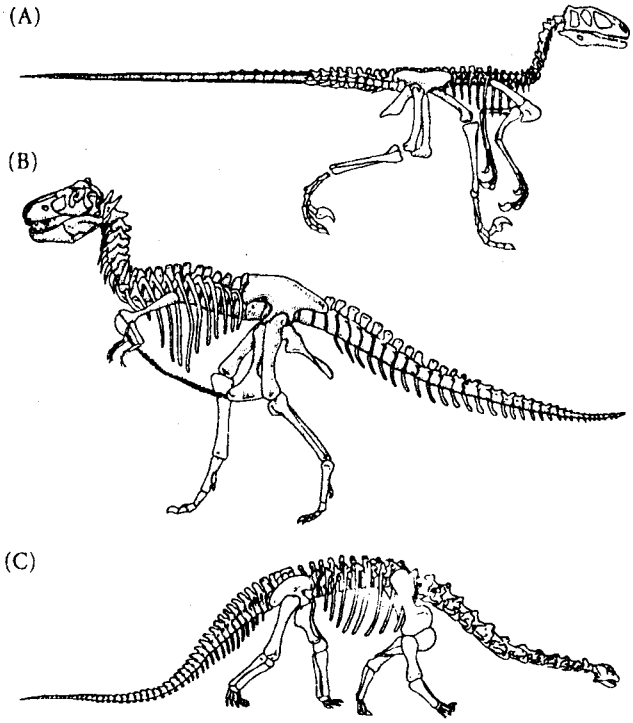

Some saurischian dinosaurs.

(A) *Deinonychus* (Late Cretaceous). (B) *Tyrannosaurus* (Late Cretaceous). (C) A sauropod, *Camarosaurus* (Late Jurassic). (A after Carroll 1998; B after Lucas 1994; after Osborn and Mook 1928.)

বর্তমান সরিশ্চিয়ান ডাইনোসরের অন্তকঙ্কালের ছবি। নমাগুলি উপরে উল্লিখিত আছে।

(Evolutionary Biology by D. J. Futyona, 3rd Edition)

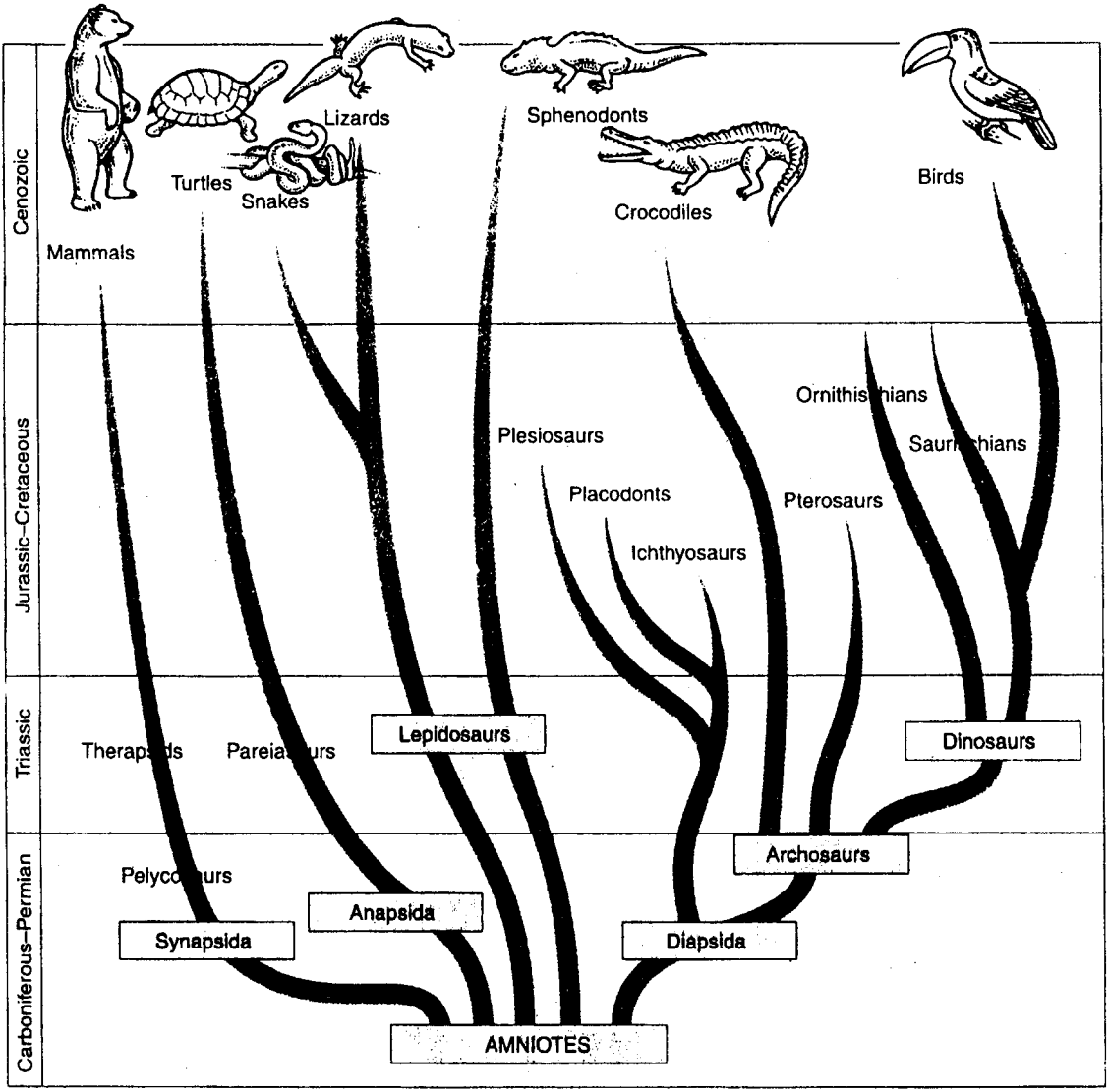

General evolutionary scheme showing relationships among the major repilian groups, beginning with their origin in the Paleozoic. As indicated, further major evolutionary events include the origin of mammals from synapsids and the origin of birds from a lineage that also may have given rise to dinosaurs. Conflicting with traditional phylogeny, mitochondrial DNA analysis by Zardoya and Meyer (1998) places turtles as a diapsid lineage rather than anapsid, suggesting that diapsid skull fenestration was lot during turtle evolution.

সাধারণভাবে অ্যামনিওট থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা উদ্ভব হয়ে আধুনিক যুগের প্রাণীদের উৎপত্তি হয়েছে। চিত্রটিতে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝানো আছে। (Evolution by Strickberger, 4th Edition)

অনুশীলনী—1

a. পক্ষী শ্রেণীর একটি বৈশিষ্ট্যের নাম লিখুন।

b. আজ থেকে কত বছর আগে পক্ষী গোষ্ঠীর উদ্‌বর্তন হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

c. থেকোডন্ট তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

d. ফারকিউলা অস্থিটি কোন অস্থির রূপান্তর?

e. ক্রোকোডাইলোমর্ফ কাদের বলা হয়?

f. থেকোডন্ট কাদের বলা হয়?

14.4 স্তন্যপায়ী শ্রেণীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ

স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলি হলো—অ্যাম্ফিরিয়া মতবাদ এবং সরীসৃপ মতবাদ। আমরা এখন এই দু'টি মতবাদ বিশদ আলোচনা করবো।

14.4.1 আম্ফিবিয়া মতবাদ (Amphibia theory) :

হাক্সলি (T. H. Huxley, 1880) নিম্নলিখিত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মনে করেন অ্যাম্ফিবিয়া গোষ্ঠী থেকেই স্তন্যপায়ীদের উদ্‌বর্তন সম্ভব।

★ অ্যাম্ফিবিয়া এবং স্তন্যপায়ী উভয়ের দুটি করে অক্সিপিটাল কন্‌ডাইল (Occipital condyle) বর্তমান।

★ সরীসৃপদের বাম অ্যাওর্টিক আর্চ (Aortic arch) খুবই দুর্বল অথচ স্তন্যপায়ীদের শুধুমাত্র বাম অ্যাওর্টিক আর্চ আছে। এই তথ্য থেকে বলা যেতে পারে যে, সরীসৃপ প্রাণী থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উদ্ভব সম্ভব নয়।

এই মতবাদ বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন না। কারণ, অ্যাম্ফিবিয়া এবং স্তন্যপায়ীদের অক্সিপিটাল কন্‌ডাইল দু'টি সমসংস্থ অঙ্গ নয়। অ্যাম্ফিবিয়ার ক্ষেত্রে বহিঃঅক্সিপুট (Exocciput) থেকে অক্সিপিটাল কন্‌ডাইলগুলির পরিস্ফুরণ হয় কিন্তু স্তন্যপায়ীর বেসিঅক্সিপুট (Basiocciput) থেকে গঠিত হয়। এছাড়া অ্যাম্ফিবিয়া ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সংযোগকারী কোন প্রাণী গোষ্ঠীর জীবাশ্ম আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

14.4.2 সরীসৃপ মতবাদ : সরীসৃপ পূর্বপুরুষ থেকে স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তি নানা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণগুলি নিম্নরূপ—

★ জীবিত স্তন্যপায়ী প্রাণী মনোট্রিমাটা (Monotremata) এবং মারসুপিয়ালিয়ার (Marsupialia) মধ্যে সরীসৃপ প্রাণীর বহু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি।

★ পেষক দন্তের (Molar teeth) ক্রমবিবর্তন।

★ স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ (Mammal like reptiles)।

নিচে বিষয়গুলির বিশদ্ আলোচনা করা হলো।

14.4.3 মনোট্রিমাটা এবং মারসুপিয়ালিয়ার সরীসৃপ বৈশিষ্ট্য

A. মনোট্রিমাটার সরীসৃপ বৈশিষ্ট্যগুলি হলো :

1. পেক্টোরাল গার্ড্‌ল (Pectoral girdle) ও একটি সুগঠিত কোরাকয়েড, একটি ইন্টার-ক্ল্যাভিকল (Inter-clavicle) এবং স্পাইনবিহীন স্কাপুলা (Scapula) উপস্থিত।

2. পেলভিক গার্ডল-এ (Pelvic girdle) এপিপিউবিক অস্থি বর্তমান।

3. সারভাইক্যাল পর্শুকা (Rib) ছাড়া অন্যান্য পর্শুকা এক মাথা যুক্ত (Single headed)।

4. করোটিতে ল্যাক্রিমাল অস্থি (Lacrymal bone) এবং অডিটরি বুলা (Auditory bulla) অস্থি নেই। সরীসৃপের প্রোভোমার (Provomer) আছে।

5. কর্পাস ক্যালোসাম (Corpus callosum) নেই।

6. ক্লোয়াকা ছিদ্র আছে।

7. অন্ডজ (oviparous)

B. মারসুপিয়ালিয়ার সরীসৃপ বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ঃ

1. এপিপিউবিক অস্থি আছে।

2. কর্পাস ক্যালোসাম থাকে না।

3. অ্যালিস্ফেনয়েড বুলা (Alisphenoid bulla) আছে।

14.4.4 পেষক দন্তের বিবর্তন (Evolution of molar teeth) :

A. ত্রি-টিউবারক্‌ল তত্ত্ব (Tritubercular theory) :

কোপ এবং অসবর্ণের (Cope and Osborn) তত্ত্ব অনুযায়ী বর্তমান স্তন্যপায়ীর পেষক দন্তের (Molar teeth) গঠন সরীসৃপের একপ্রকার ত্রি-টিউবারক্‌ল যুক্ত পেষকেরই পরিবর্তিত অবস্থা। এই ধরনের ত্রি-টিউবারকল যুক্ত দাঁত সাইনগনাথাস (Cynognathus) সরীসৃপ জাতীয় জীবাশ্মে পাওয়া যায়। এই ধরনের পেষকটি আবার পূর্বের সরীসৃপের একক চূড়া যুক্ত দাঁতের পরিবর্তিত অবস্থা বলে মনে করা হয় (চিত্র-14.2)। পরবর্তীকালে গ্রেগরিও (Gregory) সামান্য পরিবর্তিতভাবে এই তত্ত্বটি স্বীকার করেন।

B. বহুটিউবারক্‌ল তত্ত্ব (Multitubercular theory) :

গুডরিচ (Goodrich), উডওয়ার্ড (Woodward) মনে করেন বহু টিউবারক্‌ল সমন্বিত পেষক দাঁত যুক্ত ডায়াডিমোডন (Diademodon) জাতীয় সাইনোডনসিয়ার মতো সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীর উদ্ভব হয়েছে।

কোন কোন প্রাণীবিজ্ঞানের মতে মাইডনসিয়া সরীসৃপের কিছু প্রাণীর ত্রি-টিউবারকল্‌যুক্ত এবং অন্যদের বহুটিউবারক্‌ল যুক্ত পেষক দন্ত ছিল। সাইডনসিয়ার এই দুই গোষ্ঠী থেকে স্তন্যপায়ীর উদ্‌বর্তন হয়েছিল বলে তাঁরা মনে করেন।

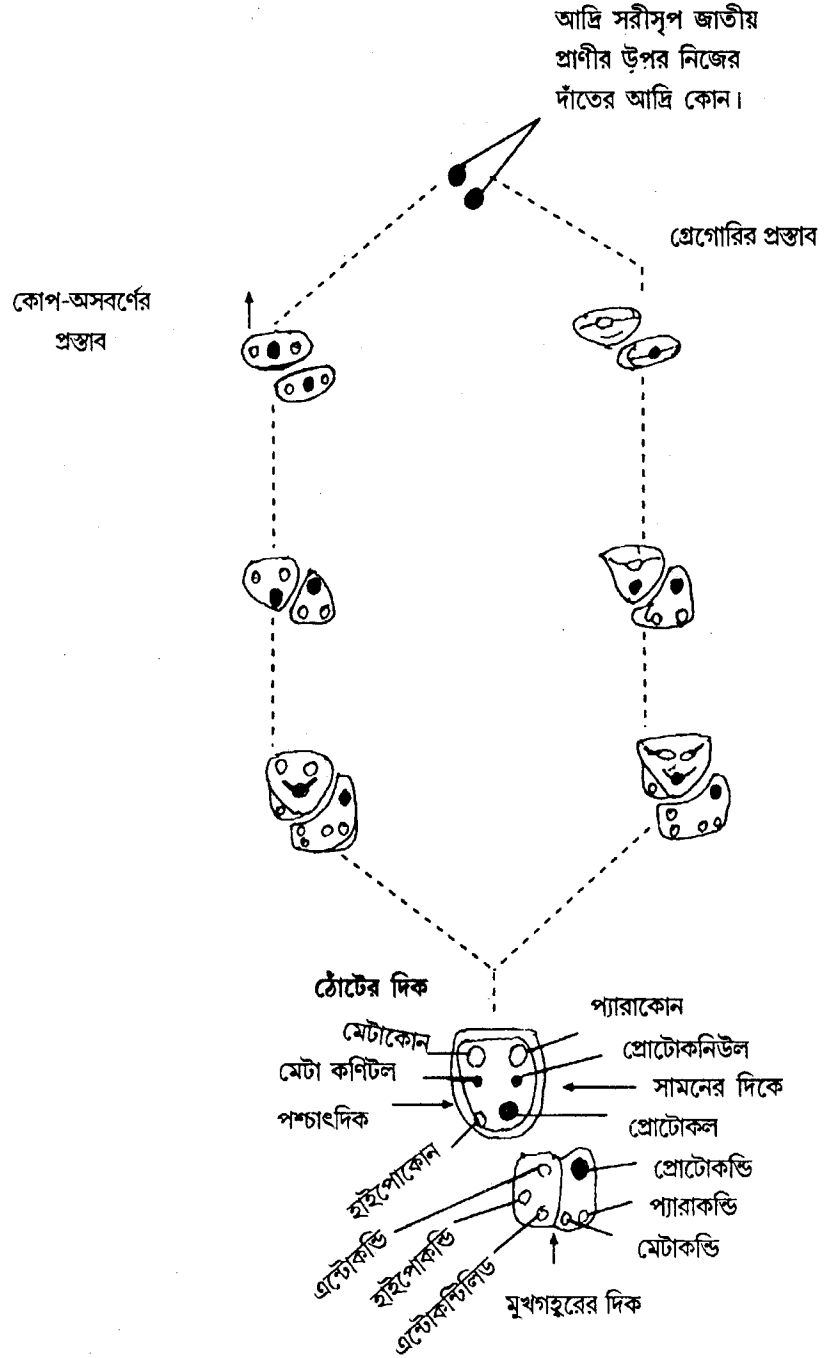

চিত্র-14.2 ঃ কোপ—অসবর্ণের তত্ত্ব (গ্রেগরী দ্বারা পরিমার্জিত) অনুযায়ী সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর ত্রি-টিউবারকল দাঁত থেকে স্তন্যপায়ীর পেষক দাঁতের ক্রমবিকাশ। গোলাকার কালো চিহ্নগুলি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর আদি কোন (Protocone) নির্দেশক।

14.5 স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ (Mammal like reptiles)

সরীসৃপ শ্রেণীর উপশ্রেণী সাইন্যাপসিডা (Synapsida) এবং বর্গ থেরাপসিডার (Therapsida) অন্তর্ভুক্ত জীবাশ্মগুলিকে স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ বলা হয়। থেরাপসিডার উপবর্গ থেরিওডন্সিয়ার (Theriodontia) ট্রায়াসিক যুগের জীবাশ্ম সাইনগ্নাথাস (Cynognathus) এবং ডায়ার্থ্রগনাথাস (Diarthrognathus) জীবাশ্মগুলিতে নিম্নলিখিত স্তন্যপায়ী বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। ডায়ার্থ্রগনাথাস প্রাণীগোষ্ঠীকে অনেকে ইক্‌টিডোসওরিয়া (Ictidosauria) নামে একটি পৃথক বর্গে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

14.5.1 স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের স্তন্যপায়ী বৈশিষ্ট্য ঃ

1. দুটি অক্সিপিটাল কন্ডাইল।
2. গৌণ প্যালেট (Secondary palate)।
3. বৃহৎ ডেন্টারী (Dentary bone)।
4. ডেন্টারী স্কোয়ামোজল সন্ধি।
5. হেটেরোডন্ট (Heterodont) দাঁত বর্তমান।
6. ইনকাস (Incus) এবং ম্যালিয়াসের মতো কোয়াড্রেড এবং আর্টিকুলার অস্থি।
7. দুই মস্তক যুক্ত পর্শুকা।
8. স্তন্যপায়ীদের মতো স্ক্যাপুলা।
9. ত্রি-টিউবারক্‌ল অথবা বহু টিউবারকল্‌ যুক্ত পেষক দন্ত।
10. টেম্পোরাল ফসা (Temporal fossa) এবং অক্ষিকোটোরের একত্রীভবন।

স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তির বিষয়টি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সকলেই একমত। কিন্তু কোন একটি বিশেষ স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ গোষ্ঠী থেকে অথবা স্তন্যপায়ী সদৃশ বহু সরীসৃপ গোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর বিবর্তন হয়েছে। এই ব্যাপারে সকলে এক মত নন। নিচে কতগুলি মতামত উল্লেখ করা হলো।

14.5.2 একক গোষ্ঠী ভিত্তিক উৎপত্তি (Monophyletic origin) ঃ হপসন ও ক্রমপ্টন (Hopson & Crompton, 1969) রোমার (Romer, 1970) প্রভৃতি প্রাণী বিজ্ঞানীরা মনে করেন স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সাইনডন্ট্স সরীসৃপ গোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত।

14.5.3 বহু গোষ্ঠী ভিত্তিক উৎপত্তি (Polyphyletic origin) ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী অনেকগুলি স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর সৃষ্টি হয়েছে এবং স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্যগুলি এই সকল প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে সমান্তরাল বিবর্তনের ফল। কোলবার্ট (Colbert, 1969), বেলেয়ার্স এবং অ্যাট্রিজ (Bellairs & Attridge, 1975), গ্রিফিথস (Griffiths, 1978) প্রভৃতি প্রাণী বিজ্ঞানীরা এই মতবাদের সমর্থক।

বিখ্যাত বিবর্তন বিজ্ঞানী সিম্পসনের (Simpson, 1971) মতে স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তি বহুগোষ্ঠী ভিত্তিক অথবা একক গোষ্ঠী ভিত্তিক তা নির্ধারণ হওয়া উচিত পূর্বপুরুষদের সীমারেখা কোথায় টানা হয়েছে তার উপর। কেম্প (T.S. Kemp, 1982) স্তন্যপায়ীদের বহু গোষ্ঠী ভিত্তিক উৎপত্তির মতবাদকে স্বীকার করেন না।

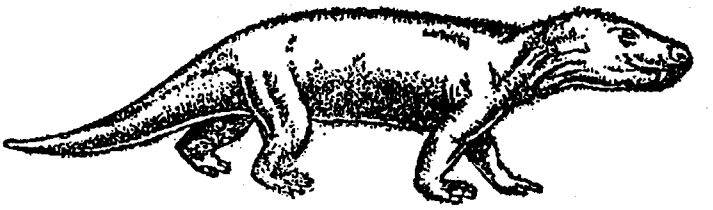

ক

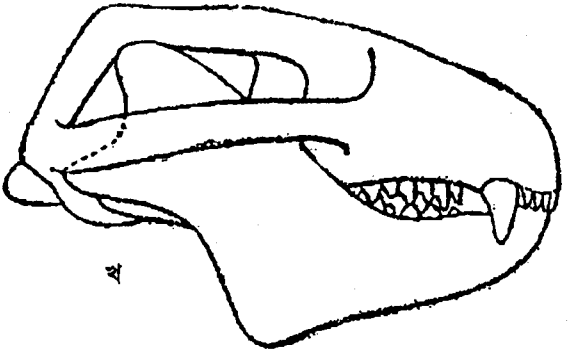

খ

চিত্র-14.3 ঃ স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের কল্পচিত্র (ক)। করোটি ও চোয়ালের পার্শ্বীয় দৃশ্য (খ)।

অনুশীলনী—2

a. স্তন্যপায়ীদের উদ্‌বর্তন সংক্রান্ত অ্যাম্ফিবিয়া মতবাদটি কোন বিজ্ঞানীর?

b. স্তন্যপায়ীদের অক্সিপিটাল কন্ডাইল কোন অক্সিপুট অস্থি থেকে উৎপন্ন হয়?

c. স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ কাদের বলা হয়?

d. মনোট্রিমাটার দু'টি সরীসৃপ বৈশিষ্ট্য লিখুন।

14.6 সারাংশ

এই এককটিতে আপনারা শিখতে পেরেছেন যে—

- থেরোপোড ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপ থেকে পক্ষী গোষ্ঠীর উদ্‌বর্তন এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত।
- আদিপক্ষী আর্কিয়পটেরিক্সের মধ্যে থেরোপোড ডাইনোসরের সিংহভাগ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।
- পক্ষী গোষ্ঠীর উদ্‌বর্তন সংক্রান্ত অন্য দুটি মতবাদ হলো "থেকোডন্ট" তত্ত্ব ও "ক্রোকোডাইলোমর্ফ" তত্ত্ব।
- প্রায় 15 কোটি বছর আগে জুরাসিক উপযুগের শেষের দিকে আদি পক্ষী গোষ্ঠীর উদ্‌বর্তন শুরু হয় এবং বর্তমান পক্ষী গোষ্ঠী আরও সাড়ে আট কোটি বছর পরে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়।
- স্তন্যপায়ীর উদ্‌বর্তন সংক্রান্ত দু'টি মতবাদ প্রচলিত। একটি 'অ্যাম্ফিবিয়া মতবাদ' এবং অন্যটি "সরীসৃপ মতবাদ"। সরীসৃপ মতবাদটি বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব।

● স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ গোষ্ঠী থেকে (মূলতঃ উপশ্রেণী সাইন্যাপসিডার বর্গ থেরাপসিডার অন্তর্ভুক্ত প্রাণীগোষ্ঠী) স্তন্যপায়ীদের উদ্‌বর্তন হয় বলে মনে করাহয়। তবে, একক গোষ্ঠী ভিত্তিক (Monphyletic) বা বহু গোষ্ঠীভিত্তিক (Polyphyletic) উদ্‌বর্তন—এ বিষয়ে সকল প্রাণী বিজ্ঞানী একমত নন।

14.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

a. আদি পক্ষী আর্কিয়পটেরিক্স-এর সরীসৃপ বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

b. পক্ষী শ্রেণীর উদ্‌বর্তন সংক্রান্ত "থেকোডন্ট" তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

c. "থেরোপোড" তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

d. স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপদের কয়েকটি স্তন্যপায়ী বৈশিষ্ট্য লিখুন।

e. সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর উদ্‌বর্তনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

4.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

a. পালক, b. কোটি বছর আগে, c. নিজে লিখুন, d. ক্ল্যাভিকল, e. আর্কোসত্তর সরীসৃপ গোষ্ঠীর ক্রোকোডাইল ও ট্রায়াসিক-জুরাসিক যুগের স্ফেনোসূচাস (Sphenosuchus) জাতীয় প্রাণীদের একত্রে "ক্রোকোডাইলোমর্ফ" বলা হয়। f. নিজে চেষ্টা করুন (14.3.1 অনুচ্ছেদ দেখুন)

অনুশীলনী—2

a. বিখ্যাত জীব বিজ্ঞানী T.H. Huxley, b. এক্সোঅক্সিপুট অস্থি থেকে, c. বর্গ থেরাপসডিার অন্তর্গত প্রাণী গোষ্ঠীকে, d. নিজে লিখুন (14.4.3 (A) অনুচ্ছেদ দেখুন)

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

a. নিজে লিখুন, b. "থেকোডন্টু" তত্ত্বটি দেখুন, c. "থেরোপোড" তত্ত্বটি দেখুন, d. নিজে চেষ্টা করুন (14.5.1 দেখুন), e. নিজে চেষ্টা করুন।